সূচি

পরিশিষ্ট

অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য

১

অমলচন্দ্র হোমের "অতি-আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য" প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৩৩-এর 'ভারতবর্ষে' (পৃষ্ঠা ২৮৬-২৯৬)। রচনাটি প্রমথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে দিল্লিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত। এ প্রবন্ধের শুরু যেন-বা একটু নাটকীয়—সেখানে সংলাপও রয়েছে। তারপরেই লেখক জানিয়েছেন যে ট্রামে চলতে চলতে তিনি দেখেন যে অতি-উৎসাহী যুবকের দল তর্কে মেতেছে। কান পেতে শুনতে পান সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে কিছু নাম—ক্নুট হামসুন, জোহান বোয়ার, ম্যাক্সিম গোর্কি। তাঁর মনে বিস্ময় যে এ-বয়সে তাঁরা পড়েছেন থ্যাকারে, ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট। তাহলে এই যুবকের দল সমস্ত অতীত অতিক্রম করে বর্তমানের সঙ্গে পা-মিলিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করছে। বাংলা কথাসাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা জাগে তাঁর মনে। কিন্তু বিভিন্ন মাসিক-সাপ্তাহিকের গল্প-উপন্যাস পড়ে জেগে ওঠে শুধু নিরাশাই। অভিজ্ঞতায় মন বিরূপ হয়, চিত্ত বিকৃত হয়ে ওঠে। তাঁর মনে হয়—এ কী কৃত্রিম ভাববিলাস, প্রেমের অসহনীয় ন্যাকামি, ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযম, বাস্তবতার নামে কলাকৌশলশূন্য অভিনয়, আন্তরিকতাবিহীন মায়াকান্না সাহিত্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তাহলে এই কি নবযুগের সাহিত্য?

প্রেম সাহিত্যের সনাতন বস্তু। সেই প্রেম যদি আজও সাহিত্যের বিষয় হয় তাতে আপত্তির কিছু নেই। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটা রক্তমাংসের দিক আছে সেটাও সত্যি। কিন্তু প্রেম-কাহিনীর মধ্যে যদি শুধু রক্তমাংসের দিকই একান্ত হয়ে দেখা দেয়, যদি হৃদয়াবেগের সূক্ষ্ম অনুভূতির আত্মাহুতি হয়, তবে সে লেখা আর্টের রাজ্য থেকেও নির্বাসিত। লেখকের মতে যা স্থূল, যা অসুন্দর, যা লোভে ও মোহে অশুচি, জীবনে তা সত্য হতে পারে কিন্তু আর্টে তা কিছুতেই সত্য হতে পারে না, কারণ আর্ট শুধু জীবনে বিধৃত হয়ে নেই, আর্টের রাজ্য বিস্তৃত হয়ে রয়েছে জীবনকে অতিক্রম করে। এখন, প্রেমের গল্পমাত্রই একশ্রেণীর তরুণ-তরুণীর প্রেমবিলাসের অথবা অতৃপ্ত দৈহিক বুভুক্ষার প্রতিবিম্বমাত্র। তার মধ্যে

না আছে কোনো কল্পনা, না আছে সত্যানুভূতি, না আছে সুস্থ ও শক্তিমান প্রকাশ। লেখকের ভাষায়, 'প্রেম কি শুধু মানুষকে বিলাসের বধ্যভূমিতে ডাকিয়া আনিয়া লালসার যূপকাষ্ঠে তাহাকে বলি দিবার জন্যই আধুনিক বাংলার কথা-সাহিত্যের সিংহাসনে আসিয়া আসন লইয়াছে?··· সতেরো বৎসর বয়সেই যে অজাতশ্মশ্রু তরুণের "একটুখানি শাড়ীর আঁচল দেখ্‌লেই বুকের রক্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, একটু চুড়ির রিনিঝিনি শোন্‌বার জন্য মনটা তৃষিত হয়ে থাকে, এবং কাঁচা বয়সের মেয়ে দেখলেই ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে আসতে ইচ্ছে হয়", তাহার দেহ মনের স্বাস্থ্য যে অটুট আছে, একথা কি করিয়া বলিব? সতেরো বৎসরের ছেলে যেখানে পনেরো বৎসরের মেয়ের বয়সকে লোভনীয় বলিয়া কামনা করিতেছে, সেখানে প্রেমের বিকার হয় নাই একথা কে স্বীকার করিবে?' কিন্তু এই বিকৃত, বিষদুষ্ট, অস্বাস্থ্যকর প্রেমকে আশ্রয় করেই অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য পরিপুষ্ট হচ্ছে।

তরুণরা বলবেন তাঁরা বাস্তবতার সৃষ্টি করছেন এবং নরনারীর প্রেমের এই নিতান্ত স্থূল দিকটাই তাঁদের চোখে পড়েছে। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় realism ও realistic interpretation of life-এর ধুয়া এসে পৌঁছেছে। বাস্তব সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে যে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সুনিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তি, অভিজ্ঞতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকা দরকার নবীনরা সে-শক্তি অর্জন করতে পারেননি। তাই তিনি মনে করেন যে এই নব কথাসাহিত্যের 'রিয়ালিজম্' ইউরোপ থেকে আমদানি করা। আমাদের সমাজজীবনে যে অংশ একই সঙ্গে করুণ ও কদর্য, অত্যাচারে পিষ্ট ও কদর্য—সেইদিকেই যদি তরুণদের নজর যায় তবে সেটা সমস্যার নয়। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে সেই সমস্যাকে অন্তরে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সে-চেষ্টা কেউ করেননি, তার ফলে এই ধরনের বাস্তব শুধু বাইরের জিনিস—কুলি ধাওড়া, কামিনদের বস্তি, ছেঁড়া চট, দুর্গন্ধময় নর্দমা, পঙ্কিল পথ, অস্বাস্থ্য, কলহ—গল্প এরই মধ্যে আরম্ভ এবং শেষ। মনীষী গোর্কি শ্রমজীবীদের মধ্যে, কয়লার খাদে, জঘন্য বস্তিতে জীবনের বহু বৎসর কাটিয়েছেন। এই দুঃখের অভিজ্ঞতার মূল্য সাহিত্যে অনেকখানি। কিন্তু আমাদের তরুণদের রিয়ালিজম্ ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণমাত্র। ইউরোপে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে যৌন-সম্বন্ধ একটা স্বতন্ত্র সমস্যা। ইউরোপীয় সমস্যার সঙ্গে আমাদের দেশের সমস্যার মিল নেই অথচ পশ্চিমের বাস্তব-সাহিত্যে যৌন-সম্বন্ধের যে রূপ-চিত্রণ অতি উৎসাহে আমাদের সাহিত্যে তার অনুকরণ হচ্ছে। এর পিছনে হয়তো

ইন্দ্রিয়-লালসার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতও রয়েছে। এরপর লেখক জানিয়েছেন, 'আমি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকুরী করি বটে ও সহরের স্বাস্থ্য-বিবরণ আমার জানা প্রয়োজন; কিন্তু তাহা হইলেও আমি সাহিত্যের "স্যানিটার ইনস্পেকটার" নই, সে কাজের জন্য প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত রাজভৃত্য আছে, আমি শুধু আর্ট ও সাহিত্যের দিক হইতেই কথাটা বলিতেছি।'

এই যৌনসম্বন্ধীয় বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে আইনে দণ্ডনীয় কতকগুলি সমাজ-সংস্থান-বিরোধী ব্যাপারও আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অতি রুচিকর উপাদান-বস্তু হয়ে উঠেছে। অবশ্য এরও উদ্ভব আমাদের দেশে নয়। দস্তয়েভস্কি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ-ঔপন্যাসিকরা criminology-কে আশ্রয় করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, আমাদের বাস্তবসাহিত্যে কতকটা তার ব্যর্থ ও অসংযত অভিব্যক্তি দেখা যায়। যৌন ব্যাপার সম্বন্ধীয় সমস্যা রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'তেও আছে। রক্ত-মাংসের কামনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল সন্দীপের মধ্যেও। বিমলাও চঞ্চল হয়েছে তাতে বার-বার। সন্দীপের অসংযত লালসা পাঠকের চোখকে পীড়া দেয়নি। কিন্তু আমাদের অতি আধুনিক কথাসাহিত্যে আর্টের মর্যাদা রক্ষার চেয়ে ঘটনাকে রসালো করে পরিবেশনের দিকেই নজর বেশি। আর তাই— 'লালসার ফেনিলোচ্ছ্বসিত উদ্দাম বিলাসশালায় নারীমাংস-লোলুপদের আমন্ত্রণের ইঙ্গিতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়-বুভুক্ষার বিস্তৃত বিবরণে নব-কামায়ন বিরচিত হইতেছে।'

আমাদের কথাসাহিত্য ইউরোপের আধুনিক কথাসাহিত্যের প্রভাবে গড়ে উঠছে। অতি-আধুনিক 'continental literature'-এর মোহ আমাদের এই বাংলা কথাসাহিত্যিকদের দুর্বল করছে। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারাবাহিক পাঠের অভিজ্ঞতা এঁদের নেই। তাই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ ও বৈষম্যের ধারা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে। প্রবন্ধের শেষে লেখক মন্তব্য করেছেন, 'আমাদের বর্ত্তমান "তরুণ" সাহিত্যিকরা নন্—ভবিষ্যতে তারুণ্যের জয়টীকা পরিয়া যাঁহারা আসিতেছেন, যাঁহারা শুদ্ধ শুচি, সংযমে শক্তিমান, যাঁহারা আজিকার মাসিক-পত্রিকার সহজ সম্মানে লুব্ধ হইবেন না, যাঁহাদের সাহিত্যসৃষ্টিতে শুধু রক্তমাংসের তাড়নাই প্রকাশ পাইবে না, শুধু য়ুরোপীয় সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ দেখা যাইবে না, যাঁহারা মানুষের জীবনকে আর্টের পূজা-বেদীতে নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ-করিবেন—আমরা তাঁহাদের আগমন আশায় অপেক্ষা করিতেছি, বাংলা কথা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তাঁহাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছে।'

২

ভাদ্র ১৩৩৪-এর 'শনিবারের চিঠি' শুরু হয়েছে সজনীকান্ত দাসের "আধুনিক বাঙলা সাহিত্য" নামে রচনাটি দিয়ে। সেখানে সজনীকান্ত ২৩ ফাল্গুন ১৩৩৩-এ রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি দীর্ঘ পত্র এবং ২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩-এ রবীন্দ্রনাথের সজনীকান্তকে লেখা ঐ চিঠির উত্তর দুটোই প্রকাশ করেন। শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিতর্ক পর্যায়ে ঐ দুটি চিঠির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে সে চিঠি-দুটি সম্পূর্ণ উল্লেখ করা হল :

সজনীকান্ত দাসের চিঠি

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণামনিবেদনমিদং

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙলাদেশে এক ধরণের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' নামক দু'টি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরণের লেখা ক্রমশ সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গদ্যের যে প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ করে চলে না। কবিতা, stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানে না; গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেম্‌নি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরণের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা continental literature-এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি প'ড়ে বাহবা দেন তাঁরা সাধারণ প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদের সাহিত্য ব'লে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষদের যে-সকল পরিবারিক সম্পর্ককে সম্মান ক'রে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার শ্রেণীভুক্ত ব'লে প্রচার করবার একটা চেষ্টা দেখি। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী। Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাশ্ব' লিখিত কয়েকটি গল্প, এই মাসের কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি, 'কালি-কলমে' নজরুল ইসলামের 'মাধবীপ্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে

পারে। আপনি এসব লেখার দু'একটা পড়ে থাকবেন। আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে 'শনিবারের চিঠি'তে এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে, কোনো প্রবলপক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রে বাঙলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট ক'রে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্যপথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি।

আমি জানি না, এই সব লেখা সম্বন্ধে আপনার মত কি। নরেশবাবুর কোনো বইয়ের সমালোচনায় আপনি তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। সেটা ব্যাজস্তুতি না সত্যিকার প্রশংসা, বুঝতে পারি না। আমি নিজে এগুলিকে সাহিত্যের আগাছা বলে মনে করি। বাঙলা সাহিত্য যথার্থ রূপ নেবার পূর্ব্বেই এই ধরণের লেখার মোহে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে, আমার এই ধারণা। সেইজন্যে আপনার মতামতের জন্যে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। বিরুদ্ধে বা পক্ষে যে দিকেই আপনি মত দেন, আপনার মত সাধারণের জানা প্রয়োজন।

আপনাকে আজ এই চিঠি লেখার কারণ—(কার্ত্তিকের) ভারতীতে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবন্ধ "সাহিত্যে শুচিবিচার"। এই প্রবন্ধটিকে এই সম্প্রদায়ের লেখকগণ ইতিমধ্যেই নজির স্বরূপ দাখিল করেছেন। এই প্রবন্ধটি আমি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আজ দশ বৎসর ধ'রে আপনার লেখা প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছে আপনি সাহিত্যে শ্লীলতার গণ্ডী পার হ'য়ে যাওয়ার পক্ষে নন। আপনার লেখার এমন কোনো জায়গা আমি দেখিনি যেখানে আপনার চিত্রিত চরিত্র সংযম হারিয়েছে। ঠিক যতটুকু পর্য্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন ততটুকুর বেশী আপনি কখনও যাননি। অথচ যে-সব জিনিষ নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন সেইসব জিনিষই আধুনিক এই লেখকদের হাতে পড়লে কি রূপ ধারণ করত ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। 'একরাত্রি' 'নষ্টনীড়', ও 'ঘরে বাইরে' এরা লিখলে কি ঘটত—ভাবতে সাহস হয় না।

নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সম্ভবত আপনি নিজে 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' লিখেছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'উমা' নামক উপন্যাসের সমালোচনায় তাতে লিখিত আছে—'সুনীতি হিসাবে এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতে পারি না। বিনোদিনী ও যোগেশ্বর সম্বলিত যে চিত্র গ্রন্থকার আমাদিগকে দেখাইয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক নহে—এমন অবস্থায় এমন ঘটনা পৃথিবীতে

অনেক ঘটে। কিন্তু পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই।...কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা? তাই আবার পাঁচকড়িবাবুর ন্যায় ক্ষমতাশালী লেখক করিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য।...যাহাতে বিশ্বজনীন নীতি নাই, তাহা কি কাব্য হইতে পারে?'

এই চিঠির উত্তর পাওয়ার সৌভাগ্য যদি আমার হয় তাহলে সেটি প্রকাশ করবার অনুমতি আমি আপনার কাছে চেয়ে রাখছি।

আপনার নিকট এভাবে জবাব দাবী করতে গিয়ে যদি কিছু ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে থাকি তা'হলে এই ভেবে ক্ষমা করবেন যে, আমি একা নই—আমার এই চিঠিতে আমি অন্ততঃ আমার পরিচিত কুড়ি বাইশ জন সাহিত্যসেবীর মনোভাব ব্যক্ত করেছি। ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সত্য প্রতিবাদও অনেক সময় ঈর্ষ্যা ব'লে হেলা পায়। আপনি কথা বল্‌লে আর যাই বলুক, ঈর্ষ্যার অপবাদ কেউ দেবে না।

আমার প্রণাম জানবেন

প্রণত শ্রীসজনীকান্ত দাস।

রবীন্দ্রনাথের জবাব

Santiniketan
Bengal, India.

কল্যাণীয়েষু

কঠিন আঘাতে একটা আঙুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরচে না। ফলে বাক্‌সংযম স্বতঃসিদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে আছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এ স্থলে গ্রাহ্য না হতেও পারে। আলোচনা করতে হ'লে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে। এখন মনটা ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্র দৃষ্টির প্রভাব প্রবল—তাই এখন বাগ্‌বাত্যার ধুলো দিগদিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বল্‌বার বল্‌ব। ইতি ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩৩।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

('শনিবারের চিঠি', ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ ২-৬)

‘বিচিত্রা’ : রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য-ধর্ম

১

‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৩৪-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “সাহিত্য-ধর্ম” (পৃ ১৭১-৭৫) প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তিনি প্রথম তিন পৃষ্ঠা বিভিন্ন উপমা দিয়ে বিষয়ের ব্যাখ্যায় এই বক্তব্য করলেন যে যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা ‘সৃজনার্থং’ নয়, কেননা যেখানে সে পশু, সার্থকতা তার প্রেমে, সেখানেই সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম উভয়ের সীমানা-বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে।

সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে। অর্থাৎ যৌনমিলনের মধ্যে যে দুটি মহল আছে মানুষ তার কোন্‌টিকে অলংকৃত করে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায় সেইটেই হল বিচার্য।

আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে-একটা উপদ্রব চলছে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেসটোরেশন্‌ যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু সেই যুগের লালসার উত্তেজনা যেমন সাহিত্যের রাজ-টীকা চিরদিনের মতো পায়নি, আজকাল দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিঁকতে পারে না।

‘সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ-কেউ মনে করছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্ব্বল্য, নির্ব্বিচারে অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।’

এরপর প্রবন্ধকার একটি উপমা ব্যবহার করে বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন যে এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধুলো-মাখা আধুনিকতারই একটি

স্বদেশী দৃষ্টান্ত তিনি দেখেছিলেন হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই, পিচকারি নেই, গান নেই। লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক করে তুলে তাই চিৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই লোকে বসন্ত-উৎসব বলে গণ্য করছে। 'পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙীন করা নয়।' এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বেও মেলে। সেটা সাইকো-এনালিসিসের কার্য-কারণে বিচার্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে অসঙ্গত বলেই আপত্তি করা হবে, অসত্য বলে নয়।

প্রশ্নটা সত্য নিয়ে নয়, প্রশ্নটা সঙ্গতি নিয়ে। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাতলামির ভূতে পাওয়া মাদল-করতালে 'খচোখচো-খচ্‌কার' যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্তিত গর্জনে পীড়িত স্বরলোককে আক্রমণ করতে থাকে তখন আর্ত ব্যক্তিকে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কিনা, যথার্থ প্রশ্ন হল এটা সঙ্গীত কিনা। 'মাধুর্য্যহীন এই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরী দিতে হবে সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুরের রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্যকলার নয়।'

সম্প্রতি ইউরোপে যে সাহিত্যের এ-সব লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে সে-দেশের সাহিত্য অন্তত বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে তার কৈফিয়ৎ দিতে পারবে। কিন্তু যে দেশে;অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান প্রবেশাধিকার পায়নি, সে দেশের সাহিত্য ধার করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে? প্রবন্ধ শেষ হয়েছে এই উক্তি দিয়ে—'ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায়, "তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন?" উত্তর পাই, "হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেচে!" ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, "হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের এইটেই বাহাদুরী।'

এর আগে আমাদের সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন যে আমাদের দেশে নাগরিকতা যখন খুব তপ্ত ছিল তখন ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র যথেষ্ট আদর ছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মধ্যেও সে ঝাঁজ ছিল। তখনকার দিনে

নাগরিক-সাহিত্যে এ-সবের ছড়াছড়ি ছিল। যারা সে নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল তারা মনে করতে পারত না যে, সেদিনকার সাহিত্যের রসা-কাঠের এই ধোঁয়াটাই প্রধান ও স্থায়ী জিনিস নয়, তার আগুনের শিখাটাই আসল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেদিনকার সাহিত্যের গায়ে যে কাদার ছাপ পড়েছিল সেটা তার চামড়ার রং নয়, কালস্রোতের ধারায় তার চিহ্ন আর নেই। ঈশ্বরগুপ্ত যেদিন প্রথম পাঁঠার ওপর কবিতা লিখেছিলেন সেদিন হঠাৎ-শহর কলকাতার বাবুমহলে তার প্রশংসাধ্বনি উঠেছিল। আজকের দিনের পাঠক কাব্যের পংক্তিতে তার স্থানও দেবেন না।

'পেটুকতার নীতিবিরুদ্ধ অসংযম বিচার ক'রে নয়, ভোজন-লালসার চরমমূল্য তার কাছে নেই বলে।'

২

'যাত্রীর ডায়ারি' শীর্ষে রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্যে নবত্ব" প্রকাশিত হল 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৪-এ (পৃ ২১৫-১৯)। রবীন্দ্রনাথ এ-আলোচনায় বললেন সকল দেশের সাহিত্যেরই প্রধান কাজ হচ্ছে শোনবার লোকের আসনটি করে তোলা। নইলে লেখবার লোকের শক্তি খাটো হয়ে যায়। বনেদি সাহিত্য সেই শোনবার কান তৈরি করে তোলে। বাংলাদেশে প্রথম ইংরাজি শিক্ষার যোগে এমন সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল যার স্থান বিপুল দেশের ও নিরবধি কালের। সাহিত্যে বলবার বিষয়টা যতই বিদেশী হোক, তার চলবার আদর্শটা সর্বকালীন। কিন্তু মানুষের কানের কাছে সর্বদাই যারা ভিড় করে থাকে, তাদের পাতে জোগান দেবার ভার নিতে গেলে ঠকতে হবে।

বড় সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। একেই বলে ওরিজিন্যালিটি। রবীন্দ্রনাথ উপমা দিয়েছেন। 'জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে সাহিত্যধারায় নৌকো চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে— হালের উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের গাতুনি— এতে মাঝিগিরির দরকার নেই— এটা তলিয়ে-যাওয়া রিয়ালিটি। ভাবটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগ্‌বাজি খেলিয়ে পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজ্‌ম্।'

বাংলা সাহিত্যেও একটা সাহসিক অধ্যবসায়ের যুগ এসেছে। নবীন লেখক-দের মধ্যে বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষার সাহসিক অধ্যবসায় বিস্ময়কর। এঁদের মধ্যে খ্যাতিলাভ করেছেন মোহিতলাল। কারণ তাঁর মধ্যে আছে অকৃত্রিম পৌরুষ। কিন্তু শক্তির একটা নতুন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ সুন্দর তুলনা দিয়ে বলেছেন সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপর দল সেখানেই উদ্দাম ভঙ্গীতে কেবল জলের নীচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করে। অপটু কৃত্রিমতার দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। সে রূঢ়তাকে শৌর্য এবং নির্লজ্জতাকে পৌরুষ বলে। সে হাল আমলের নূতনত্বের কতকগুলো বাঁধা বুলি সংগ্রহ করে রাখে। বিলিতী পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডার বাঁধা নিয়মে তৈরি করে রাখে—যাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটে কারি হয়ে ওঠে। 'আধুনিক সাহিত্যে সেই রকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে—অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে "রিয়ালিটির কারি-পাউডার।" ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন। আর একটা লালসার অসংযম।' এদের সকলের জীবনযাত্রার সঙ্গে দারিদ্র্যের যে যোগ আছে তা নয়, দেশের দারিদ্র্যকে এরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্ম ঝাল-মশলার মতো ব্যবহার করেন। দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা অকৃত্রিমভাবে যার মধ্যে দেখা যায় সে গল্প শৈলজানন্দের। তাঁর বিষয়গুলো সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি।

লালসা জিনিসটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদ্জনক। কারণ ওটা অত্যন্ত সস্তা। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়। এটাই যদি আধুনিক যুগের একটা মস্ত ওস্তাদি হয় তাহলে তার জন্য তেমন শক্তিমান লেখকের দরকার নেই।

কেউ কেউ বলছেন তরুণদের চিত্ত-বিকার ঘটেছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। এরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া সাধন গ্রহণ করেছে। কারণ দুঃসাহসী বলে এতে বাহাদুরি পাওয়া যায়। সেটা তরুণদের পক্ষে প্রলোভনের।

'তারা বলতে চায় আমরা কিছু মানিনে,— এটা তরুণের ধর্ম। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না মানতে শক্তির দরকার করে—সেই শক্তির অহংকার তরুণের পক্ষে স্বাভাবিক। এই অহংকারের আবেগে তারা ভুল করেও থাকে—সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণদের স্পর্ধাকে আমি শ্রদ্ধাই করি।'

কিন্তু এখানেই তাঁর প্রবন্ধ শেষ নয়। কারণ কবি জানেন যে যেখানে না-মানাই হচ্ছে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহঙ্কার তরুণের পক্ষেই সবচেয়ে অযোগ্য। ভাষাকে না মানলে কবিতা লেখা সহজ হয়, 'দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে, তাহলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিত মতো কাজ চালানো যায়, কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক-কাপুরুষতা।'

বিতর্ক : 'বিচিত্রা'

১

রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্যধর্ম" প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা', ১৩৩৪ শ্রাবণ সংখ্যায়। 'বিচিত্রা'য় ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "সাহিত্যধর্মের সীমানা", আশ্বিনে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি লিখলেন "সাহিত্যধর্মের সীমানা-বিচার্য"। ঐ একই মাসে 'বঙ্গবাণী'তে শরৎচন্দ্র লিখলেন "সাহিত্যের রীতিনীতি"। রবীন্দ্রনাথ মালয় থেকে "সাহিত্যে নবত্ব" প্রবন্ধ লিখে (২৩ আগস্ট ১৯২৭) পাঠিয়ে দেন 'প্রবাসী'তে। 'বিচিত্রা'র অগ্রহায়ণ ১৩৩৪-এ আবার নরেশচন্দ্র, কৈফিয়ৎ বা সাহিত্যধর্মের সীমানা বিচারের উত্তর প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ মালয় ও দ্বীপময় ভারত সফর শেষ করে দেশে ফিরলেন ১০ কার্তিক, ১৩৩৪। 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত' গ্রন্থে জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'শনিবারের চিঠির তখন যৌবনের পূর্ণজোয়ার। কার্তিক মাসের শনিবারের চিঠির 'মণিমুক্তা' বিভাগে কোন মহিলা কথাশিল্পী ছিলেন আক্রমণের পাত্রী। এই নিয়ে তাঁর লাঞ্ছনা সাহিত্যের আঙিনা থেকে সামাজিক দেহলিতে গিয়ে পৌঁছল' (পৃ ৫৪)। ১৩৩৪-এর কার্তিকের 'মণি-মুক্তা' বিভাগে দুজন মহিলা সাহিত্যিকের উল্লেখ আছে। প্রথমজন রাধারানী দত্ত। তাঁর জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, 'ভারতবর্ষে' "সাগর স্বপ্ন" লেখার উল্লেখ করা হয়েছে, আর আশ্বিন ১৩৩৪-এ 'কল্লোলে' প্রকাশিত উমাদেবীর "চিঠি" রচনার উল্লেখ করা হয়েছে। ২৮ কার্তিক এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ সজনী-কান্তকে লিখলেন :

কল্যাণীয়েষু,

তোমার বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে বড়-বড় মহামহোপাধ্যায়ের পণ্ড পাণ্ডিত্যের বর্মচ্ছেদন যখন করো তখন তার মধ্যে একটা মহাকাব্যিক মহিমা দেখতে পাই— তাতে খুশি হই— কিন্তু তোমাদের 'শনিবারের চিঠি'র সমরাঙ্গনে আহতদের মধ্যে কোনো নারীকে ধরাশায়িনী দেখলে আমার মন অত্যন্ত কুণ্ঠিত না হয়ে থাকতে পারে না— তারা অপরাধিনী হলেও। নারীদের প্রতি পুরুষ স্বভাবের অন্তর্গূঢ়

করুণাই তার একমাত্র কারণ নয়— আরো একটা কারণ আছে। তোমাদের হাতে মার খেয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকের যে লজ্জা সেটা সাহিত্যিক লজ্জা,—কিন্তু মেয়েদের লজ্জা তার উপরে আরো বেশি, সেটা সামাজিক। সিভিল ক্রিমিন্যাল দুই আদালতেই তাদের দণ্ড। শাস্তির পরিমাণে এই যে অসাম্য এতে আমাকে বাজে। তার পরে ভেবে দেখ, বৈদিক মন্ত্রে বলেচে 'ছায়েবানুগতা', ওরা যদি দোষ করে থাকে তবে সেটা পুরুষের অনুবর্তী হয়ে। এ স্থলে স্থূল বস্তুটাকে আঘাত করে যদি পেড়ে ফেলতে পারো তা হলে ছায়ার টিকি দেখা যাবে না। অনেক সময় স্থূল বস্তুর চেয়ে ছায়াকে দীর্ঘতর দেখতে হয়—মেয়েদের অপরাধ তেমনি পরিমাণে বেশি বড়ো বলে মনে হয়, কিন্তু তবুও সেটা ছায়া। সহধর্মিণীর সহধর্মিতার জন্যে দোষ দিয়ে কি হবে, আগে আগে যে দুঃসহধর্মীটা চলে, চেপে ধরো তাকে। তোমাদের শনির সম্বন্ধে রবির এই বক্তব্যটা চিন্তা করে দেখো।

ইতি—

২৮শে কার্তিক ১৩৩৪ শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সজনীকান্ত এরপর 'শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে তাঁর মতামত স্পষ্ট করে লেখবার জন্য অনুরোধ জানালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

কল্যাণীয়েষু—

দোহাই তোমাদের, 'শনিবারের চিঠি'তে আমাকে টেনো না। নিজে যদি সাহিত্যিক না হতুম তা হ'লে তোমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজি হতুম— কেন না আমার পক্ষে এটা ক্যানিবলিজ্‌ম্ হয়ে দাঁড়ায়। 'প্রবাসী'তে এবার যেটা লিখেচি (সাহিত্যে নবত্ব) সেটাতেও হয়তো অনেকের গায়ে বাজবে—কারণ গায়ের শিরগুলো অনেকেরই টন্‌টনে হয়ে রয়েছে। যৌবনের তীব্রতা গিয়ে অবধি আমার কলম প্রায় জৈনমতে চলতে চায়, এখন সময় অল্প বলেই সেই সময়টার গায়ে রক্তের দাগ লাগাতে সঙ্কোচ হয়—ধুয়ে ফেলবার অবকাশ পাব না। অল্প কটা দিন আছে—শেষ ব্যবহারের জন্যে স্বচ্ছ রাখতে ইচ্ছা করে। তোমার হ'ল সার্জিকাল ডিপার্টমেন্ট, আর আমার আরোগ্যস্নানের মহল। তোমার বয়স যদি পেতুম তোমার ব্রতে যোগ দেওয়া সহজ হ'ত। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩ পৌষ, ১৩৩৪-এ রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লেখেন। সেখানে 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গ করার ক্ষমতার অসামান্যতার কথা বললেন. বললেন 'ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে।' আর তরুণদের বিষয়ে জানালেন যে, তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার একটা স্থান আছে। স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেইটে নিয়েই যদি সে স্থানে-অস্থানে বাহাদুরী করে বেড়ায় তখন সংশয় জাগে। তারা তরুণ বয়স্ক বলেই সবাই তাদের বাহবা দেবে—এ দাবি নিরর্থক। এরপর 'শনিবারের চিঠি' নিয়ে কবি মন্তব্য করেন যে এর শাসনের দ্বারাই অপর পক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্ছে। আর ক্ষণজীবীর আয়ুও এতে বেড়ে যাচ্ছে। চিঠির শেষে তিনি জানান যে, যে-সব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখছে, তাদের কারো কারো রচনা-শক্তি আছে, যেখানে গুণের পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে স্বীকার করাই ভালো।

এ-পত্রে তরুণদের প্রতি অনেকাংশেই অনাস্থা প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, অপরপক্ষে 'শনিবারের চিঠি'র বিশেষ ক্ষমতার স্বীকার করেছেন তিনি। কারণ এ-চিঠির শেষে তিনি বলেছেন যে 'শনিবারের চিঠি'র অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান, নব-নব হাস্য-রূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে। হয়তো 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি এই প্রশংসায় সজনীকান্ত উৎসাহিত বোধ করেছিলেন, তাই সাহিত্যের চিরকালীনতা নিয়ে আগেই মতামত জানতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। ২০ ফাল্গুন, ১৩৩৪-এর এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানালেন,

কল্যাণীয়েষু,

চেষ্টা করব কিন্তু কি রকম ব্যস্ত হয়ে আছি তা তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। এর ওপরে হিবার্ট লেকচার এখনো লিখতে বসতে পারিনি ব'লে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে।

তর্ক-বিতর্কের যে ঘোরতর আন্দোলন চলচে তাতে আরো ঠেলা মারতে ইচ্ছে করে না। আমাকে তো সবাই মিলে বরখাস্ত ক'রে দিয়েচে। যদি না জানতুম যে তরুণেরা চতুর্মুখের মুখোশ প'রে আমাকে ভয় দেখাচ্চে তাহলে মুখ শুকিয়ে যেত। কিন্তু এদের এই সমস্ত পিতামহগিরি নিয়ে যে পেটভরে হাসব তারো সময় আমার নেই—চতুর্মুখ বোধ হয় সমস্ত নকল বিধাতাদের উদ্দাম ভঙ্গী দেখে স্বয়ং হাসচেন, তাঁর কাছে তো অগোচর নেই এদের আয়ু কত দিনের!···

এ-চিঠিতে স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ তরুণদের স্থায়ীত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জ থেকে দেশে ফিরে ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ তারিখে দিলীপকুমার রায়কে একটি পত্র লেখেন রবীন্দ্রনাথ—'সাহিত্য ধর্ম ব'লে একটা প্রবন্ধ লিখেছি। তার কর্মফল চলছে। তার ভোগ ফুরোতে না ফুরোতেই 'সাহিত্যে নবত্ব' বলে আরও একটা লেখা হয়েছে। তোমার সঙ্গে বাক্যালোচনাতেও সাহিত্যতত্ত্বচর্চা কিছু পরিমাণে আছে—এতে করে যে একটা আলোড়ন জাগিয়েছে তাতে ক্ষতি নেই। কেননা, পূর্বেই বলেছি, সাহিত্যলোকে চাঞ্চল্যটার খুব প্রয়োজন আছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছনোটা খুব বেশি দরকারি নয়—দেখতে পাচ্ছি, এক যুগের সিদ্ধান্ত আর এক যুগে উলট-পালট হয়ে যায়, কেবল মনের মধ্যে নিয়তচিন্তার চাঞ্চল্যটাই থাকে। মানুষের মন শেষ কথায় এসে যখন পৌঁছয় তখন নীরবতার সমুদ্র। সেখানে তার কথার কারবার বন্ধ করতে মানুষের আপত্তি আছে; কেননা, মনটা নাড়া না পেলে একেবারে সে বেকার। এইজন্যে বারে-বারে সত্য সিদ্ধান্তকেও মানুষ তার সংসারের খোঁচা মেরে বিপর্যস্ত করে তোলে—যুগে যুগে তাই চলছে। আমরা সত্যকে পেতে চাই শুধু কেবল পাওয়ার জন্যে নয়, চাওয়ার জন্যেও। এই কারণে আমাদের ভালোবাসার মধ্যে ঝগড়ার স্থানটা খুব বড়; হারানোটা পাওয়ার প্রধান বন্ধু—কেননা, ফিরে ফিরে না পেতে থাকলে সম্পূর্ণ পাওয়া হয় না। অতএব, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে সাবেককালের সঙ্গে হাল আমলের যে ঝগড়া চলছে তার মূলে মানুষের এই স্বভাবটাই কাজ করছে, যাকে আশ্রয় করে তাকে সে আঘাত করে সন্দেহ করে—তারপরে আবার দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে তার কাছে ফিরে আসে।'

২

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "সাহিত্যধর্মের সীমানা" 'বিচিত্রা'র ভাদ্র ১৩৩৪ (পৃ ৩৮৩-৯০) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নরেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ "সাহিত্যধর্ম"-এ মন্তব্য করেছেন যে সাহিত্যে যৌন-সমস্যা নিয়ে যে তর্ক উঠেছে তার সমাধান সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক দিয়ে নয়, তার সমাধান কলারসের দিক দিয়ে। এই সিদ্ধান্তের পর তিনি জানিয়েছেন যে সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে যে বিদেশের আমদানি করা বে-আব্রুতা এসেছে তা কলারস বিরুদ্ধ। নরেশচন্দ্রের মতে যৌন-সম্বন্ধের আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সকল সাহিত্যেই হয়েছে, হয়তো সবচেয়ে বেশি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজের বিরাট গ্রন্থাবলীতে।

শরীর ব্যাপারমাত্রই অপাংক্তেয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করে দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সাহিত্যসম্রাট। নরেশচন্দ্রের ভাষায়, তাছাড়া 'হৃদয়-যমুনা, স্তন, বিজয়িনী, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন।' কিন্তু কোথায় যে এর সীমারেখা তা নির্ণয়ের নির্দেশ কবির লেখার মধ্যে নেই।

স্ত্রী-পুরুষের মিলনের মধ্যে একটি আছে পশুভাব, অপরটি মানুষ ভাবে, প্রেমের ভাবে। প্রথমটির প্রয়োজন আছে, কিন্তু রস হিসাবে অসার্থক। প্রেমের ভেতর আব্রু আছে, কাজেই সেই আব্রু ভেদ করে যৌনমিলনের পশুভাবের আলোচনা সাহিত্যে নিত্যবস্তু হতে পারে না। তাই কবিরও সিদ্ধান্ত বিদেশের আমদানি যে বে-আব্রুতা তা নিত্য নয়; নিত্য হতে পারে না। প্রবন্ধকারের মতে যৌনসম্বন্ধের যে দিকটা পশুধর্ম বলে নির্দেশ করা হয়েছে তা রসের বিচারে চিরকালই যে অসার্থক তা ঠিক নয়। কালিদাস তাঁর মেঘদূতে বা ঋতুসংহারে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তাঁদের পদাবলীতে সম্ভোগের যে বিচিত্র রসচিত্র এঁকেছেন তা কেউই বাতিল করতে পারবে না।

নরেশচন্দ্রের মতে যা আমাদের রসবোধে সাড়া জাগায় সেটা আবৃত হোক, অনাবৃত হোক, তা আর্ট; আর যা রসবোধে সাড়া দেয় না, কেবল মানুষের পশু-প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, তা আর্ট নয়। তাই কবি যে আব্রু ও বে-আব্রুর ভিতর বাহ্য-ভেদ স্বীকার করে এদের রসের নিত্যতা ও অপরের রসবিচারের অসার্থকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, সে চেষ্টা একেবারেই অসার্থক।

বিদেশের আমদানি প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার বলেছেন যে আলো যদি আমার অন্তরে এসে থাকে, তা কোন জানালা দিয়ে এসেছে তাতে কিছু এসে যায় না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিরও উদ্দীপনা এসেছে পশ্চিমের সাহিত্য ও সমাজ থেকে। যে সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ বিলাতে আমদানি বলে কটাক্ষ করেছেন তা শুধুই বিলাতীর পুনরুদ্গীরণ নয়। এই সাহিত্যের মধ্যে এমন অনেক লেখাই আছে যা নিঃশেষে দেশের জীবন ও সমাজের সত্য স্বরূপের রসমূর্তি।

'বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যে যে-সব অসাধারণ চরিত্রের অসাধারণ কার্য্য-কলাপ লইয়া কথা লেখা হইয়াছে', তাদের কোনো একটা সম্বন্ধে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি উপাদান নিয়ে লেখা এ-মত চলতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে এ-মত গ্রাহ্য নয়। যেমন লেখকের গ্রন্থের বিষয়ে criminology-র যে দোহাই দেওয়া হয় তার কোনো ভিত্তি নেই।

প্রবন্ধের শেষে লেখক মন্তব্য করেছেন যে হাট জমবার আগে হট্টগোল সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকবার শোনা গেছে। আজ বিশ্বব্যাপী ভাব-বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটছে সে সম্বন্ধে আমরাও নিরপেক্ষ থাকতে পারি না। 'যে হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে তাতে আমারো সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচ্যবাসীর চেয়ে কম নয়।'

আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী "সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা-বিচার" নামে কুড়ি পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধ লিখে 'বিচিত্রা'-এর ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা" প্রবন্ধের উত্তর দিয়েছেন। প্রবন্ধকার বলেছেন যে এক অদ্ভুত আত্মম্ভরিতার মোহে নূতনপন্থীরা মনে করতেন যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ চিন্তা ও ভাবজগতে যে চিরন্তন সংগ্রাম শুরু করে গেছেন, তাঁরাই উত্তরাধিকারসূত্রে তারই ধ্বজা বহন করে চলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখায় তাঁদের মোহভঙ্গ ঘটেছে। তাই নূতনপন্থীদের প্রধান নরেশ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন।

প্রবন্ধের প্রথম অংশে 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি যে সব আপত্তি তুলেছেন' তার মীমাংসার পথ 'বাৎলে' দিয়েছেন। তাঁর মতে রসজ্ঞ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পড়েননি, পড়েছেন 'স্কুলমাষ্টার ও উকীলের চোখ দিয়ে।' নরেশবাবু অভিযোগ করেছেন যে বে-আব্রুতা এবং যৌন-সম্বন্ধের উল্লেখ করেও কবি তার কোনো অভ্রান্ত সীমা নির্দেশ করেননি। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে চারটি অংশ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে এগুলিই আব্রু এবং বে-আব্রুতার মধ্যে সীমারেখার নির্দেশক। নরেশবাবু নিজের প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন যে বাংলা সাহিত্যেও এমন কতকগুলি বই আছে যার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে বলা যায় যে শরীর ব্যাপার নিয়ে 'ঘাঁটাঘাটি' করে সেখানে মানুষের একটা নিকৃষ্ট-বৃত্তিরই সেবা করা হয়েছে। কিন্তু তিনিও সে-সব বইয়ের কোনো তালিকা দেননি অথচ এই একই অভিযোগে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও অভিযুক্ত করেছেন। লেখকের প্রবন্ধের সর্বাংশ জুড়েই রয়েছে নরেশ সেনগুপ্ত আনীত অভিযোগের প্রত্যুত্তর। নরেশচন্দ্রের "কৈফিয়ৎ" প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (পৃ ৮৯২-৯৫)। সেখানে লেখক বলেন যে অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের লক্ষ্যের অন্যতম তিনি, সে-জন্যই "সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা" রচিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর যে বই নিয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার দল হৈ-চৈ করেছে সেই 'শাস্তি'র প্রশংসাই করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য তাঁর প্রবন্ধটি

রচিত হয়নি। যাঁরা মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মতো, তাঁরাও ভুল করেন। অনেকে মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-প্রসূত হয়ে নরেশচন্দ্র "সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা" লিখেছেন, এর উত্তরে তিনি জানিয়েছেন যে যাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্কই নেই তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ শুধুই কল্পনা-প্রসূত। প্রবন্ধে তিনি যে criminology-র উল্লেখ করেছেন, তার মানে এই নয় যে এর উপর ভিত্তি করেই তাঁর বই রচিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আধুনিক কথাসাহিত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা রচনা করেছে এবং সেই হেতুমূলে তিনি আধুনিক লেখককে তিরস্কার করেছেন। নরেশবাবু তাঁর "সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"য় জানিয়েছেন যে এ-কথাটা সত্য নয়। বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য সত্য। জীবনের গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে আমরা বিজ্ঞান আলোচনা করে যদি কোনো সত্য পাই, তবে সে সত্য কথাসাহিত্যে ব্যবহার করলে যে কোনো দোষ হতে পারে তা তিনি মনে করেন না। তবে যদি কেউ বিজ্ঞানের দৃষ্ট সত্য আশ্রয় করে মানব জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও রস-ভূয়িষ্ঠ কল্পনার সাহায্য ছাড়া কথা রচনা করতে যান, তবে তা সুন্দর ও সার্থক হবে না সে বিষয়ে লেখকের সন্দেহ নেই।

৩

পরশুরামের "রস ও রুচি" প্রকাশিত হয়েছে মাঘ ১৩৩৪-এর (পৃ ১৭৩-৭৫) 'বিচিত্রা'য়। তিনি বলেছেন যে আমাদের ঋগ্বেদের ঋষির কথায়—'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি'—অগ্রে যা উদয় হল তা কাম। ফ্রয়েডের দল এসে জানালেন মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-সৃষ্টি, কমনীয় মনোবৃত্তি তার অনেকেরই মূলে আছে কামের বহুমুখী প্রেরণা। আধুনিক মনোজ্ঞরা বলেন, অতৃপ্তি বা নিগ্রহই কামের রূপান্তর ঘটায়, তার ফলে এই বিচিত্র মানব চরিত্র। আমাদের বহু কামনা নানা কারণে অন্তরের গোপন কোণে নির্বাসিত, তাদের অনেকে উচ্চতর মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে হৃদয় ফুঁড়ে বাহিরে আসে। এই সকল বৃত্তি সমাজের পক্ষে হিতকর, তাই সাহিত্যকলায় তারা অনবদ্য বলে গণ্য। আর একদল রসস্রষ্টা আছেন—তাঁরা এই-সব নিগৃহীত কামনাকে বলেন, 'কিসের লজ্জা, কিসের ভয়? অত সাজ-গোজে দরকার কি,—যাও, উলঙ্গ হইয়া রং মাখিয়া খেলিয়া এস। জনকতক লোলুপ রস-লিপ্সু তাদের সাদরে বরণ করিয়া বলিতেছে—এই ত চরম আর্ট।' কিন্তু সংযমী দ্রষ্টার দল বলেন, কখনই আর্ট নয়, আর্টে আবিলতা থাকতে পারে না।

সমাজপতিগণ বলেন, সমাজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হতে দেব না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে উদ্দাম প্রবৃত্তির চিত্র এঁকে সে সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করবে, 'আমাদের ছেলে মেয়েদের বিগড়াইয়া দিবে, সেটি হইবে না। আমরা আছি, পুলিশও আছে।'

এই দুই দল রসস্রষ্টার মাঝে কোনো গণ্ডী নেই, আছে কেবল মাত্রাভেদ ও সংযমের তারতম্য। ক্ষমতার কথা নয়, কারণ অক্ষম শিল্পীর হাতে স্বর্গের চিত্রও নষ্ট হয়, গুণীর হাতে নরক বর্ণনাও মনোহর হয়।

নির্বাচনের দোষে মাত্রাজ্ঞানের অভাবে অতিরিক্ত আবর্জনা এসে পড়ে, অভীষ্ট স্বাদে বিবাদী স্বাদ উৎপন্ন হয়। তার উপর ভোক্তার পূর্ব অভ্যাস আছে, ব্যক্তিগত রুচি আছে। এত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, ভোক্তার রুচি গঠিত করে, কল্যাণের অন্তরায় না হয়ে যাঁর সৃষ্টি স্থায়ী হবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

চৈত্র ১৩৩৪-এর 'বিচিত্রা'য় নলিনীকান্ত গুপ্তের "আধুনিকতম সাহিত্য" (পৃ ৪৭৭-৮১) প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমেই লেখক মন্তব্য করেছেন যে স্বর্গ থেকে পৃথিবীর উপরে কবি বৈষ্ণবের গান নামিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। আধুনিক যুগের সাহিত্যিকরা আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে পৃথিবী থেকে বৈষ্ণবের গান নামিয়ে পৃথিবীর নীচে পাতালে বা রসাতলে আসর বসাতে চাইছেন। বৈষ্ণব কবিরা যখন লেখেন—মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া / বঁধুয়া করল কোলে। / চরণ উপরে চরণ পসারি / পরাণ পাইনু বলে ॥ /— তখন শরীরকে আশ্রয় করে অন্তরাত্মার মিলনও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আধুনিক কবি যখন বলেন—

তার নিধুবন-উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন
বুকে পীন যৌবন
উঠিছে ফুঁড়ি,
মুখে কাম-কণ্টক ব্রণ
মহুয়া কুঁড়ি।

সেখানে শরীর ছাড়া মানুষের আর যে কিছু আছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। লেখকের মতে ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের ভাঙা-গড়ার হাওয়া আমাদের সাহিত্যে লাগলেও আমাদের মধ্যে অধিকাংশের হাতে আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম হয়ে উঠেছে, একটা ঢঙে পর্যবসিত হয়েছে।

যাঁরা আজ বঙ্গবাণীর সাধনায় 'রসাতলে ঢুঁড়িতেছেন, সাহিত্যের সাধক

যাঁহারা সত্য সত্যই হাতে হাতিয়ারে "লজ্জা ঘৃণা ভয়" এই তিনকে বিসর্জন দিয়া বসিয়াছেন, এই যে সব অবধূতমার্গী অঘোরপন্থী তাঁহাদের সকলেই স্রষ্টা হিসেবে যে অক্ষম অপটু তাহা নয়।' এদের হাতে হয়তো সাহিত্য ঋদ্ধও হয়েছে কিন্তু 'শিল্প হইতেছে মুখ্যতঃ ও মূলতঃ পশু-পিশাচের, প্রেত-প্রমথের জিন-দানার শিল্প, দেবতার শিল্প মানুষের শিল্প যাহা, তাহা অন্য ধরণের বস্তু।'

বৈশাখের 'বিচিত্রা'র 'প্রসঙ্গ কথা'য় 'সাহিত্যে সুনীতি' নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে কিছুদিন থেকে বাংলাদেশে সাহিত্যে শ্লীলতা অথবা অশ্লীলতা নিয়ে একটা প্রবল আন্দোলন চলছে। মূল প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে—সাহিত্যে নরনারীর দৈহিক লালসার এবং অস্বাস্থ্যকর ও ঘৃণিত বিষয়বস্তু এবং পরিপার্শ্বিক আবেষ্টনের স্থান আছে কিনা। 'এ এমন একটি প্রশ্ন যার অনুরূপ প্রশ্ন হ'তে পারে —মানুষের দেহে উত্তাপ থাকা ভালো কি-না। ভালো নিশ্চয়ই যদি তা ৯৮.৪ ডিগ্রি কিম্বা তার কাছাকাছি হয়;—১০৭ ডিগ্রি কিম্বা ৯২ ডিগ্রি নিশ্চয়ই ভালো নয়,—কারণ উভয় অবস্থাই দেহ এবং প্রাণের পক্ষে আশঙ্কাজনক।'

পুরনো একটি কাহিনী আছে। কোনো দেশে এক চিত্রকর একটি নগ্ন-নারী-মূর্তি এঁকেছিলেন। ছবিটি সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হলে প্রবীণেরা ক্ষুব্ধ হলেন। চিত্রকরের নামে নালিশ গেল রাজদরবারে। রাজা চিত্রটি দেখে প্রাণদণ্ড দিলেন চিত্রকরের। চিত্রকর বললেন, মহারাজ, কোনো বড় শিল্পীকে দিয়ে আপনি বিচার করান এ-ছবি অশ্লীল কিনা। সভা-চিত্রকরকে ডাকা হল। তিনি এসে আশীর্বাদ জানালেন ঐ ছবির চিত্রকরকে। রাজচিত্রকর বললেন, একজন অক্ষম শিল্পীর হাতে পড়লে এ-ছবি অশ্লীল হতো। এরপর রাজচিত্রকর রঙ-তুলি নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। একটু পরে ছবিখানা নিয়ে যখন বেরিয়ে এলেন তখন সেই ছবি দেখে সবাই 'অশ্লীল' বলে চিৎকার করে উঠল। রাজাও বললেন, শীগ্‌গির জল নিয়ে এসো, ধুয়ে ফেলো। রাজচিত্রকর আর কিছুই করেননি, নগ্ন-নারীর দুটি পায়ে স্টকিং পরিয়ে দিয়েছিলেন।

এই গল্প বলে 'বিচিত্রা'য় মন্তব্য আছে :

'নগ্ন সৌন্দর্য্য আঁকতে চান আঁকুন—কিন্তু পায়ে ষ্টকিং পরালে চলবে না, মাংসের স্থূলতাকে অতিক্রম করতে হবে। তার জন্য চাই সৌন্দর্য্যবোধ, মাত্রাজ্ঞান, প্রণালী বিচার;—শুধু উপকরণের উৎকর্ষে কিম্বা অপকর্ষে কোনো জিনিষ ভালো-মন্দ হয় না।'

সাহিত্যে দৈহিক লালসার স্থান আছে এই মতবাদে বিশ্বাসী তরুণ-দল।

তাঁদের যুক্তি বাস্তবতার। এই মতবাদের অনুরোধে তাঁরা মানুষকে তার সব-রকম শিক্ষা-সংস্কার-সামাজিকতা থেকে মুক্ত ক'রে নগ্ন বাস্তবতায় দেখাতে চান। তাঁরা ভাবেন ক্ষুধাই মানুষের মধ্যে একমাত্র বাস্তব। প্রেমকে তাঁরা বলেন কামের উত্তপ্ত বালুর উপর মরীচিকা। প্রবৃত্তিকে তাঁরা বলেন শক্তি, নিবৃত্তিকে বলেন দুর্বলতা।

মানব প্রকৃতির মধ্যে এই আদিম বৃত্তির শক্তি যতই প্রবল হোক, শিক্ষা ও সংস্কারের শক্তিও কম নয়।

প্রতিমার ভিতরকার খড় এবং মাটি প্রতিমার পক্ষে একটা খুব বড় রকম সত্য তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু প্রতিমার উপরকার বর্ণটুকুও প্রতিমার পক্ষে ততোধিক সত্য। শেষে মন্তব্য আছে, 'বাস্তবই যদি গল্প এবং উপন্যাসের প্রধান ব্যাপার হ'ত তা হ'লে পুলিশ কোর্টের মকর্দ্দমার বিবরণগুলিই এক একটি শ্রেষ্ঠ গল্প এবং উপন্যাস হতে পারত। বাস্তব মাত্রই যদি নির্বিচারে গল্পের উপকরণ হয় তা হ'লে এখনও এমন বহু অকথিত বাস্তব আছে যা ব্যবহার করতে বর্তমান তরুণ-দল সঙ্কুচিত হবেন, তার জন্যে তরুণতর দলের প্রয়োজন হবে।'

'বঙ্গবাণী'

"সাহিত্য ও আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য" নামে গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৩৫-এর 'বঙ্গবাণী'তে। সেখানে প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি মন্তব্য করলেন যে আজ সাহিত্যের বাজারে idealistic, realistic, বাস্তব-অবাস্তব, শ্লীল-অশ্লীল, সুরুচিসম্পন্ন, রুচিবিগর্হিত প্রভৃতি রচনার চুলচেরা শ্রেণী-বিভাগ নিয়ে যে আলোচনার কোলাহল জেগেছে, তা বহু সময়ে সত্যকার রুচির সীমা লঙ্ঘন করছে। কুৎসিতকে নিন্দা করে যে ভাষা প্রয়োগ করা হয় তা নিজেই কুৎসিত।

যা সত্য তা যদি অশুভও হয় তবু তাকে অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই, তাকে গোপন করবার চেষ্টাও বৃথা। 'পুস্তক পাঠে মন্দ হইয়া যাইবে এই ভয়ে আমরা সযত্নে যে বালককে পুস্তক হইতে দূরে রাখিতে চাহি, সে যখন পথে বাহির হইবে তখন তাহার দৃষ্টি রোধ করিবে কে? তাহার চেয়ে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী করিয়া বুঝাপড়া করাইয়া দেওয়া ভাল।' এ-লেখাটি মজঃফরপুর বিহার বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।

১৩৩৪-এর ভাদ্র সংখ্যায় গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর "সাহিত্যধর্ম" (পৃ ৮৫-৮৮) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের শেষ অংশের মন্তব্য থেকে তাঁর মনোভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেখানে তিনি বলেছেন যে সধবাই হোক আর বিধবাই হোক, বিমলা ও বিনোদিনীর মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকে আমরা বর্বর মানবমনের অসঙ্গত সাহিত্যিক প্রকাশ বলে উপেক্ষা করব না, বরং বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের অপূর্ব সৃষ্টি বলে গ্রহণ করব। এবং সেইসঙ্গে এ-কথাও বলব যে, ভারত সমুদ্রের ওপারে উলঙ্গ-মানব-মন হাটে এসে যে কলরব করছে তা বাংলার অন্তঃপুরের মানব-মনকে অতি সাংঘাতিক রকমে আক্রমণ করেছে। এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ কবির লেখনীতে সে আক্রমণের প্রকাশ ঘটেছে।

প্রবন্ধের প্রথমাংশে তিনি বলেছেন যে মানব-মনের সত্যের প্রকাশ সাহিত্য চায়। যে-সাহিত্য এই প্রকাশের দাবি অগ্রাহ্য করে, সে-সাহিত্য অপূর্ব প্রতিভার সৃষ্টি হলেও ভণ্ড, অসঙ্গত। 'মানব মনে এমন কি মানব-মনের পঙ্কে যে সাহিত্যের

শিকড় নাই, সে-সাহিত্য যে "পদ্ম" ফোটায় সে পদ্ম রঙ্গীন হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাগজের—তাহার গন্ধ নাই' (পৃ ৮৫)। সাহিত্যের কৃত্রিম প্রকাশভঙ্গী উলঙ্গ সত্যের প্রকাশকে সহ্য করতে পারছে না। মানব-মনের যে অংশ বোবা হয়ে ছিল সাহিত্যের 'সুসঙ্গত' রচনারীতির আড়াল আজ সে ভেঙে দিয়েছে। 'আজ বাঁধ ভাঙিবার সময় প্রতিঘাত তাহার উপরেই বেশী করিয়া পড়িবে—ইহাই নিয়ম। এবং ইহাও সাহিত্যধর্ম—অধর্ম্ম নহে।'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৩৪-এর 'বঙ্গবাণী'তে (পৃ ১৩৭-৪৬)। শরৎচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ শুরু করেছেন একটু নাটকীয়ভাবে। শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্যের ধর্ম" আর পরবর্তী সংখ্যায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "ধর্ম্মের সীমানা"—দুজনেরই মতদ্বৈধ ঘটেছে আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা নিয়ে। এদিকে সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে প্রাঞ্জল এবং স্পষ্ট ভাষায় শরৎচন্দ্রের মতামত প্রকাশ করে দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের ভক্তরা উত্তেজিত। তারা শরৎচন্দ্রকে বলছে—'তুমিই কোন্ কম? দাও না তোমার অভিমত প্রচার করে? আমি বলি, সে যেন দিলাম, কিন্তু তারপরে? নিজে যে ঠিক কোন্ দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তা'ছাড়া ওদিকে নরেশবাবু আছেন যে?' কবির অকস্মাৎ আঘাতে নরেশচন্দ্র যেন চমকে উঠেছেন। তাঁর বিনীত প্রশ্ন—কে এর লক্ষ্য? কিন্তু এ প্রশ্ন অর্থহীন। কারণ কবি তো বারোমাসই বিলেতে থাকেন। তিনি কি জানেন, কে আছে 'খড়্গ-হস্তা শুচি-ধর্ম্ম অনুরূপা, আর কেই-বা বংশীধারী অশুচি-ধর্ম্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালিকলমের দল।' তিনি এও হয়তো জানেন না, কোন মহীয়সী জননী 'অতি-আধুনিক সাহিত্যিক' দলন করতে ভবিষ্যৎ মায়ের সূতিকাগৃহেই সন্তানবধের সদুপদেশ দিয়েছেন। আর কবেই বা কুলি-মজুরের গল্প লিখে শৈলজানন্দ আভিজাত্য খুইয়েছেন। কারণ এ-সব পড়বার মতো ধৈর্য এবং প্রবৃত্তি কোনোটাই কবির নেই। 'এক-আধটা টুক্‌রো টাক্‌রা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুইই গিয়াছে' (পৃ ২৩৮, আশ্বিন ১৩৩৪)। কবি হয়তো বিশ্বাস করেন যে আধুনিক সাহিত্য কেবল সত্যের নাম দিয়ে নরনারীর যৌন-মিলনের শারীর ব্যাপারটাকেই অলঙ্কৃত করে। তাতে লজ্জা নেই, শরম নেই, শ্রী নেই, সৌন্দর্য নেই —আছে শুধু ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস্। কিন্তু তিনি যে-কোনো সাহিত্যিককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পেতেন যে সত্য মাত্রই সাহিত্য হয় না।

আধুনিক সাহিত্যিকদের তিরস্কার করবার অধিকার কবির আছে, কিন্তু সত্যিই কি আধুনিক সাহিত্য রাস্তার ধুলো-পাঁক তুলে নিয়ে পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করে সাহিত্যসাধনা করছে ?

রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্মে"র উত্তর দিয়েছেন নরেশচন্দ্র। হয়তো নরেশচন্দ্রের মনে হয়েছে অনেকের মতো তিনিও কবির একজন লক্ষ্য। হয়তো কখনো কখনো নরনারীর প্রেমের ব্যাপারে তিনি প্রচলিত সুনির্দিষ্ট পথ মানেননি, কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে, স্বাধীন অভিমতের অকুন্ঠিত প্রকাশে বাংলা সাহিত্যে তাঁর সমতুল কোনো লেখক নেই বলে শরৎচন্দ্রের মনে হয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের শেষদিকে মন্তব্য করেছেন যে এখন একদল নবীন সাহিত্য-ব্রতী সাহিত্যসেবার ভার গ্রহণ করেছে, তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন। এদের বিরুদ্ধে একটা অভিযান শুরু হয়েছে। অনেকেই এদের সুতীব্র বাক্যশেলে বিদ্ধ করছে। রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্মে"র শেষাংশের প্রতিবাদ করেছেন শরৎচন্দ্র। বলেছেন, বাংলা-সাহিত্য-সেবীদের সকলেই রবীন্দ্রনাথকে গুরুর আসনে বসিয়েছে। 'আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাহারা তাঁহার কানের কাছে "গুরুদেব" বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।' 'বঙ্গবাণী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৪-এ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের "সাহিত্য ও রস" (পৃ ৪৪৮-৫৬) প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে লেখক মন্তব্য করেন যে বিদেশী নভেলে যে সকল স্ত্রী-পুরুষের উদ্দামভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা দেশের প্রকৃতি থেকে গৃহীত। আর এখানে যা পাওয়া যায় তা বিশৃঙ্খল সমাজে বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ। সাহিত্যের এই প্রকৃতি নিয়েই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অস্ত্রধারণ করেছেন কিছুদিন আগে। অনেকেই তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু এ-সমস্যা 'ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার নহে।' এবং বর্তমানে তরল সাহিত্যের অনেক লেখককেই অল্পাধিক পরিমাণে এ-রোগে ধরেছে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থন করেননি লেখক। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও বিজ্ঞানে একটা মস্ত পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন--বিজ্ঞান যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সাহিত্য পক্ষপাত ধর্মবিশিষ্ট। 'সাহিত্যকে বিজ্ঞান ছাড়িয়া বিপথগামী হইতে হইবে তাহা বেরসিক লোকের পক্ষে বোঝা বাস্তবিক একটু কঠিন।' সাহিত্য কেবল রসসৃষ্টির উপাদান নয়। এটা তার কর্তব্য হলেও, তাকেই

আমরা সাহিত্যের একমাত্র বা প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য করতে পারি না। সাহিত্য মানবজীবনকে কেবল সরস করবে না, দৃঢ়ও করবে, কেবল গোলাপ মল্লিকার সৃষ্টি করবে না, শাল সেগুনও জন্মাবে। সাহিত্যের ক্রিয়া কেবল হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্ক ও মনেও আবশ্যক, আসল কেবল রসের উপর নয়, জ্ঞানেরও উপর। 'যাহা বাস্তব তাহাকে সুন্দর করিয়া দেখান সাহিত্যের কার্য্য।'

জীবনের ঘটনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়েই গল্প-উপন্যাস। এসব বাদ দিয়ে ভালো উপন্যাস হতে পারে না। কিন্তু পাপের চিত্র অঙ্কিত করতে গেলেই যে পাপের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বর্তমান লেখকদের অনেকের দোষ হল তরল সাহিত্যে চিত্রগুলি এমন করে ফুটিয়ে তোলেন যে সামাজিক জঞ্জালের সঙ্গে—সে জঞ্জাল হয়ত বিদেশ থেকে আমদানি—পাঠকের সহানুভূতি জন্মে যায়।

তিনি মন্তব্য করেন, 'বেশ্যা বা ব্যভিচারিণীর মধ্যেও মহত্ত্ব থাকিতে পারে কিন্তু সে মহত্ত্ব তাহার ইন্দ্রিয় লালসার জন্য নহে, সেই লালসার দমনে অথবা তাহার অন্যান্য মনোবৃত্তির জন্য।' লেখকের মতে গণিকার মহত্ত্ব বা দ্বিচারিণীর সতীত্ব প্রচারে ব্যস্ত না হলেও বোধহয় প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকগণের লেখা ব্যর্থ হবে না।

"সাহিত্য-ধর্ম্ম-এর জের"

রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্র

১

'সাহিত্য-ধর্ম্ম-এর জের' শীর্ষে 'বঙ্গবাণী', মাঘ ১৩৩৪ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্র' এই উপশিরোনামে দুটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে :

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার কোনও অখ্যাত অনুচর সম্প্রতি আমাকে গালাগালি দিয়া খ্যাতি-লাভের সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার করিয়াছে। সে ব্যক্তির সঙ্গে আপনার কিঞ্চিৎ নিবিড় পরিচয় সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে এরূপ পরম্পরায় শ্রুত হইলাম। তার লেখা আমার পড়িবার অবসর হয় নাই কিন্তু শুনিলাম সে নাকি লিখিয়াছে যে আপনি আমার লেখা সম্বন্ধে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহা কেবল আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, গল্প বা উপন্যাস সম্বন্ধে নয়।

লেখককে যে আপনি একথা বলিয়াছেন এবং একথা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেন আপনি একথা বলিতে গিয়াছিলেন আর একথা বলিয়া তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই বা কেন ব্যগ্র হইয়াছিলেন সেই হেতুটা বুঝিতে পারিলাম না।

কথাটা সত্য কিনা বিচার নিষ্প্রয়োজন। আপনি যখন আমাকে চিঠি লিখিয়া-ছিলেন তখন আমার কতকগুলি প্রবন্ধ গুটিকয়েক গল্প এবং খানকয়েক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি কয়েকখানা উপন্যাস আপনাকে উপহার দিয়াছিলাম। তারপর আপনি লিখিয়াছিলেন যে আমার 'লেখা' আপনি কতক পড়িয়াছেন এবং পড়িয়া সাধুবাদ করিয়াছেন ইত্যাদি এবং আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে পত্রে আপনি কোথাও এরূপ আভাস দেন নাই যে আমার লেখা অর্থে আমার প্রবন্ধ বুঝিয়াছিলেন এবং গল্প সম্বন্ধে ওকথা প্রযুজ্য নয়।

তারপর 'কাঁটার ফুল' উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তাতে আপনার পত্রাংশ

প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার ঢাকার কোনও যুবকবন্ধু কলিকাতায় আসিয়া এ কার্য্যটি করাইয়াছিলেন, আমি ইহার কথা পূর্ব্বে জানিতাম না। বইখানা হস্তগত হইবার পরই আমি সেজন্য আপনাকে বইখানা পাঠাইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, কেন না আমার মনে হইয়াছিল যে আপনার নিকট, প্রকাশের অনুমতি না লইয়া ঐ পত্র ছাপা অন্যায় হইয়াছে, এবং যে ভাবে উহা ছাপা হইয়াছে তাহাতে উহা কাঁটার ফুল বিষয়ই লেখা হইয়াছে লোকে এরূপ মনে করিতে পারে, উহা হয়তো আপনার অনুমোদিত না হইতে পারে।

আমার সে পত্রের উত্তর পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সে উত্তরে আপনি কোনওরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই এবং প্রকাশ যে আপনার অননুমোদিত এমন কথাও জানান নাই। ও কথা যে আপনি আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধেই লিখিয়াছিলেন এবং উহা আমার উপন্যাস সম্বন্ধে প্রয়োগ করা উচিত নয় ইহার আভাসও আপনি সে পত্রে দেন নাই।

তারপর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এতদিন পর আপনার সে প্রশংসা প্রত্যাহার বা তার অর্থ সঙ্কুচন করিবার ইচ্ছা হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য বা অন্যায় বলিয়া মনে করি না। কিন্তু দুঃখ এই যে আপনার সে অভিপ্রায় আমাকে না জানাইয়া আপনি আমার পরোক্ষে অন্য ব্যক্তিকে জানাইয়া তাহা প্রচার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহা এভাবে প্রচারিত হইলে যে আমি জগতের কাছে মিথ্যাবাদী ও বঞ্চক বলিয়া পরিচিত হইব এ সহজ কথাটা আপনার মনে হয় নাই ইহা মনে হয় না।

আপনার নিকট প্রশংসা ও সমাদর লাভে আমার লোভ যতই থাকুক, তাতে আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। সুতরাং আপনি যদি আপনার অভিপ্রায় আমাকে জানাইতেন তবে আমি স্বয়ং প্রকাশ্যে ভুল বুঝিবার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিয়া সে পত্র প্রত্যাহার করিতাম। কেননা যিনি আমাকে সমাদর করিয়া লজ্জিত তাঁর সমাদর লইয়া বড়াই করিয়া বেড়াইব এতটা দৈন্য আমার নাই।

তা ছাড়া সময়ে জানিলে আর একটা উপকার হইত। গত অগ্রহায়ণের বিচিত্রায় আমার যে লেখা বাহির হইয়াছে, বোধ হয় "পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছেন" যে তাতে আমি প্রকাশ করিয়াছি যে 'শান্তি' প্রকাশিত হইবার পর আপনি আমাকে সাক্ষাতে সে বইয়ের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াই যেরকম কুণ্ঠিত দেখিতেছি, তাতে একথা প্রকাশ হওয়ায় নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেছেন। আপনার মত পরিবর্ত্তনের বিষয় আগে জানা থাকিলে

কথাটা প্রকাশ করিয়া আপনাকে বিড়ম্বিত করিতাম না।

যাহা হউক, আমার প্রকাশককে জানাইয়া আমার বইয়ের বিজ্ঞাপন হইতে আপনার পত্রখানি উঠাইয়া লইতে উপদেশ দিতেছি। যাহা ছাপা হইয়া গিয়াছে তাহার উপর আমার হাত নাই, সেজন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে যদিও কর্ত্তব্যানুরোধে সম্প্রতি আমাকে আপনার অপ্রীতিভাজন হইতে হইয়াছে, তথাপি প্রকাশ্যে আমার গ্রন্থাবলীর বহুস্থানে আপনার সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছি এখনও তার কোনও অংশ বিন্দুমাত্র সঙ্কোচন বা প্রত্যাহার করিয়া দত্তাপহারকের প্রত্যবায় অর্জ্জন করিবার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা আমার হয় নাই। আপনার প্রতিভার প্রতি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অচলা আছে এবং আশা করি চিরদিন থাকিবে।

আর একটা কথা বলি। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির উপর যদি আপনার ক্রোধের কোনও কারণ হইয়া থাকে তবে স্বয়ং আঘাত করিতে কি আপনি কুণ্ঠিত? আপনি যদি আঘাত করিতে ইচ্ছা করেন তাতে নিন্দার কোনও কথা নাই, আর আমিও যদি সাধ্যমত আত্মরক্ষার চেষ্টা করি তাতেও কেহ দোষ দিতে পারিবে না। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণে অক্ষম সেই শিখণ্ডীর দল দাঁড় করাইয়া গোপনে অস্ত্রাঘাত কি শিষ্ট যুদ্ধনীতি?

এমন একটা ব্যক্তিগত বিষয় লইয়া কাগজে ঘাঁটাঘাঁটি হয় ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে আপনার অনুচরটি খবরটা অত্যন্ত ছড়াইয়াছে এবং তার চালে হয়তো আমি লোকের কাছে মিথ্যাচারী সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছি। সেজন্য এই পত্রখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। আপনার যদি সে বিষয়ে কোনও আপত্তি থাকে তবে জানাইলে বাধিত হইব।

প্রণত

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

২

ওঁ

কলিকাতা

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

সামাজিক প্রবন্ধে আপনার সাহসিকতা দেখিয়া আমি আপনাকে প্রশংসা করিয়াছি। সে সময়ে সমাজ-বিরুদ্ধ মত অসঙ্কোচে প্রকাশ করা সহজ ছিল না।

গল্প রচনায় যদি কিছুর প্রশংসা করিতে হয় তাহা ভাষানৈপুণ্য ও কল্পনাশক্তির,— সামাজিক দুঃসাহসিকতা গল্পসাহিত্যের মুখ্য ও প্রশংসাযোগ্য পরিচয় হইতে পারে না। যখন আপনার গল্পের বহির বিজ্ঞাপনে উক্ত পত্রাংশ দেখিতে পাই তখন বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং যে কেহ আমাকে এসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই ভাবেই উত্তর দিয়াছি। বিনাপ্রশ্নে একথা লইয়া আলোচনা করিবার কথা সম্প্রতি বা পূর্ব্বে আমার মনেও উদয় হয় নাই।

আপনার সহিত মতের বা রুচির পার্থক্য লইয়া ক্ষোভ অনুভব করি নাই। "সাহিত্য-ধর্ম্ম" প্রবন্ধে আমি আপনাকে লক্ষ্য করি নাই; আপনার গল্প আপনি কি ভাষায় ও কি ভাবে লেখেন তাহা আমি জানিও না। সাময়িক পত্রে বা গ্রন্থ আকারে যে গল্প বা কবিতা পড়িয়া আমি লজ্জা ও দুঃখ বোধ করিয়াছি আপনার লেখা তাহার অন্তর্গত নহে। সুদীর্ঘকাল আপনার লেখা পড়িবার অবকাশ হয় নাই।

যখন আমি বিদেশে ছিলাম আপনি আমাকে মিথ্যাচারী প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিয়াছেন। এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সাক্ষ্যের অপেক্ষা মাত্র করেন নাই। হয় আপনি বিশ্বাস করিয়াছেন এরূপ মিথ্যাচার আমার পক্ষে অসম্ভব নহে, নয় বিশ্বাস না করিয়া লিখিয়াছেন। ইহা মত বা রুচিগত আচরণ নহে, চরিত্রগত, এই কারণেই ইহা ক্ষোভের বিষয়। ইতি ১৩ অগ্রহায়ণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনার পত্রাংশ আমার বইয়ের বিজ্ঞাপনস্বরূপ বাহির হইবার পর আপনি সে বিষয়ে আলোচনা ও মত প্রকাশ করিবার একাধিক অবসর পাইয়াছিলেন; আমার এক পত্রেই এ বিষয় আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলাম এবং তদুত্তরে আপনি জানাইয়াছিলেন যে ইহাতে আপনার অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণই নাই। সে কথা বোধহয় আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন। যাহা হউক এ বিষয় লইয়া আপনার সহিত বাগবিতণ্ডা করা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা হইবে। আমি কেবল নিজের মান রক্ষার জন্য যাহা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি তাহাতে আমি আনন্দ বোধ করি নাই।

এই প্রসঙ্গে আপনি যে আপনার মালয়ের কার্য্য সম্বন্ধে আমার পত্রের কথা উপস্থিত করিয়াছেন তার প্রসক্তি করিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমার সে পত্র বোধহয় আপনার দেখিবার অবসর হয় নাই; তার বিবরণ পরম্পরায় শ্রুত হইয়া থাকিবেন। সে পত্রে আপনার উপর কোনও মিথ্যাচার আরোপ করা হয় নাই; পক্ষান্তরে বলা হইয়াছিল যে "I do not doubt the truth or sincerity of his statement, but the question is whether that was the time or place for making it." স্থান কাল হিসাবে আমি আপনার উক্তি অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলাম যে ইহার পর যদি কেহ আপনাকে বলে যে গভর্ণরের নিমন্ত্রণের খাতিরে আপনি একথা বলিয়াছিলেন তবে তাহা আশ্চর্য্যের হইবে না—ইহা যে আমি মনে করিয়াছি এমন আভাস মাত্র দেই নাই।

আপনার কথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিয়াই কথাটা লিখিয়াছিলাম সত্য কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত ঐ ব্যাপারের এমন কোনও পূর্ণতর বিবরণ দেখি নাই যাহাতে আমার ঐ মত পরিবর্ত্তন করিতে হইতে পারে। যদি তেমন বিবরণ দেখিতাম তবে আমি সর্ব্বাগ্রে অপরাধ স্বীকার করিয়া আমার উক্তি প্রত্যাহার করিতাম।

আপনি এ ব্যাপারে আমার মত বা রুচিগত প্রভেদ না দেখিয়া আমার চরিত্রের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন। আপনার অন্তর্দৃষ্টি চিরদিনই অসাধারণ বলিয়া বিখ্যাত। ইহা বোধহয় সেই অসাধারণত্বের একটা নিদর্শন। কোনও কথা বিশ্বাস না করিয়া বলা বা কাহারও উপর অযথা দুরভিসন্ধি আরোপ করা যে আমার চরিত্র নয় একথা আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকিলে আপনি জানিতে পারিতেন। যার চরিত্র বা আচরণ সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই তার একটা বিশিষ্ট অভিমতের অপব্যাখ্যা করিয়া তার চরিত্রে দোষারোপও চরিত্রের একটা গুরুতর ত্রুটি প্রকাশ করে। মতভেদ সম্বন্ধে যে অসহিষ্ণুতা ও অতিরিক্ত আত্মাভিমান এই প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে তাহা আমাদের দেশে বিরল নয়। দুঃখ এই যে আপনার মত লোকের প্রতিভাও সে দোষ হইতে মুক্ত নয়। ইতি

প্রণত

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

'কল্লোল'

'কল্লোল' পত্রিকার আষাঢ় ১৩৩৪ সংখ্যায় অমলেন্দু বসু লিখেছেন "অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্য।" এ-প্রবন্ধে লেখক তরুণদের বিরুদ্ধে যে যৌনচারিতার অভিযোগ আনা হয়েছে তারই উত্তর দিয়েছেন। বিশেষ করে অমল হোম দিল্লি সাহিত্য সম্মিলনে যে প্রবন্ধ পড়েছিলেন এ-প্রবন্ধে তরুণদের পক্ষ থেকে সেইসব অভিযোগের উত্তর দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর এই একই নামের প্রবন্ধে যত অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন অমলেন্দু বসুর আলোচনা তত অনুপুঙ্খ নয়। লেখক জানিয়েছেন যে অভিযুক্ত এই অতি-আধুনিক কথাসাহিত্য প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। 'কল্লোল' পত্রিকার সবে পঞ্চম বর্ষ শুরু হয়েছে এবং 'কালি-কলম'-এর এক বৎসর পূর্ণ হল। জনদশেক তরুণ লেখক যদি চার বৎসরের মধ্যে দেড়খানা পত্রিকার অন্তর্বর্তিতায় রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় একটি স্বকীয় বিশেষত্বপূর্ণ সাহিত্যযুগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় তাহলে তা বিশেষ গৌরব ও বিস্ময়ের ব্যাপার।

রিয়ালিস্টিক সাহিত্য সমস্যার বিভ্রাটের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে। এ-কথা সত্য ইউরোপের সভ্যতায় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের যে বিপুল সামাজিক আলোড়ন তার সদৃশ পটভূমি এখানে রচিত হয়নি। এখানকার কোনো তরুণ সাহিত্যিক যদি 'কুলী-ধাওড়ার' দৈন্য ও কুশ্রীতার আড়ালে প্রাণের শাশ্বত লীলার পরিচয় পান, যদি এই কুশ্রীতা চোখের ওপর দেখেন ও পীড়িত হন তখন তিনিও সেই বিপুল পঙ্গুতা ও অসাফল্যের ইতিহাস রচনা করেন।

একটি পুরুষ ও একটি রমণী অবৈধ উপায়ে তাদের বহুকাল-বঞ্চিত লালসা চরিতার্থ করবার পূর্বে মনে করে যে, তারা অন্যায় করছে, কিন্তু বিবেকের এই সাবধান বাণী বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না কারণ অসৎ প্রবৃত্তি এবং বঞ্চিত হৃদয়-বিক্ষোভ তাকে তাড়িত করে। সেখানে পুরুষ ও নারীর রক্তমাংসের কামনা যদি সহসা শান্তশুভ্র পবিত্রতায় পরিণত হয় তবে সুনীতিপরায়ণ মহাত্মা খুশি হতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিকভাবে সেখানে মানবতার পরিচয় পাওয়া যায় না। লেখক মন্তব্য করেছেন, 'স্থানপাত্রবিশেষে অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ের বুভুক্ষার বিবরণ নব-কামায়ণ

হয় বলিয়া আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না' (পৃ ২১২)।

এই সংখ্যায় 'ডাকঘর' পর্যায়ে বিহার সাহিত্য সম্মিলনের সভানেত্রীরূপে অনুরূপা দেবী মজঃফরপুরে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এমনসব সন্তান গর্ভে বহন ও বক্ষশোণিতে বর্দ্ধন না করিয়া সূতিকায় একটু করিয়া নুন দিলেই ভাল হইত। প্রতিবেশীর ঘরগুলি নিরাপদ হইতে পারিত, সধবা-বিধবা নির্বিশেষে সর্ব্বদাই পুরুষের জ্বলন্ত ক্ষুধিত দৃষ্টির শিকার হইয়া ফিরিতে হইত না।'

'কল্লোলে' ভাদ্র ১৩৩৪-এর 'ডাকঘর' পর্যায়ে যে লেখা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে তরুণদের ক্ষোভ স্পষ্ট ধরা পড়ে। তাদের মতে, অনেকে যা লুকিয়ে-ছাপিয়ে করে নির্বিবাদে দিন কাটাচ্ছিল, তরুণরা সে-সব বিষয় এনেছে প্রকাশ্যে। সাহিত্যতীর্থে এখন দেখা দিয়েছে পাণ্ডাদের আধিপত্য। পাণ্ডারা বড়লোক ধরে ব্যবসা চালায়। পাণ্ডার স্তোকে বড়লোকদের পদমর্যাদা জ্ঞান পর্যন্ত লুপ্ত হয়। নিরন্তর তোষামোদে তারা এমন কাজ করেন যার ফলে তাঁদের মর্যাদার হানি হয়। তরুণদের লেখায় অসংযমের উল্লেখ করে পাণ্ডারা অপদস্থ করতে চাইছে তরুণদের—কিন্তু প্রবীণ লেখকরা এই অসংযমের শিকার আরো বেশি। এদেশে অনেক সাহিত্যিকই বড় লেখকের অনুগ্রহ পেয়ে নিজেকে সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত করবার চেষ্টা করে। 'কল্লোলে' তাই মন্তব্য আছে, 'যে দেশে কবির প্রশংসা পত্র ছাপাইয়া তেল বা বই বিক্রী হয়, সে দেশে প্রসিদ্ধ কোনো কবি বা সাহিত্যস্রষ্টার গা ঘেঁষিয়া থাকিয়া কতকগুলি লোক যে সাহিত্যিক বলিয়া বাজারে চলিয়া যাইবে ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।'

ভুল-ভ্রান্তি করা তরুণদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু প্রবীণদের লেখায় চিৎপুরের রাস্তার ন্যাঙ্গোট-পরা সাহিত্য দেখে তরুণরা স্তম্ভিত হয়। 'তবু আচার্য্যের হাতের প্রথম নিক্ষিপ্ত বাণ্ যতই অকরুণ হউক ধর্ম্মযুদ্ধে তরুণ তাহা আশীর্ব্বাদ বলিয়া মাথায় পাতিয়া লইয়াছে।'

আশ্বিনের 'ডাকঘরে'ও তরুণদের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগের প্রতিবাদ আছে। আধুনিক সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রচারের বিরুদ্ধে সমালোচকগণ যে প্রবন্ধ রচনা করছেন তা অধিকতর অশ্লীলতাপূর্ণ বলে মনে হয়েছে 'কল্লোলে'র তরুণদের।

আশ্বিন ১৩৩৪-এর 'কল্লোল' পত্রিকায় 'ডাকঘর' পর্যায়ে লেখা হল, 'যাঁহাদের ধারণা আধুনিক সাহিত্য কিছুই হইতেছে না এবং তরুণ-সাহিত্যিকেরা যাহা

লিখিতেছেন তাহা অসুন্দর ও অক্ষম রচনা, তাঁহাদের বুঝাইবার জন্ত আমরা গত কয়েক সংখ্যায় তরুণদের দিক হইতে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, আধুনিক সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রচারের বিরুদ্ধে সমালোচক-গণ যে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন তাহা অধিকতর অশ্লীল ভাষণে পরিপূর্ণ। ইহা দেখিয়া আর কিছুই বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ দেখা গেল, এরূপ জঘন্য রুচির লেখাও বাঙলার জনসাধারণ নীরবে সহ্য করিতেছেন, কেহই এরূপ আলোচনার কোন রূপ প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হন নাই। আজকাল "আধুনিক সাহিত্যের" সমালোচকবর্গের মধ্যেও নানা রুচির লোক দেখা যাইতেছে।' এরপর মন্তব্য আছে যে জনসাধারণ পুজাপার্বণে অনেক সঙ দেখে এবং সঙের মুখে অবান্তর ও অশ্রাব্য উক্তি শুনে উপভোগ করে, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এরূপ সঙ প্রচলন হলে সাহিত্যের আভিজাত্য থাকবে না।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৪-এর 'কল্লোলে' "অসংলগ্ন" লিখেছেন শ্রীকৃত্তিবাস ভদ্র ছদ্মনামে প্রেমেন্দ্র মিত্র। সেখানে তরুণদের পক্ষে 'তাদের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে'। ভাষাকে বদ্ধ জলের অচলতা থেকে মুক্তি দিয়ে সচল ক্রিয়ার স্রোতে ভাসাতে এককালে লেখকদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কূলের মোহে সে মরা-ভাষার কূল আঁকড়ে জীবনের ডাকে অনেকদিন পর্যন্ত কান দেয়নি। ব্যাপারটা এখন অনেক সহজ হয়েছে। সাহিত্যের দরবারে কুলীন ভাষার অস্তিত্ব লোপ পায়নি কিন্তু তার পাশে চলতি ভাষার আসন মঞ্জুর হয়েছে। 'কুলীন ভাষার ভাঙা বেড়া টপকে নাম গোত্রহীন দেশজ শব্দের আনাগোনাও সুরু হয়ে গেছে।'

'কল্লোল', ১৩৩৪ চৈত্র সংখ্যায় "বৃদ্ধের পত্র" নামে একটি লেখা (পৃ ৯৪৩-৯৪৫) প্রকাশিত হয়েছে। এ-লেখায় তরুণদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও 'শনিবারের চিঠি'র প্রসঙ্গে আলোচনা আছে। আনাতোল ফ্রাঁস যে একবার বিশেষ অনুরুদ্ধ হয়ে এক ফরাসী লেখকের বিরুদ্ধে কলম ধরে তাঁকে 'অবহেলায় ভূমিশায়ী' করেছিলেন লেখক সে-উদাহরণ এনে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে এসেছেন। লিখেছেন, 'লোকমুখে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনুরুদ্ধ হয়েও অস্ত্র ধারণ করেননি। "সাহিত্যিক স্বল্পায়ুদের" আঘাত করতে তাঁর সবল হস্ত চিরদিন অনুকম্পায় শিথিল হয়ে উঠত। এবং তাই তো ক্ষাত্রধর্ম্ম।...রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-চ্ছায়া আপনাদের ওপর নেই, এতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আপনাদের সাহিত্যে অভিনবত্ব কিছুই নেই, থাকলে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না।

বাংলা-সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক লেখা যে আর্ট হয়ে উঠেছে, তা তাঁর দৃষ্টি

এড়ায় নি। যথাসময়ে তিনি তাকে যথাভাবে স্বীকারও করেছেন।' এরপর লেখক রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণ যে কত সর্বব্যাপী তার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন 'শনিবারের চিঠি' সুনীতিবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিটি প্রকাশ করেছে তা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের বিনা অনুমতিতেই ছাপা হয়েছে। এ-চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'কে আর্টের পদবীতে উন্নীত করেছেন। এই চিঠির সূত্রে লেখক 'শনিবারের চিঠি' সংগ্রহ করে পড়ে খুব হতাশ হয়েছেন। 'এই জঘন্য কুৎসা ও ব্যক্তিগত গালি-গালাজ তিনি কি করে আর্ট বললেন' তা লেখক বুঝতে পারেননি। লেখকের মনে হয়েছে যে একদিন যারা রবীন্দ্রনাথের কুৎসা করে কুৎসা-কাব্য রচনা করেছিলেন তাঁদের আর্ট থেকে এদের আর্টের কোনো তফাৎ নেই।

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন "আমি কেন নীরব", 'কল্লোলে'র ১৩৩৫, বৈশাখ সংখ্যায় (পৃ ৫৭-৬১)। কেন যোগ দেননি তিনি এ-বিতর্কে? কারণ এ-লড়াই তরুণে-তরুণে, নবীনে-প্রবীণে নয়। 'উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই যে এ ক্ষেত্রে raw recruits সম্প্রতি তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি। এ যুদ্ধে যোগ দেবার আমার অধিকার নেই।' সাহিত্য নিয়ে আজকাল যে তর্ক শুরু হয়েছে তা দার্শনিক নয়, কারণ তার ভিতর যতটা উত্তাপ আছে ততটা আলোক নেই। ইউরোপে এখন যাঁরা বড়ো সাহিত্যিক বলে গণ্য তাঁদের প্রত্যেকের একটা না একটা সামাজিক ফিলজফি আছে। তাঁরা শুধু নবসাহিত্যের স্রষ্টা নন, তাঁরা নব সমাজও গড়তে চান। টলস্টয়, ওয়েলস্, বার্নার্ড শ', ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ—এঁরা সকলেই সমাজতন্ত্রের মন্ত্রদাতা গুরু। কিন্তু কাব্য হচ্ছে সকল ism-এর অতিরিক্ত। কারণ কোনো ism-ই সম্পূর্ণ human নয়। ism হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রার একটা হিসেব মাত্র। ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের যে social philosophy-র কথা বলা হয়েছে আসলে তা moral philosophy। বার্নার্ড শ, ওয়েলস্, ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ প্রভৃতি ঘোর moralist। 'তবে যে লোক তাঁদের immoralist বলে, তার কারণ তাঁরা যে morality প্রচার করছেন সে হচ্ছে new-morality. এঁরা যে পুরোনো copy-book morality-র বিরুদ্ধে, তার কারণ তাঁরা চান যে, ভবিষ্যতের copy-book morality হবে তাঁদের morality.' যে দল পূর্ব-morality-র পক্ষ আর যে দল উত্তর-morality-র পক্ষ, এই দুই দলে বাগ-যুদ্ধ বাধবেই। এ তর্ক তখনই থামবে যখন লোকে উপলব্ধি করবে যে, science এবং art হচ্ছে beyond good and evil। এই সত্যকে লোকে গ্রাহ্য না করলে moral এবং immoral লেখাকে কাব্য বলে চালাতে চেষ্টা করবে। আর সমালোচকরা তা অচল করবার চেষ্টা করবে।

১৩৩৪-এর ৪ ও ৭ চৈত্র বিশ্বভারতী সম্মিলনী থেকে জোড়াসাঁকোস্থ 'বিচিত্রা' গৃহে দুটি সভা আহূত হয়। 'কল্লোল' পত্রিকার ১৩৩৫-এর বৈশাখ সংখ্যায় সেই সভার বিবরণ (পৃ ৮১-৮২) 'ডাকঘর' পর্যায়ে প্রকাশিত হয়। সেখানে আছে, 'দুই দিনই বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমরা কয়েকজনও নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।...

এই সভার প্রথম দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল "বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রবর্ত্তনা" ও দ্বিতীয় দিনের বিষয় ছিল "সাহিত্য সমালোচনা"।'

'কল্লোলে'র বিবরণ অনুযায়ী সেই সভার প্রথম দিন কবি মাইকেল মধুসূদনের কথা অবতারণা করে বলেন যে, মধুসূদনের সামনে কাব্যের একটা রূপ ছিল, সেই রূপকে সার্থক করবার জন্য তাঁর নিজস্ব প্রতিভায় বাঙলা ভাষাকে তিনি নিজের মতো গড়ে নিয়েছিলেন। তিনি এজন্য বাঙলায় কি কথা চলতি তার দিকে দৃষ্টি-পাত করেননি। পৌরাণিক যুগের শৌর্য-বীর্য-মহিমার যে দৃশ্য তিনি মনশ্চক্ষে দেখেছিলেন তাকে কাব্যে ব্যক্ত করাই তাঁর সাধনা ছিল।

নবযুগ বলে সাহিত্যে কিছু আছে তা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন না। সাহিত্যের মহারথীরা পুরাতনকে মুছে ফেলে আসেন না, তাঁরা যুগান্তর আনেন না। বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চিম থেকে ধারাবাহিক গল্পের এক নূতন রূপ পেয়েছিলেন। তিনি বাঙলা ভাষায় সেই সকল গল্পের রূপকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন, তিনি অনুকরণ করেননি। পশ্চিম থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন মাত্র এবং সেই প্রেরণাকে তিনি নিজের প্রতিভায় সার্থক করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে যুগ হিসেবে সাহিত্যকে ভাগ করা অন্যায়। সাহিত্যের সত্যকার কোনো সিংহাসন নেই, তাই একজনকে না সরালে আরেকজনের প্রতিষ্ঠালাভ হবে না তা সত্য নয়;

অনুকরণমাত্রই যে দোষের তা নয়। অনুকরণের মধ্য দিয়ে সত্যিকার সাহিত্যিক তাঁর নিজের বিশিষ্টতা খুঁজে পায়। সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি, তার উপর সাহিত্যের মূল্য নির্ভর করে না। লেখক নিজের রূপকে পরিস্ফুট করতে পারছেন কিনা এবং তা সত্যিকার সাহিত্য হয়েছে কিনা তাই বিচার্য। সাহিত্য বিষয়বস্তু থেকে অপরূপ কৌশলে রস সৃষ্টি করে। সেই রসসৃষ্টি যেখানে না হয় সেখানে বিষয়ের কোনো পৃথক মূল্য নেই।

সমালোচনার নামে যে জঘন্যভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং অত্যন্ত নীচতার সঙ্গে কারো পারিবারিক কুৎসা প্রচার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করেন।

নবীন লেখকদের কবি বলেন যে তাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের কোনো পার্থক্য নেই, আর একথা জানতেন বলেই তিনি তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

দ্বিতীয় দিনের সভায় প্রথম দিনের তুলনায় লোকজন বেশি ছিল। সেদিনকার আলোচনার বিষয় ছিল, "সাহিত্য সমালোচনা"। 'রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বলেন, মানুষের মধ্যে যাহা চিরন্তন শ্রদ্ধার অধিকারী সেই মহামূল্য মনুষ্যত্বের পরিচয়ই আমরা সাহিত্যে পাই। যে ক্ষুধা বা যে প্রবৃত্তি মানুষের ক্ষুদ্র, যাহা ভোগ করিলে আর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না, তাহা লইয়া শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনা সার্থক হয় নাই। মানুষের যে সব ক্ষুধা যে সকল কামনা পূর্ণ হইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, সেই উদ্বৃত্ত ঐশ্বর্য্যই কাব্যে, শিল্পে, বর্ণে, বাক্যে, ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করে। যাহাকে আধুনিক সাহিত্য বলা হয় তাহার সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি কখন কিছু বলেন নাই। শুধু দুই একটি অস্পষ্ট লেখার গতি দেখিয়া সাহিত্যের বিপদ সম্বন্ধে ভীত হইয়া তিনি নিজের কথা লিখিয়াছেন। তাহাতে কাহাকেও তিনি নিন্দা করিতে চাহেন নাই।

তিনি আরো বলেন, সাহিত্যে দোষ ত্রুটি থাকে। যে সমস্ত দোষের কথা তিনি বলিতেছেন তাহা তাঁহার নিজের লেখাতেও অল্প বিস্তর আছে। "সে কথা অস্বীকার করব এত বড় দাম্ভিকতা আমার নেই" বলিয়া তিনি লেখার সমগ্রতা দিয়া লেখার বিচার করিতে বলেন।

সর্ব্ব শেষে রবীন্দ্রনাথ নবীন লেখক কয়েকজনকে ডাকিয়া বলেন, তাহারা যেন রাগ না করে। তাঁহাকেও একদিন শুধু নয়, চিরকাল ধরিয়াই আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। "তোমাদের শক্তি আছে, তোমরা নিজের শক্তির পরিচয় দিয়ে নিজের পথ কেটে যাবে, সত্যকার সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তোমরা নিজেদের সত্যকার মর্যাদা দিও" ' (পৃ ৮২)।

'শনিবারের চিঠি'

১

'শনিবারের চিঠি' ভাদ্র ১৩৩৪-এর সংখ্যায় সজনীকান্ত দাসের চিঠি এবং রবীন্দ্র-নাথের ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩৩-এর উত্তর প্রকাশিত হয়। এরপর সেখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত ব্যক্ত করা হয়। ২৪শে মাঘ তারিখে সজনীকান্ত এবং মোহিত-লাল মজুমদার শরৎবাবুর রূপনারায়ণ নদীতীরস্থ গৃহে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। মোহিতলাল সেখানে কথা প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে দুর্নীতির আলোচনায় তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শরৎচন্দ্র সে প্রবন্ধটি কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করতে বলে অভিমত দেন, 'বাঙলা সাহিত্যে যে জঘন্যতা প্রকাশ পাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন আবশ্যক।' তিনি আরো বলেন, 'শিক্ষাদীক্ষাহীন অর্বাচীন ছেলেরা সাহিত্যের আবহাওয়া দূষিত করিলে সহ্য করা যায়, নজরুল ইস্‌লামের অশিক্ষিত-পটুত্ব তাঁহাকে কোনো বন্ধনের মধ্যে রাখিতে পারে না, কিন্তু নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতো পণ্ডিতজন যখন এই পঙ্কিলতার সৃষ্টি করেন তখনই তাহা মারাত্মক হইয়া ওঠে' (পৃ ৬-৭)। যোগানন্দ দাসের 'পুরুষসিংহম' লেখায় ও সাহিত্যে দেহচর্চার বিষয়ে আলোচনা আছে।

শ্রীকেবলরাম গাজনদারের "কচি ও কাঁচা" প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৩৩৪-এর ভাদ্র সংখ্যা থেকে। ভূমিকায় বলা আছে, 'এই নাটকোল্লিখিত শেলী, হুইটম্যান, স্ট্রিণ্ডবার্গ, বাইরন, লেনিন, হার্ডি, ট্রট্‌স্কি প্রভৃতি পাত্রগণ পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা নহেন। ইঁহাদের পিতৃদত্ত অন্য নাম আছে কিন্তু বাংলার সাহিত্য-সমাজে ইঁহারা যথাক্রমে শেলী, হুইটম্যান, প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। সুতরাং শেলী হুইটম্যান ইত্যাদিকে বাঙলার শেলী হুইটম্যান ইত্যাদি ভাবিতে হইবে।' এই নাটকের পাত্রপাত্রীরা—সম্পাদক, কার্ল মার্কস, শেলী, লেনিন, ট্রটস্কি, হুইটম্যান, বাইরন, হার্ডি, স্ট্রিণ্ডবার্গ, বৌদি, পটুলি, খেঁদি, ছেঁড়া নেকড়া, ভাঙা চুড়ি, পচা ইঁদুর, মাছের আঁশ ইত্যাদি। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য নেবুতলার বস্তিতে। কয়েকটা খোলার ঘরের সামনে লেখককুল দাঁড়িয়ে। পাশাপাশি দুইটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পটুলি, খেঁদী, পাঁচী, ডালিম, বেদানা ও পুঁটি বিড়ি ফুঁকে হাস্য-

পরিহাস করছে। হুইটম্যানের সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে জীবনের সমস্ত গ্লানি পঙ্কিলতা ঐ বিড়ির ধোঁয়ার মতো এরা নির্বিঘ্নে উড়িয়ে দিচ্ছে। তার মনে হয়—জন্ম যেন নিই আমি ইহাদের ঘরে / সম্মুখে দাঁড়ায়ে যারা / দুস্থ সংসারের সব নির্দ্দয়তা দলি / হাস্যে লাস্যে পড়িতেছে শতধা হইয়া-/ ফের যদি।

হার্ডির ইচ্ছা অন্য—সে চায় তিন নম্বর ধাওড়াতে ফুলিয়ার কোলে জন্ম নিতে—কালো দেহে কালিঝুলি মেখে আদিম মানব-মানবীর স্নেহে বেড়ে উঠতে। আর স্ট্রিণ্ডবার্গ যে দেখেছে শুধু বুভুক্ষা, ক্ষুধা—দেখেছে কোটরগত চক্ষু, হাড়গিলের মতো চেহারা।—'তোমরা দেখছ ডুরে আলপাকা সাড়ী, আমি দেখছি নগ্ন বীভৎসতা; বীভৎসতা! সুন্দর বীভৎসতা!! তোমার মধ্যে একবার অবগাহন করতে দাও; আমি ডুবে যাই,—তলিয়ে যাই।'

স্ট্রিণ্ডবার্গ। এসো এসো শেলী, এসো হুইটম্যান,—হার্ডি—? হার্ডি কোথায় গেল? এস হার্ডি ঢুকে পড়া যাক! তোমরা যে রাজ্যে বাস কর, খাও দাও চল ফের, সেটা বাইরের জগৎ, ডিমের খোলস, কাঁকড়ার খোলা, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সব এখানে, ওই দরজার ভেতরে, ভাঙা চারপায়ার ওপর! দুনিয়ায় আর কিছু নেই—দাদা—সব ফাঁকা ফক্কিকারি। এরপর পটুলি—চল্‌লো, ডালিম, যত ক'টা বাঙাল এসে জুটেছে। নাচ্‌তে এসে ঘোম্‌টা টান্‌ছেন। দেব এখুনি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে। ওগো বাবুমশাইরা, শুনছ। এখেন থেকে সুড় সুড় করে খ'সে পড়ত, আমাদের খদ্দের ভাগ্‌লে ভালো হবে না বলে রাখছি। যাও যাও, ঘরে গিয়ে পল্‌তেয় দুধ খাও।

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন, 'অতি-আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের লইয়া একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করিয়া ফেলিলাম, নাম দিলাম "কচি ও কাঁচা"; নিদারুণ ব্যঙ্গাত্মক আঘাত ইহাতে ছিল।…একদিন স্বয়ং 'কল্লোল'-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন মনীশ ঘটক সমভিব্যাহারে আমার বাসায় দর্শন দিলেন এবং এ-কথা সে-কথার পর নাটকটি শুনিতে চাহিলেন। আমি সোৎসাহে পড়িয়া শুনাইলাম। দীনেশরঞ্জন অতিশয় ভদ্র পয়োমুখ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মনে যাহাই থাকুক, মুখে লেখাটির বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং 'কল্লোলে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশার্থ প্রার্থনা করিলেন। প্রস্তাবের অসম্ভবতা বুঝিয়াও আমি অনুগৃহীত হইলাম।' 'শনিবারের চিঠি' ভাদ্র ১৩৩৪-এ প্রকাশিত হয়েছে সজনীকান্ত দাসের "আধুনিক বাঙলা সাহিত্য"। মন্তব্য আছে যে এই প্রবন্ধটি বিগত বৎসর ফাল্গুনে রচিত। বিগত পৌষ মাসে শ্রীঅমল হোম দিল্লীতে 'বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের' পঞ্চম

অধিবেশনে "অতি আধুনিক কথা সাহিত্য" নামে একটি নিবন্ধ পাঠ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং 'রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যমুখ্যগণ ইহার বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। সাহিত্যচিত্তের ক্ষণিক বিক্ষেপ যত শীঘ্র তাহার যোগ্য স্থান লাভ করে সাহিত্যের পক্ষে ততই কল্যাণ।"

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা"র উল্লেখ আছে 'শনিবারের চিঠি'র আশ্বিন, ১৩৩৪-এর সংখ্যায় 'সাহিত্য-সংবাদ'-এ। সেখানে বলা হয়েছে যে আধুনিক সাহিত্যের ভগীরথ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সকল যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করে আধুনিক সাহিত্যের জহ্নুমুনি নরেশচন্দ্র হঠাৎ উচ্ছ্বাসের মুখে বলে ফেলেছেন, 'সাহিত্যে criminology খারাপ, কিন্তু আমি ত criminology নিয়ে লিখিনি।' 'শনিবারের চিঠি'র মন্তব্য: বাঙালি পাঠকের দুর্ভাগ্য! তারা নরেশবাবুর এই criminologyটুকুই রসস্থ হইয়া পাঠ করিত, এখন নরেশবাবুই যদি বলেন criminology লেখেন নাই তাহা হইলে তাহারা পড়িবে কি? (পৃ ১১৭)

১৩৩৪-এর কার্তিক সংখ্যায় প্রথমেই প্রবন্ধ "সাহিত্য-বিভ্রাট"। সেখানে বলা হয়েছে যে বিদেশী-ভাবকল্পনার উত্তাপে আমরা সাহিত্যে যৌনতত্ত্ব ও মুটে-মজুর আমদানি করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো এর মধ্যে সত্য সত্যই কি আন্তরিক অনুভূতি আছে, না এটা 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া মাত্র'। যৌনতত্ত্বটা কিছু নতুন নয় কিন্তু তত্ত্ব জিনিসটা তো সাহিত্য নয়। সাহিত্য গড়তে হলে একে জীবনের ভিতর দিয়ে আনতে হবে। 'শুধু ক্ষুদ্র লালসার আক্ষেপ' যৌনতত্ত্ব নয়; শুধু 'শৃঙ্গারের-হিয়া' 'রমণীরমণ' 'কামকণ্টকব্রণ' লিখলেই চলবে না।

ঘুমন্ত মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সৃষ্টি-উন্মত্ত সন্তানের মনে পূর্বজন্মের প্রিয়ার স্মৃতি জেগে উঠল—এই কথা এক তরুণ লেখক গল্পের মধ্যে লিখেছেন—তার ভক্তরা তাকে বাহবা দিয়েছে। 'Aedipus Complex-এর কী অপূর্ব ব্যঞ্জনা। এর উপর টীকা করা বাহুল্য। ফ্রয়েড যদি জানতেন যে বাঙালী সাহিত্যিকদল তাঁর মতবাদের কিরূপ সদ্ব্যবহার করছেন, তা' হ'লে তিনি নিশ্চয়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।'

"সাহিত্য-ধর্ম্ম" প্রসঙ্গে লেখেন সজনীকান্ত, কার্তিক ১৩৩৪-এর (পৃ ১৮২-১৯৩) 'শনিবারের চিঠি'তে। 'বিচিত্রা'য় "সাহিত্য-ধর্ম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাজপুত্র কোটালপুত্রের উদাহরণ দিয়ে সাহিত্যের মূল সূত্র ও চিরন্তন সত্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অপরাধ তিনি স্পষ্ট করে বলেননি যে রাজপুত্র শুধু রাজকন্যার মন জয়ই করেননি, দেহও জয় করেছেন। সজনীকান্তর ভাষায়, 'এবং বলিতে

ভুলিয়া গিয়াছেন যে, রাজকন্যা স্নানাহার ইত্যাদি করিতে বাধ্য ছিলেন, সপ্তাহান্তে তাঁহার গাত্রবস্ত্রাদি রজকের গৃহে পাঠাইতেন ;...' রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কয়েকটি উক্তিকে নরেশবাবু ও শরৎবাবু 'অলক্ষ্য-লোষ্ট্রাঘাত' কল্পনা করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। নরেশবাবু বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুর নির্ভীক আলোচনা সত্যিই রসজ্ঞের বিচার। তবে শরৎচন্দ্র তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞানের প্রতি যে বিদ্রূপ প্রয়োগ করেছেন তা নিতান্তই অশোভন। শরৎবাবুর বিদ্রূপ এই ধরনের—'ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাপার। কত কথা কত ভাব। যেমন গভীরতা, তেমনি বিস্তৃতি তেমনি পাণ্ডিত্য। বেদবেদান্ত, ন্যায়, গীতা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাসের ছড়া, উজ্জ্বল নীলমণি মায় ব্যাকরণের অধিকরণ কারক পর্যন্ত। বাপরে বাপ। মানুষে এত পড়েই বা কখন, আর মনে রাখেই বা কি করিয়া!' সজনীকান্তর সন্দেহ হয়েছে ইনি কি চরিত্রহীন রচয়িতা শরৎচন্দ্র? চরিত্রহীনের কিরণময়ীর শাশুড়ি ও স্বামী সেবা, অনঙ্গ ডাক্তারের অভিনব চিকিৎসা—এ সকল সত্ত্বেও বেদ-বেদান্ত, কঠোপনিষৎ, রোমিও-জুলিয়েট, শকুন্তলা, মেঘদূত, হাতের লেখা মূল সংস্কৃত রামায়ণ, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদিতে এমন অধিকার লাভ করেছিল যে উপেন্দ্রর মতো সেরা ছাত্ররও তাক লেগে গিয়েছিল। নরেশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে শরৎবাবু দ্বিজেন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্যকে পরিহাস করেছেন কিন্তু তিনিও "সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা" প্রবন্ধেই ভগ্‌বদ্‌গীতা, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের বিরাট গ্রন্থাবলী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, লজিক, ল্যাটিন, কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, Theophile Gautier, Maxim Gorky, 'ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্য', ফরাসী ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্য, Ibsen, Maeterlinck পড়বার সময় পেয়েছেন। 'শরৎবাবু নিজেও ত "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" প্রবন্ধে যে বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভক্তবৃন্দের সহিত আলাপ-সুখের অবসরে তিনিও যে কিছু পড়ার সময় পান তাহারও পরিচয় পাইতেছি।'

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের নালিশ এই যে 'কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি...' এবং আত্মশক্তিতে এই নিয়ে উপহাসও করেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র না পড়ে বুঝেছেন—এ দাবী করেন না। সজনীকান্তর প্রশ্ন—কিন্তু শরৎবাবুও নরেশচন্দ্রের সমস্ত বই না পড়ে শুধু মাসিকের পৃষ্ঠায় যা প্রকাশিত হয় (যা তাঁর সমস্ত লেখার এক চতুর্থাংশ) তার উপর ভিত্তি করেই তাঁকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এরপর 'রক্তের ঋণ' উপন্যাস থেকে সজনী-

-কান্ত অজস্র উদাহরণ দিয়েছেন—কারণ নরেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের উপর শরৎচন্দ্রের মতো অনেকেরই আস্থা—তাই তাঁর ভাষার অধিকার বিষয়ে অজস্র উদাহরণ তুলে দেখিয়েছেন তিনি। শেষে লিখেছেন, 'শরৎবাবুর প্রবন্ধের মর্ম্মস্থানটি পরিশেষে উদ্ধৃত করিতেছি। এই স্থানটুকুই নিত্যকাল বাঙালী পাঠককে আনন্দরসধারা দান করিবে।

'আমি নিজেও ত একজন ছোট সম্রাট, কিন্তু আলিঙ্গন তো দূরের কথা, চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে কোথাও দিতে পারিলাম না।...খুব সম্ভব আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু ভাবি, এই দুর্ব্বলতা লইয়াই তো অনেক প্রণয়চিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি, মুস্কিলে তো পড়ি নাই।...নির্ভীক স্পষ্টবাদী শরৎচন্দ্র যে সত্য বলেন নাই, একটি দৃষ্টান্তেই তাহা প্রমাণিত হইবে। এই শরৎচন্দ্র যদি চরিত্রহীন লেখক শরৎচন্দ্র হন তাহা হইলে কি এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে? শুধু চুম্বন আলিঙ্গন কথা নয়—মাদার টিঞ্চার চুম্বন আলিঙ্গন নানা ডাইলিউশনের ফলে কি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সংযত পরিহাস (সাবিত্রীর) কাহাকে বলে ইত্যাদি দেখাইবার অবকাশ পাইলে বাঙালী পাঠকের কৌতুকরসের উদ্রেক করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহারও প্রয়োজন নাই। তৃতীয় সংস্করণ চরিত্রহীনের —৩৭১ পৃষ্ঠায় "কিরণময়ী...কিছু মিষ্টি...এবং পরক্ষণেই নত হইয়া দিবাকরের আর্দ্র ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল"।

৩৭১ পৃষ্ঠা—"এই বিষাক্ত চুম্বন..."

১৬৩ পৃষ্ঠা—"চুমো খাইলেন..."

৬৬ পৃষ্ঠা—"আলিঙ্গন করিয়াছিল..."

৩২৪ পৃষ্ঠা—"চুম্বন করিলেন..."

এতদ্ব্যতীত ৪৭৪ পৃষ্ঠা..."সতীশের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া সে (সাবিত্রী) একেবারে ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল"। ৪৭৪ পৃষ্ঠা—"সাবিত্রীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সেই নিমীলিত অশ্রু উৎস নিজের অগ্ন্যুত্তপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠাধরের উপর টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল"।

('শনিবারের চিঠি', কার্তিক ১৩৩৪, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩)

কার্তিক ১৩৩৪-এর 'শনিবারের চিঠি'তে সত্যসুন্দর দাস এই ছদ্মনামে মোহিত-লাল "সাহিত্যের আদর্শ" নামে যে রচনা প্রকাশ করলেন সেখানে আধুনিকদের সাহিত্যে যৌনাচার বিষয়ে তীব্র আক্রমণ প্রকাশ পেল। তিনি লিখলেন যে আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকদের বালকপ্রতিভা কাব্যকাননে 'কাম-কণ্টক-ব্রণ মহুয়া

ঝুঁড়ির' চাষ আরম্ভ করেছে। মুস্কিল হয়েছে এই যে, 'দুষ্টখোকা'-ও বিদ্রোহ করতে পারে বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহে যে নৃত্য আছে তা নটেশের নৃত্য নয়, দুঃশাসন শিশুর দৌরাত্ম্যের উল্লাস হিসাবেই তা উপভোগ্য। এই-সব তরুণদের পক্ষে কাম-বিদ্রোহ অশোভন। বালকের কামোল্লাস যখন কামবিদ্রোহের নতুন তত্ত্ব প্রচার করে, তখন তার অবস্থা হয় অন্যরকম। ভারতচন্দ্রের কাব্য অশ্লীল। কিন্তু তা কাব্য কারণ তাতে কামেরই বর্ণনা আছে, তার বেশি দাবী সেখানে নেই। কিন্তু 'কাম যখন "পশ্চিমের প্রলয়-পথিক" ঝড় রূপে আপনার পরিচয় দেয়, বলে—"আমি ব্রহ্মাণ্ড ভণ্ডুল করি" "আমি মহা মৃত্যু ক্ষুধা" "ত্র্যম্বকের ছিন্নজটা" ইত্যাদি তখন কথাটা নিতান্তই মিথ্যা শুনায়। কারণ কামুকের মূর্তিতে প্রলয়-ঝড়ের কল্পনা করিতে বাধে। কিন্তু একটু পরেই ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যখন সেই ঝড়কে "পূবের বাইজী" আদর করিয়া ডাকিল, তখনই তাহার "বাঁচনের নাচন-পাওয়া" পাইল, "কারফায় কাজরী গাওয়া" ও নটিনীর "পা-ঝিন্-ঝিন্" শুরু হইল। সে তখন "পূবের বাইজী"কে ঘুঙুরের তাল দিয়া নাচ্না শিখাইতে লাগিয়া গেল। কিন্তু ইহার জন্য "ত্র্যম্বকের ছিন্নজটা" "প্রলয়-কেশর" প্রভৃতির কি আবশ্যক ছিল? এ পর্য্যন্ত কোনো কবি "মন্মথ উন্মদ" ঝড় রূপে ব্রহ্মাণ্ড ভণ্ডুল করিতে ছুটিয়াছেন কিনা জানি না। পশুর কাম এত বড় নয় যে, লালসার ঝড় তুলিয়া সে বিশ্বগ্রাসের ভয় দেখাইবে; আবার মানুষের প্রেম এত ছোট নয় যে, "একটি মোহিনী তন্বী যাদুকরী বাসা" পাইলেই কারফায় নাচ্না শুরু করিয়া নিবৃত্ত হইবে।

'অনঙ্গ শেখরে' কাম-কবিতা লেখার আপত্তি নাই, কিন্তু ওই ঝড়ের psychologyটা বড়ই vulgar.'

মোহিতলাল একে নাম দিয়েছেন কামবিদ্রোহ। তাঁর মূল আক্রমণ নজরুলকে কারণ তিনিই তরুণদের মুখপাত্র। নজরুলের "অনামিকা" কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল 'কালিকলমে'।

মোহিতলাল লিখেছেন যে কবির প্রেয়সীই অনামিকা অর্থাৎ নামহীনা। তার কারণ তাঁর কামতৃষ্ণা কোনো নাম-নির্দিষ্টা নায়িকাতে আবদ্ধ নয়। বিশ্বের যা কিছু মৈথুনযোগ্য তাকেই পাত্র করে তিনি তাঁর কাম পরিবেশন করছেন। আবার নারীমাত্রই তাঁর সেই অনামিকা প্রেয়সী—কেননা, তাদের কোনো ব্যক্তিগত পরিচয়ের ধার তিনি ধারেন না, 'তাহারা সেই এক অভিন্ন রতিরসের বিভিন্ন পাত্র বইত নয়? অতএব তিনি কামের পাত্র বিচার করেন না—এ বিষয়ে তিনি এক রকম Pan-মৈথুন-ist।

মাঘ ১৩৩৪-এর 'শনিবারের চিঠি'র প্রথমেই স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে প্রথমেই তিনি বলেছেন যে 'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব তিনি করেছেন। সেই ক্ষমতা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে। আর্ট যাকে আঘাত করে তাকে আঘাতের দ্বারা সম্মানও করে। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—'ক্ষুদে ক্ষুদে রাবণ অলিতে গলিতে বাস করে, সর্ব্বদা হাটে ঘাটে তাদের বিচরণ, কিন্তু বাল্মীকির রামচন্দ্র ক্ষুদে রাবণদের প্রতি বাণ বর্ষণ করেননি, যে মহারাবণের একদেহে দশমুণ্ড বিশ হাত তার উপরেই হেনেছেন ব্রহ্মাস্ত্র।

তারুণ্য নিয়ে যে-একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখতে দেখতে মাসিক সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে সেটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো আধো কথা বলে সেটা ভালোই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় নিজের আধো-আধো কথা নিয়েই গর্ব করে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় "আমি কচি খোকা" তখন বুঝতে হবে কচি ডাব অকালে ঝুনো হয়ে উঠেছে। তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার একটা স্থান আছে, স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেইটেকে নিয়ে যখন সে স্থানে অস্থানে বাহাদুরী করে বেড়ায়, তখন বোঝা যায় সে বুড়িয়ে গেছে। 'বুড়ো-তারুণ্যের অজ্ঞানকৃত প্রহসনে হেসে উঠে জানিয়ে দিতে হবে যে, এটাকে আমরা মহাকালের মহাকাব্য বলে গণ্য করিনে। চিরকাল দেখে এসেছি তরুণ স্বর নিজেকে তরুণ বলে কম্পান্বিত করে দেখায়। তরুণ স্বাস্থ্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলেই থাকে। আজকাল তারুণ্য হঠাৎ একটা কাঁচা রোগের মতো হয়ে উঠ্‌ল, সে নিজেকে ভুলচে না, এবং পাড়াশুদ্ধ লোককে চব্বিশ ঘণ্টা মনে করিয়ে রাখ্‌চে যে, সে টন্‌টনে তরুণ, বিষফোড়ার মতো দগ্‌দগে তার রঙ।'

তারুণ্য হল বয়সের ধর্ম্ম। স্বভাবের নিয়ম। এর জন্য রুশীয় সাহিত্যশাস্ত্র থেকে নোট মুখস্থ করে কাউকে পরীক্ষায় পাশ করতে হয় না। কিন্তু আজকালকার দিনে তারুণ্যের ডিগ্রীধারীরা নিজেদের দুঃসহ তরুণতা সম্বন্ধে থীসিস লিখতে শুরু করেছেন। তারা তরুণ বলেই বাহবা পাবার যোগ্য বলে নিজেদের মনে করে। সাহিত্যবিচারে যেন দু'ধরনের মাপকাঠি রাখতে হবে—একটা তরুণদের জন্য আর বাকি সকলের জন্য অন্যটা। কিন্তু সাহিত্যের তরফে বলবার কথা এই যে, সেটা লেখা হয়েছে সাহিত্যের আদর্শ থেকে হয় ভালো নয় মন্দ বলব, কিন্তু তরুণ বয়সে

লেখায় একটা স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়া করতে হবে এর কোনো মানে নেই।'

শেষে 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গরস রচয়িতাদের রচনা আর্টের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার কথাও তিনি বলেছেন। ' "শনিবারের চিঠি"র অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান,—নব নব হাস্যরূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখবন্ধ করা তার কাজ নয়। সে কাজ করবারও লোক আছে, তাদের কাগ্‌জী লেখক বলা যেতে পারে, তারা প্যারাগ্রাফ-বিহারী। ইতি ২৩ পৌষ ১৩৩৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একটা কথা যোগ করে দিই। যে সব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখেচে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা প্রশংসার যোগ্য তাকে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়।'

২

ফাল্গুন ১৩৩৪-এর 'শনিবারের চিঠি' শুরু হয়েছে "সাহিত্যে সত্য-বাদ ও রবীন্দ্র-বিদ্রোহ" (পৃ ১-৯) এই লেখা দিয়ে। সেখানে মন্তব্য করা হয়েছে যে বাংলা-সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তিন-জন সামন্ত নরপতিকে রাজ্যভাগ করে দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের মতে বাংলা সাহিত্যে যার সমতুল কেউ নেই সেই নরেশচন্দ্র পর্যন্ত মতামত দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ বাতিল হয়ে গিয়েছেন। নরেশচন্দ্র জানিয়েছেন যে "সাহিত্যধর্ম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তার মূল মর্ম এই যে সাহিত্য রবীন্দ্রনাথেরই একচেটিয়া। অন্য যে ব্যক্তি 'লোকাতীত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে' সে পায় শুধু 'অবহেলা, অবজ্ঞা,··· লাঞ্ছনা'। 'বাণীর বরপুত্রের যেখানে এই সমাদর সেখানে আড়ম্বর করে বাগ্‌দেবীর পূজা একটা নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা।' তাই উকিল সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ঘোরতর মামলা রুজু করেছেন। 'আমরা নরেশচন্দ্রের জন্য দুঃখিত, কারণ, তাঁহার বয়স হইয়াছে, শীঘ্র এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হইলে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সিংহাসন অধিকার করিবার ফুরসৎ মিলিবে না। চীফ-জাস্টিস্ শরৎচন্দ্রের এ বিষয়ে একটু অবহিত ও তৎপর হওয়া উচিত নয় কি?'

তরুণদের মুখপত্র 'কল্লোল' মাঝে মাঝে 'ডাকঘর'-এর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথকে নোটিশ দিচ্ছে। অভিযোগের উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও নরেশচন্দ্র ও তরুণদলের মধ্যে

অনেকখানি ঐক্য আছে। নরেশচন্দ্র সরস্বতীকে নিরাবরণ সত্যের প্রতীকরূপে পূজা করবার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রভক্তরা নাকি বিরোধী। বৈজ্ঞানিক তথ্যের মধ্য দিয়ে আজকাল যে সব সত্যের প্রকাশ ঘটছে তার প্রমাণ তাঁর বহুবিক্রীত উপন্যাস।

তরুণ সমালোচকেরাও সত্য ও বাস্তবের দোহাই দিচ্ছে। 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টিতে এযুগের বাস্তব-সত্যের রসোল্লাস নাই।' তরুণদের মতে আধুনিক মানবহৃদয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হলে অশ্লীলতার অপবাদও বহন করতে কিছুমাত্র লজ্জা নেই।

লেখকের মতে বাস্তব তরুণের কাছে এখনো অবাস্তবই আছে, তরুণের বাস্তববিলাস একটি ভঙ্গি মাত্র। 'তরুণ নিজেরই প্রাণের অপ্রবুদ্ধ কামনাকে চতুর্দ্দিকস্থ গাছ-পাথর, বাড়ীঘর, জীব-জন্তু, কুলি-ভিখারী, কুলবধূ ও বারবণিতাকে দিয়া "পাস" করাইয়া লইতে চান, অক্ষম লেখকের আত্মবিলাসের সেই সহজ পন্থাকেই বাস্তববাদ নাম দিয়া অপরিণত বুদ্ধি পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করিতে চান'। (পৃ ৮, ফাল্গুন ১৩৩৪—সত্যসুন্দর দাস)

১৩৩৫-এর 'শনিবারের চিঠি'র পৌষ সংখ্যায় ১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ সম্পাদকীয় (পৃ ৯২১-৯৩৩) লেখা হয় তরুণ সাহিত্যিকদের অভিযুক্ত করে। কারণ 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে যে যারা নগণ্য ছিল তীব্র আলোচনার দ্বারা তাদেরই বৃহৎ করে দেখা হচ্ছে। 'শনিবারের চিঠি'র বক্তব্য—'আমরা জানি এই সকল লেখকগণের রচনা সাহিত্যপদবাচ্য নয়,···কিন্তু বিপদ হইয়াছে এই যে, ইহাদের এই মেকী সাহিত্য অশিক্ষিত পাঠক-সাধারণের মধ্যে নব আদর্শের সাহিত্য বলিয়া আদর পাইতে আরম্ভ করিয়াছে—যাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান পণ্ডিত বলিয়া জানিতাম তাঁহারাও এই সকল লেখককে মাথায় তুলিয়া লইতেছেন।' উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের উক্তি এবং অচিন্ত্যকুমার সম্বন্ধে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'উত্তরা'য় লিখিত প্রবন্ধ। 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্য সাহিত্যের নামে যে কদাচার চলছে—যা জনসাধারণের রসবোধ নয়, মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার অন্তরায়, সেই কদাচারের স্রষ্টা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরূপেই এদের দেখা—সেই ব্যাধি যাতে সংক্রামিত না হয় সেইজন্য এদের segregate করাই 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্য।

নবীন সাহিত্যিকদের সাহিত্য বস্তুত অর্বাচীন মনের উৎকট কামনার উগ্র প্রকাশ। কিন্তু তাকেই ইওরোপীয় সাহিত্যের মতো একটা তত্ত্বের মধ্যে ফেলে এর

মূল্যবৃদ্ধি করার চেষ্টা চলছে। প্রবীণ নরেশচন্দ্র এই তরুণদলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন নিজেকে, শরৎচন্দ্র এদের ব্যথাকে বুক পেতে নিচ্ছেন। পণ্ডিত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এদের তত্ত্বদর্শী যুগপ্রবর্তক কল্পনা করে তথাকথিত ড্রয়িংরুম সাহিত্যিক-দের (রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এর অন্তর্ভুক্ত) নিন্দাবাদ করছেন।

বর্তমান বাংলা সাহিত্য দেখে মনে হয় এ-যেন কলকাতার মেসের ছেলেদের সাহিত্য। অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া' এই সকল মেস-সাহিত্য। 'এই কদর্য্য কল্পনা-বিলাসের বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযান। আমাদের মাতৃভাষা যে পথে ধীরে ধীরে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল এই সকল সাহিত্যিক অকস্মাৎ তাহাকে "লজগজে" করিয়া তুলিতেছে বলিয়াই এই মাতৃহন্তাদের বিরুদ্ধে আমাদের আক্রোশ। যে সকল আধুনিক নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদ সম্প্রদায় আপনাদের মস্তিষ্কগুণে বঙ্গবাণীকে দীনাহীনা ক্ষীণা মলিনা পিঁচুটিনয়না কাঠকুড়ানীর মত রথের কাছে দাঁড়িয়ে সে জন—চুল চুস্‌না হইয়া গিয়াছে, কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, দন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, অঙ্গে খড়ি উড়িতেছে, হস্ত অবশ হইয়াছে, পদ মুচুড়ে যাইতেছে, কল্পনা করিয়া ব্যাকুল আগ্রহে তাঁহাকে অধিকতর 'পুঁয়ে' পাওয়াইয়া মারিতে বসিয়াছে তাহাদিগকে আমরা ক্ষমা করিব না।'

'শনিবারের চিঠি'র চৈত্র ১৩৩৫-এ "সংবাদ-সাহিত্য" শীর্ষে প্রগতির অশ্লীলতায়-বিতর্ক সূত্রের অভিযোগে মন্তব্য করা হলো—'শনিবারের চিঠি' অশ্লীলতার জন্য রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়েছে'—সেই আমোদে বেকার 'প্রগতি' গোর থেকে উঠে হাততালি দিয়ে বলছে, 'এত বড় আস্পর্দ্ধা। আমাদের গালি দিস্! আমরা নাকি অশ্লীল ? জানিস্, পুলিশদাদাকে আমরা খইনি খাওয়াই ; নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, গবেন্দ্র, মায় সবচেয়ে বড় ইন্দ্র পর্যন্ত আমাদের সাঙাৎ। হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের কত দহরম মহরম! আমাদের বলে কিনা অশ্লীল! বেহায়া, বেইমান, উল্লুক, ইতর।' ইত্যাদি খুব হাঁকডাক করে 'প্রগতি' নিশ্চিন্ত হয়ে বসে একবার চারিদিক চেয়ে দেখল—তারপর মনের আনন্দে একটা বিড়ি ধরিয়ে শুরু করল—

> '…যেথায় স্ফুরিছে নাসা কটিলগ্ন স্বেদের আঘ্রাণে,
> বাতাসে ভাসিছে যেথা জন্মবীজ, রতি-সম্মোহন।
> আমি সেথা গিয়েছিনু সন্ধ্যাবেলা—প্রলুব্ধ, অস্থির,
> আসঙ্গ-বাসনা-পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক।

সারঙ্গ-সঙ্গীত-স্বনে শিহরিছে উৎসব-উৎসুক
হেমচ্ছটা বিচ্ছুরিত বাতায়ন প্রতি পণ্য-স্ত্রীর।
উজ্জ্বল বসন বর্ণ, বিষবাষ্প, উত্তপ্ত নিঃশ্বাস,
কৃত্রিম-রক্তিম-ওষ্ঠে লালসার বলিষ্ঠ বিলাস
মদ্যফেনা তীব্র গন্ধ কী আনন্দে পশিলো রুধিরে।
আমারে ডাকিয়া নিলো তরঙ্গিত দেহ গঙ্গানীরে।
সেথায় আকাশ নাই, তারা সেথা কখনো ফোটে না।
কটু গন্ধ অন্ধকারে শুধিলাম বিধাতার দেনা।'

('প্রগতি', পৌষ-মাঘ, ১৩৩৫, পৃ ৩৭৮)

এরপর 'শনিবারের চিঠি' তার নিজস্ব বিদ্রূপের ভঙ্গিতে এ-কথা জানিয়েছে—'কিন্তু এ আমরা কি করিলাম এখনই পুলিশ-দাদা, নরেন্দ্র-সুরেন্দ্র-গবেন্দ্র, মায় কংগ্রেসি ভলান্টিয়ার পর্যন্ত তাড়া করিয়া আসিবে। কারণ যাহা আদৌ অশ্লীল নয়, তাহা আমাদের হাত লাগিয়া ঘোরতর অশ্লীল হইয়া উঠিল। তরুণদের অশ্লীলতাও অশ্লীল নয়, সে যে আর্ট—তার নাম Realism। তাই, ভূতপূর্ব Forward কোম্পানি বলেন,—পুলিশ আরো অনেকের নামে অশ্লীলতার মামলা করিবে,—এ গুজব সত্য হইলে বড়ই ভাবনার কথা। কারণ ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, obscenity ও Realism এক জিনিস নয়। এখন এই যাহা এখানে আমরা তুলিয়া দিলাম, ইহা obscenity না Realism? Realism তো বটেই। কেন না, "কটু গন্ধ অন্ধকারে শুধিলাম বিধাতার দেনা"—"কটুগন্ধ"টি পর্যন্ত!'

'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা নাকি প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধৃত করে বলে "মণিমুক্ত"গুলো এত অশ্লীল হয়। তাই আলোচ্য কবিতায় বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কবিতার নাম "মানুষ"। মানুষ বিধাতার দেনদার —সে দেনা তাকে শোধ করতে হবে। তা শোধবার পরে কবির মনে হয়—

'আমি যে করেছি পান ব্যগ্র কণ্ঠে এই উগ্র সুরা—
মোরে দিয়ে বিধাতার এই শুধু ছিলো প্রয়োজন,
স্রষ্টা শুধু এই চাহে, এ বীভৎস ইন্দ্রিয় মিলন—
নির্ব্বিচারে প্রাণী-সৃষ্টি করে থাকে যেমন পশুরা।'

এত বড়ো সত্য কথা বলবার জন্য তিনি এই কবিতা রচনা করেছেন। 'শনিবারের চিঠি'র ভাষায়: 'মানুষের একমাত্র কর্ম্ম যে উহাই। ইহার জন্য অবশ্যই বিধাতা দায়ী। অন্য কোনো উপায়ে কি সৃষ্টি-ক্রিয়া চলিতে পারিত না? মানব সভ্যতার

ইতিহাসে এত সহস্র বৎসর পার হইল—এত ঋষি এত দার্শনিক এত কথা বলিল, অথচ একথাটা কেহই বলিতে পারিল না! একি বীভৎস ইন্দ্রিয়-মিলন!—মানুষ এমনই পশুর মত নির্বিচারে প্রাণী সৃষ্টি করিতেছে।'

হিন্দুরা যাকে 'পিতৃঋণ' বলে কবি তার নাম দিয়েছেন 'বিধাতার দেনা'। 'পিতৃঋণ' বলতে তবু পিতাকে কিছুটা শ্রদ্ধা করতে হয়। কিন্তু অতি আধুনিক 'মানুষ' যারা তাদের নিজেদের জন্ম সম্বন্ধে আরো অধিক জ্ঞানলাভ করেছে, তারা জানে, তাদের পিতাও এইরূপ 'বিধাতার দেনা' শোধ করেছিলেন—নির্বিচারে প্রাণী-সৃষ্টি করে থাকে যেমন পশুরা। নব বুদ্ধদেবের এ কি বৈরাগ্য! 'পণ্যস্ত্রীর হেমচ্ছটাবিচ্ছুরিত বাতায়নরূপ বোধিবৃক্ষতলে একি অভিনব সম্বোধি!'

ট্রাজেডিটা কোথায়?

বাহিরিয়া এনু পথে। কণ্ঠ ঠেলি জঘন্য হুঙ্কার
উঠিছে ব্যাকুল বেগে, মর্মান্তিক আত্ম-অপমানে!

কোথায় ভদ্রলোকের ছেলে একটু লেখাপড়া করবে, বড় জোর একটু পোইট্রি লিখবে, তা নয়, তাকে দিয়ে, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে যেন-তেন-উপায়ে বিধাতার দেনা শোধ করানো। শুধু কি তাই—ঘরে এসে বইগুলোর পানে চেয়েও সেই দেনার আবেশে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।—'কেহ ছিন্ন নগ্নগাত্র, কেহ দীপ্ত সুদৃশ্য শোভায়'—কাজেই সেগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় মনে হয়—

এ জীর্ণ পাতার স্পর্শ নারী-মাংস চেয়ে সুখকর,
মলাটে ধূলির গন্ধ—মুখমদ্য তার তুল্য নয়!

—'হরি! হরি! শেষকালে বইগুলোর উপরেও! জানি না, sex—psychologyতে হয় ত এরূপ যৌন-পিপাসার একটা ল্যাটিন নাম আছে। সে যাই হোক, আমরা প্রায় সব কবিতা-টুকুরই সার উদ্ধার করিয়া দিলাম। এইবার বলুন, [illegible]

অতি আধুনিকদের নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র বিদ্রূপ আর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ধরা পড়বে ১৩৩৪ ফাল্গুনের "মণি-মুক্তা" বিভাগের নির্বাচিত অংশে। এরই সঙ্গে ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত "সরস্-সতী" এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যার "প্রশ্নোত্তরে" প্রাসঙ্গিক বলে উদ্ধৃত হলো—

মণি-মুক্তা

শ্রী ডুবুরী কর্ত্তৃক আহৃত

ত রু ণে র ক ল্প লো ক

কামদগ্ধা জননী বসুধা—

নবসৃষ্টি প্রসবিনী তমস্বিনী জননী বসুধা,—
হেরি তা'র নগ্নদেহ, কামদগ্ধা কুমারী সে যেন,
শুনি তা'র বক্ষোমাঝে দুরুদুরু কামনা-বিলাস।

অশ্রু-উৎসারিণী প্রিয়া—

শুভ রজনীতে, জর্জ্জর প্রসব-সুখে তমস্বিনী
কাঁপে বসুন্ধরা, শিহরায় জননী বসুধা!
হেরি তা'র গর্ভ টুটি,···
··········ধীরে ধীরে আসে বাহিরিয়া
নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমা······
রমণী সে—বক্ষে তা'র মৃত্যুহরা স্বরগের সুধা,
বুঝিলাম, সেই নারী মোর অশ্রু-উৎসারিণী প্রিয়া।

মাটির বাঁটের চুমা—

শুনেছিনু কাণ পেতে জননীর স্থবির-ক্রন্দন,
মোর তরে পিছু ডাক মাটি-মা—তোমার!
কত তিথি,—কত যে অতিথি,
কত শত যোনিচক্রস্মৃতি
করেছিল উতলা আমারে!
আধো আলো—আধেক আঁধারে
মোর সাথে মোর পিছে এল তারা ছুটে'!
মাটির বাঁটের চুমা শিহরি' উঠিল মোর ঠোঁটে,—রোমপুটে!

জরায়ুর ডিম্বে তার বাঞ্ছিত সন্তান—

ভ্রূণ-ভ্রষ্ট সন্তানের তরে
মাটি-মা ছুটিয়া এল বুক-ফাটা মিনতির ভরে,—
মোর পাশে দাঁড়াল সে গর্ভিণীর ক্ষোভে,
মোর দুটি শিশু আঁখি-তারকার লোভে
কাঁদিয়া উঠিল তার পীনস্তন,—জননীর প্রাণ!
জরায়ুর ডিম্বে তার জন্মিয়াছে যে ঈপ্সিত—বাঞ্ছিত সন্তান,
তার তরে কালে কালে পেতেছে সে শৈবালবিছানা,—

এ বসুধা বধূ—

কবে বসুন্ধরা
মৃত্যুগাঢ় মদিরার শেষ পাত্রখানি
তুলে দেবে হস্তে তব,—
লোলুপ নয়ন মেলি' হেরিবে তাহার বিবসনা শোভা
দিব্য মনোলোভা!
শুষে নেবে সৌন্দর্য্যের তামরস-মধু!
এ বসুধা-বধূ
আপনারে ডারি' দেবে উরসে তোমার!

বিপুল ইসারা—

জমিদার বাড়ীর আলিশান গম্বুজটার কিনারে শুক্ল প্রতিপদের তন্বী পাণ্ডু ইন্দুলেখার অবগুণ্ঠনের তলায় কী সুদূর বিপুল ইসারা!

ট্র্যাম চলে—

ট্র্যাম চলে, লোহার লাইন দুটো লোহার চাকায় পিষে পিষে,—

তরুণের কামলোক

ঠাসা তুবড়ী বা ডাসা ডালিম—

মাটির বাতির স্তিমিত শিখার মতো কার আর একটা দেহেও সহসা তরঙ্গ জেগে উঠ্‌ল—যেন হিল্লোল। একটা ঠাসা তুবড়ী যেন ফেটে গেল, বা একটা ডাসা ডালিম।

মেয়েটি লেলিহান দীপ শিখার মতো ওর দেহ দীর্ঘায়ত করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওর পা-তোলাটি ভারি সুন্দর—

বেঁকিকে দেখে ভোমরার আড়াই হাত শরীরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল। বেঁকি বল্লে—মাছ কিছু পেলি? এ প্রশ্নের যে এমন ধারা উত্তর হবে, বেঁকি তা স্বপ্নেও ভাবেনি।—ভোম্‌রা বেঁকির মাজাটা দুই হাতে একেবারে জাপ্‌টে ধর্‌লে।
আড়াই-হাত বামন প্রিয়ার গ্রীবাবেষ্টন কর্‌তে পারে না, তাই কটিতটে আলিঙ্গন উপহার দেয়। প্রিয়ার মুখ আকাশের চাঁদ,—হাত তুলে ডাক্‌তে হয়। ডাকাই সার।
ভোম্‌রা তার দুটি চোখ বেঁকির মুখের পানে তুলে ধর্‌ল—মিনতিতে ভিজা দুটি চোখ।
নেকড়ের মতো বেঁকি খপ্‌ করে' ভোম্‌রার ঘাড়ের ওপর এক কামড় বসিয়ে দিলে। ভোম্‌রা একটা চীৎকার করে' আলিঙ্গন ছেড়ে দিলে। বেঁকি তাড়াতাড়ি দূরে সরে' গিয়ে ডান পা-টা তুলে ওকে লাথি মারবার ভঙ্গী দেখাল।
ভোম্‌রা আবার জাল কাঁধে ফেলে পথ চলে। খালি মনে হয়, চীৎকার করে' ওঠাটা ভুল হয়ে গেছে। বেঁকির ক'টি দাঁতের স্পর্শের স্বাদের দাম এ নয়। যেখানটায় কাম্‌ড়েছিল, সে জায়গাটায় ধীরে ধীরে আঙুল বুলায়। দাগগুলি একটু ঠাহর হয়।
আবার মনে হয়, ওর পা-তোলাটি ভারি সুন্দর।

বন্দী ভগবানের আর্ত্তনাদ—

দোরের কাছ দিয়ে নব্‌নে জেলের বিধবা ডব্‌কা মেয়েটা প্যাট্‌ প্যাট্‌ ক'রে তাকিয়ে যায়, একটুখানি মুচ্‌কি হাসেও। ছিদাম বোঝে না। মেয়েটা উঠে অন্ধকারে হঠাৎ ছিদামকে জড়িয়ে ধরে। অনাবৃত ভরন্ত দেহটার পরশ ছিদামের শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়। ছিদামের কাছে সবই যেন তখন সহজ হয়ে আসে—সে বুঝ্‌তে পারে সবই। একটু দূরে স'রে বসে, বলে, বাড়ী যা ক্ষেন্তি—হয়তো মেয়েটার জন্য ছিদামের একটু দুঃখ হয়—আহা ছোট বেলায় সোয়ামী মারা গেছে, আজ এই ভরা বয়স…মেয়েটা যায় না…বসেই থাকে ছিদাম আবার বলে…দুম দুম করে মেয়েটা চলে যায়।
ক্ষেন্তি আবার তার সমুখ দিয়ে আসে যায়…

একদিন ফাগুনের বেলা শেষে অকাল-বাদ্‌লা নেবে আসে। দিনটা মন-মরা, কে যেন গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছে—ছিদাম আজ আর বেরোয় নি।

ক্ষেন্তির দিকে সে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে…জলে সারা গা ভেজা—ছপ্‌ছপে, ভেজা কাপড়ের ভেতর দিয়ে সমস্ত শরীর ফুটে উঠ্‌ছে…বুকে তার কী সে উদ্দাম যৌবন-শ্রী! যেন দুটি ফুটন্তফুল পূজার জন্যে উন্মুখ আকুল…

সে ঘরের কোণ থেকে টাকার পুটুলিটা এনে ক্ষেন্তির হাতে গুঁজে দেয় কোনমতে, তারপর—উন্মাদের মতো ক্ষেন্তিকে দুহাতে বুকের মাঝে চেপে ধ'রে চুমোয় চুমোয় তার সমস্ত মুখটা ভ'রে দেয়—ছাড়া পেয়ে ক্ষেন্তি খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে… ঠোঁটে হাত ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে বলে, হেরে গেলি ছেদাম!…

সবাই যেমন শোনে, ছিদামও শুন্‌তে পায়—মেনো কাল রাত্তিরেই ক্ষেন্তিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।…

ছিদামও আর সে ছিদাম নেই, একমুহূর্ত্তে ক্ষেন্তি তাকে বদ্‌লে দিয়ে গেছে। তার ভেতরকার ক্ষুদ্র ভগবানটি আজ অভাবের তাড়নায় আর্ত্তনাদ করে—সে আজ ভুখা—কিন্তু কী সে ক্ষুধা? কিসের সে অভাব? ছিদাম ভালো ক'রে বুঝ্‌তে পারে না, শুধু সে এইটুকু বুঝ্‌তে পারে—পথ দিয়ে যখন কাঁচা বয়সের মেয়েরা জল নিয়ে যায়, তার ইচ্ছা করে তাদের কলসীগুলো এক ঢিলে ভেঙে দিয়ে তাদের নিয়ে আসে তার কুঁড়ের ভেতর, তার জীর্ণ শয্যার পায়ে…

কালো, কুশ্রী, সারা দুনিয়ার অবজ্ঞাতা নারী, যার বুকে যৌবন আছে,—তাকে দিয়েই সে তার ক্ষুধিত আত্মার বাসনার দুয়ারে ধূপ ধুনা দেবে—

যে ঘাটে মেয়েরা নাইতে আসে দলে দলে, তারি একটু দূরে জাল ফেলে বসে, তাদের নাওয়া দেখে—

বিকৃত ক্ষুধায় অন্তরের বন্দী ভগবান আরো আর্ত্তনাদ করে ওঠে।

ত রু ণে র বি দ্রো হ

ভ্রাতা-ভগিনী-সংবাদে স্বকীয়া ও পরকীয়া সংস্কার—

—আমার মতো কত অভাগী স্বামীকে জানবার অবকাশ পাবার পূর্ব্বেই বৈধব্যকে বরণ করে বসে!

—সেই জন্যই তো বাবা তোর আবার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তুইই তো তাতে সকলের চেয়ে বেশী আপত্তি করেছিলি!

—আমার কথা তুমি একেবারে ভুলে যাও—শুধু এইটুকু মনে করো যে যাদের অন্তরে স্বর্গগত স্বামীর একটা অস্পষ্ট ছায়া পর্য্যন্ত পড়বার সুযোগ ঘটেনি সেই সব বালবিধবাদের এই সংসারে শত প্রলোভনের মধ্যে কেমন করে তার স্বামী নামক সেই অজ্ঞাত মানুষটিকে শুধু ধ্যান করে বেঁচে থাকতে পারে ?

প্রকাশ নত মস্তকে শুধু ধীরে ধীরে বললে—আমারও তোর সঙ্গে একমত, উমা।

—আমি তা জানি দাদা, সেই সাহসেই তোমার কাছে একটু মন খুলে দুটো কথা বলে মনটা একটু হালকা করে নিলুম।

—রোস না আমিও এর শোধ নেবো, আমি চিরকুমার থাক্‌বো, কখনোই আর বিবাহ করবো না।

উমার চোখে-মুখে একটা সকৌতুক হাসির আভাস দেখা গেল। সে আবার বল্‌লে—আচ্ছা দাদা, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি ক'রে বলোতো—তুমি কি বিভাকে[১] কখন ভুলতে পারবে ?

প্রকাশ চুপ ক'রে রইল।

প্রকাশ হঠাৎ প্রশ্ন করলে তুই কি কখন কাউকে ভালবেসেছিলি উমা ?

উমা হেসে ফেলে বললে—কেন ? সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

—নইলে এত কথা তুই শিখ্‌লি কেমন করে ? আমার কিন্তু ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে।

—আচ্ছা, ধরো যদি বলি, হ্যাঁ বেসেছি। তা হ'লে কি তোমরা তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে ?—

—নিশ্চয়, যেমন ক'রে পারি তোর ভালবাসা যাতে সার্থক হয় আমি তার উপায় করবো!

—ইস্! তোমাকে আমি অগ্রিম ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি।

—আচ্ছা দাদা, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি সর্ব্বদেশেই শাস্ত্র ও ধর্ম্মবিগর্হিত, তা জানো তো ?

—জানি।

—তবে ?

—কি তবে ?

—বিভা—?

১ প্রকাশের প্রাক্তন ছাত্রী, বর্ত্তমানে নির্ম্মল নামধেয় ভদ্রলোকের যথাধর্ম্ম বিবাহিতা পত্নী।

—বিভা কি পরস্ত্রী ?

—নয় ত কার ? সেকি নির্ম্মল বাবুর স্ত্রী নয় ?

—না আমার ! নির্ম্মল আমার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে।

উমা তার আঁচলটা গলায় দিয়ে প্রকাশের পায়ের কাছে ঢিপ্ করে মাথা ঠুকে একটা প্রণাম ক'রে উঠে বল্লে—বিভা পোড়ারমুখী জন্ম-এয়োস্ত্রী হ'য়ে বেঁচে থাক্।

পূজ্য-পূজা সংস্কার—

রবীন্দ্রনাথের মতে তরুণরা নাকি স্থানে অস্থানে 'আমরা তরুণ, আমরা তরুণ' বলে চেঁচিয়ে তরুণ জ্বরের মত নিজেদের কম্পান্বিত করে হাস্যাস্পদ করে তুলছে। তরুণরা কোনদিন নিজেদের তরুণ বলে হেঁকে বেড়িয়েছে এমন কথা ত আমরা শুনিনি[২]। বরঞ্চ আমরা জানি ৬৪ বৎসর বয়সে[৩] শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকবার আগ্রহে কেউ কেউ সভায় সমিতিতে কাগজেপত্রে নিজের ধার-করা তারুণ্যকে বার্দ্ধক্যের বাতের ব্যথার মতো টনটনিয়ে তোলেন।

সম্ভব-অসম্ভব সংস্কার—

ঠোঁটে তুলে রসাল পেয়ালা—
প্রাণ শিশু করে কি দেয়ালা !···
উল্কা-মুখে দিয়ে চুমা ভস্ম করি অনন্ত নীলিমা···
মধুজার স্তন থেকে পিয়ে নিই স্নেহ মধুধারা,···
তিমির-মশাল জেলে পড়ি শুধু শূন্যতা-পুস্তক···
তপ্ত তাজা পদ্মফোটা বুকখানি জড়াই দুহাতে,
উপোসী নয়ন নামে রূপসীর হৃদয়-গুহাতে,···
কখনো হৃদয়ে জাগে ধরার আদিম উন্মাদনা—
পশুত্বের অতীত সাধনা।

২ আমরা শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি। গত দুই বৎসরে কল্লোল-নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় 'ডাকঘর' বিভাগ ও অন্যান্য প্রবন্ধ ও কবিতা দ্রষ্টব্য। যাঁহারা পড়িতে জানেন না তাঁহারা পড়াইয়া লইবেন।

৩ লেখকের ভুল হইয়াছে। ৬৭ বৎসর হইবে।

দানব-জীবের সাথে ধেয়ে চলি উলঙ্গ, বিকট,…
কঙ্কাল-করোটি ছুঁড়ে হত্যা-হর্ষে চঞ্চলি ধমনী—
কামতালে[৪] কম্পিত রমণী!

প্র বী ণে ত রু ণে

বিধাতার পরাজয়—

নেপোলিয়ন যখন এক জনই জন্মায়, তখন তাকে মেনে কোনো মতে কাল কাটে; কিন্তু মানব জাতির ভাগ্যক্রমে যদি কোনো দিন জনে জনে নেপোলিয়ন হয়ে ওঠে তখন ব্যবস্থাটা আপনি বদলায়। বাংলাসাহিত্য যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো একছত্র সম্রাট পেয়েছিল এ তার একান্ত গর্ব্বের, কিন্তু আজ তার বুকে যে বহুছত্র গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছে তার সে গৌরবও তো কম নয়।… আগে যাঁরা কাব্য ও শিল্প রচনা করে গেছেন তাঁদের অভাবে আমাদের সৃজন শক্তি ব্যর্থ হোতো, একথা আমরা মানিনে। তাঁরা আগে জন্মেচেন বা তাঁদের সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েচে, এটা একান্তই দৈব ঘটনা।…সে যুগে সিউলি যেমন ফুটেছে আজো তেমনটি ফুটলেই বিধাতার চলে যায়, কিন্তু সে যুগে মানুষ যা সৃষ্টি করেচে আজ তাতেই দাগা বুলিয়ে তার তৃপ্তি নেই,…এখানেই মানুষের কাছে বিধাতার পরাজয়।

শুভ্রবেশী পুরোহিত ও সুরসুরাপায়ী কবি—

আধুনিক লেখকরা শিশুকাল থেকে যে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সহিত চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করছেন[৫] বঙ্কিমবাবুর সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা দেশমাতা বা রবীন্দ্রনাথের সোনার বাঙলায় তার চিহ্নমাত্র ছিল না।[৬] বর্ত্তমানে বাঙলা দেশে জীবন-সংগ্রামে যে কঠোর প্রতিযোগিতা চলেছে, তাকে মুখের গ্রাস নিয়ে কাড়াকাড়ি বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। দারিদ্র্যের তাণ্ডব নৃত্যের নিষ্ঠুর পদাঘাতে কোথায় উড়ে যাচ্ছে ধর্ম্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য, আনন্দ, প্রাণ, আয়ু, ইহকাল, পরকাল—সব।[৭] ক্ষুধা যেখানে

৪ আশা করি কবি হেমেন্দ্রকুমার রায় আগামী সংখ্যার 'কল্লোলে' এই নব আবিষ্কৃত তালের বোল দিবেন।

৫ লেখকদের অভিভাবকদের সাক্ষ্য এ বিষয়ে কাজে লাগিবে, লেখকদের নহে।

৬ বাঙলাদেশের সমস্ত জমি Strike করিয়াছে নাকি?

৭ অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে ইহা দারিদ্র্যের জন্য ঘটে নাই, অন্য কারণে ঘটিয়াছে।

রাজা, সেখানে কীই বা করতে পারে শুভ্রবেশী পুরোহিত, আর কীই বা সুরসুরাপায়ী কবি।

ব্রাহ্ম সমাজের বিধি নিষেধ—

পেশাদার ভিক্ষুক, চোর, গাঁটকাটা, বুড়ো বেশ্যা—এদের জীবন-কাহিনী অবলম্বন করে' এবং তাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের ধরণটা যদি ঠিক ব্রাহ্ম-সমাজের বিধি-নিষেধ মেনে না চলে, তা হলে আশ্চর্য্য হবার খুব বেশি কারণ আছে কি?

সাহিত্যিকের বিরাট জমিদারি—

আজিকার সাহিত্যিকেরা কেহই বিরাট জমিদারি লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, তাই, পদ্মার তীরে বসিয়া উদার উদাত্ত সুরে আনন্দ গান করিতে পারে না। তাহারা নিজেদের দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে সকল দুঃস্থের[৮] বেদনা অনুভব করে।

অবহেলিত লোকাতীত প্রতিভা—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন—

এত বড় প্রতিষ্ঠা আমার নেই যাতে আমি অবজ্ঞার সঙ্গে বল্‌তে পারি যে, যার তার লেখা পড়বার অবসর আমার নেই।[৯] অনেক লেখাই আমি পড়ি···দেখ্‌তে পাই যে লোকাতীত প্রতিভা নিয়ে যে জন্মেছে, বাগ্দেবীর বরপুত্র যে, তার যদি লক্ষ্মীর তকমা না থাকে তবে কেউ তাকে চেনেও না। আমাদের দেশে এমন দুর্ভাগ্য একটি নয় বহু আছে।[১০]

৮ বিশেষ করিয়া "পেশাদার ভিক্ষুক, চোর, গাঁটকাটা বুড়ো বেশ্যা এদের।" ইহাদের জীবন-যাত্রার সহিত নিবিড় পরিচয় স্থাপন করিতে গিয়া, তরুণ সাহিত্যিকদের বহু পূর্ব্বেও অনেককেই দুঃস্থ হইতে হইয়াছে। আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেককেই জাল-জুয়াচুরী করিতে হয়। এও দারিদ্র্য-বেদনা।

৯ মাঘসংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য। কিঞ্চিৎ এখানে উদ্ধৃত হইল—

"গল্পরচনায় যদি কিছুর প্রশংসা করিতে হয় তাহা ভাষা-নৈপুণ্য ও কল্পনাশক্তির—সামাজিক দুঃসাহসিকতা গল্পসাহিত্যের মুখ্য ও প্রশংসাযোগ্য পরিচয় হইতে পারে না।···

আপনার সহিত মতের বা রুচির পার্থক্য লইয়া ক্ষোভ অনুভব করি নাই। 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' প্রবন্ধে আমি আপনাকে লক্ষ্য করি নাই; আপনার গল্প আপনি কি ভাষায় ও কি ভাবে লেখেন তাহা আমি জানিও না। সাময়িক পত্রে বা গ্রন্থ আকারে যে গল্প বা কবিতা পড়িয়া আমি লজ্জা ও দুঃখ বোধ করিয়াছি, আপনার লেখা তাহার অন্তর্গত নহে। সুদীর্ঘকাল আপনার লেখা পড়িবার অবকাশ হয় নাই।

১০ আমরা ত জানি একটিই আছে, কারণ আর যাহারা আছে তাহারা ঠিক বাগ্দেবীর বরপুত্র নয়। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঐ কেবল একজনেরই লেখা পড়েন নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন।

('শনিবারের চিঠি': ফাল্গুন ১৩৩৪, ৭ম সংখ্যা, পৃ ২১-৩২)

সরস-সতী

হাঁসের উপরে না তুলি' পা'খানি, হাঁস-পা তালে
কি ওটা বাজাও, নাচিয়া নাচিয়া শ্যাওড়া-ডালে ?
শ্বেতভুজে তব ধবলের শোভা—মরি গো মরি !
বাক্‌রোধ তবু হ'ল না আমার, বাগীশ্বরী !

বক্ষ তোমার হাঁস-ফাঁস করে কি সুধা পিয়ে—
কিসের ক্ষুধায় উধাও হইলে 'রাশ্যা' গিয়ে ?
অভ্র-আবীরে রুচি নাহি আর, রক্তমাখা
মাছের আঁশের রাশিতে ঢেকেছে হাঁসের পাখা !

বিড়ি-সিগারেট-ধোঁয়া-ভুরভুর ধূপের বাস,
রাঙ্গা চন্দন ছিটায় তোমারে যক্ষ্মাকাশ,
'খোসা-ওঠা' মুখে 'মৌটুস্কি'রা গামছা পরি',
'ঘামে-ভেজা তনু হাত' দিয়ে লয় বরণ করি' !

'ঠাঠা-পড়া' রোদে জলে পুড়ে গেছে সেকেলে ঠাট—
ন্যাকা বঙ্কিম মধু ও রবির মন্ত্র পাঠ।
গোর্কি ঘোরায় ভাবের চরকি—দেখিয়া তায়
ঠোঁট চেপে ঠুঁটো 'ঠোটেকলা' হ'য়ে রবে কি হায় ?

পেঁয়াজে রসুনে রসুই করেছে তোমার খানা—
কত সে হাটের পচা বুকনির ঘুগ্‌নিদানা !
'কুটে কালো ঝড়ে' মড় মড় করে তোমার খুঁটি—
রাজ্যের যত সাধু-সজ্জন পলায় ছুটি'।

ক্নুট হামসুন, চেহভ, মোপাসাঁ, টলষ্টয়—
হুইটম্যানেরও জাত মেরে দিয়ে তোমার জয় !

'বিবাহের চেয়ে বড়' সেই বিধি তাহারি বলে,
নূতন জাতির জন্মের লাগি' চেষ্টা চলে!

নামহীন কাম-শিশুরাই এবে কুলীন সেরা—
'ঠাঠারি বাজার' হ'ল সতীদের সাধন-ডেরা!
ঝুঁটি-বাঁধা চুল, গোলাপী সেমিজ, চুরুট মুখে—
'ইভে'র দুহিতা—নহে বিবাহিতা—রাখিবে সুখে।

বৌ নয় তারা, মা'ও নয়, নয় বোন কি মেয়ে—
তারা শুধু নারী, যৌবন-তরী যাইবে বেয়ে!
হোক্ সে যেমনই বয়স, অথবা যেমনি ছিরি,
তবু মনে হয়, যেন পটখানি 'দা ভিঞ্চি'র-ই?

সধবা বিধবা কুমারী হ'ল যে পাগল পারা—
সকলেরই 'টান' বাহিরের পানে, গৃহ যে কারা!
বস্তিবাসিনী প্রেম-পসারিণী—ঘরণী সেও!
ঘরে এনে তারে ষ্টোভ্ কিনে দিয়ে—নিম্‌কি খেয়ো!

ভিক্ষা মাগিয়া পথে পথে ফেরে বিদ্যাবতী—
'পদ্মার ঢেউ' কাব্যকলায় পোক্ত অতি!
বারোয়ারী প্রিয়া হবে সেই,—তার জন্মদিনে
উপহার দিবে শেলী, ব্রাউনিং, পতিরা কিনে!

বেশ, বাহা, বেশ! ওগো নব দেবী-সরস্বতী!
আমরা তোমারে কি বলে' ডাকিব—মন্দমতি?
পূজা উপচার নাহি যে কিছুই—করেছি বিয়া,
"বৌ-বৌ'—খেলা কেমনে খেলিব, কাহারে নিয়া?"

নামহীন মোরা নহি যে গো হায়, বাপ-মা আছে—
কোন্ মুখে মোরা দাঁড়াব বল না তোমার কাছে?"

যক্ষ্মাকাশেরে বড় যে ডরাই, বাঁচিতে চাই—
মদ খেয়ে খেয়ে কেনই থামকা অক্কা পাই ?

ঘরকে বাহির যদি নাই করি, বাহিরে ঘর,
তবে কি তোমার পাব না প্রসাদ অতঃপর ?
কাব্যি ও প্রেম হবে কি ছাড়িতে একেবারে—
মা, বোন, মাসীরে রেখে দিই যদি আরেক ধারে ?

রুগ্ন শিশুরে বক্ষে দলিয়া উপোসী নারী
ক্ষুধায় আকুল, জানায় ব্যর্থ বাসনা তারি !—
এই কি বীণার শেষ সুর তব, হে বীণাপাণি ?—
আহা আহা মরি !—কি নাম নিয়েছ ?—বঙ্গবাণী ?

তব পুরোহিত শরৎ নরেশ রাগিয়া খুন—
এমন লেখারো নষ্টেরা সব গাহে না গুণ !
রাধা-মাহেন্দ্রী ভাষ্যে তাহার ভাসিল কাশী,
সেই তালে আজও কত জটীরাম বাজায় কাঁসি !

ছেলেদের সাথে বুড়ারাও দেখি ধরেছে পোঁ,
রাষ্ট্রনীতির চিলেরাও তায় মারিছে ছোঁ !—
তরুণেরে তুড়ি না দিলে যদি বা ফাঁসায় ভুঁড়ি,
তাই দিকে দিকে মাতালের সাথে মিলিছে শুঁড়ি !

সারাটা জাতের শির-দাঁড়াটায় ধরেছে ঘুণ—
মা'র জঠরেও কাম-যাতনায় জ্বলিছে ভ্রূণ !
শুকদেব যথা করেছিল বেদ-অধ্যয়ন—
গর্ভে বসেই শেষ করে তারা বাৎস্যায়ন !

বুলি না ফুটিতে চুরী করে' চায়—মোহন ধাম !
ভাষা না শিখিতে লেখে রামায়ণ—কামের সাম !

জ্ঞান হ'লে পরে মায়েরে দেখে যে বারাঙ্গনা !—
তার পরে চায় সারা দেশময় অসতী-পনা !

সমাজের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, শেষে
বীরের মতন প্রাণ দিবে তারা মধুর হেসে।
বুকের ব্যথায় টানে সিগারেট ঘড়িক্ ঘড়ি,—
যক্ষ্মায় যদি না মরে, আছে ত গলায় দড়ি !

এদেরি পূজায় ধরা দিয়েছে যে—সরস্বতী,
চিনি নে তোমায়, কোন্ বনে তুমি আছিলে, সতী ?
দেখি, তুমি শুধু নাচিয়া বেড়াও হাঁস-পা-তালে,—
অঙ্গে ধবল, কুষ্ঠ ও বুঝি ওষ্ঠে গালে !

জানি, পূজা হয় লক্ষ্মীর সাথে আ-লক্ষ্মীর,—
সে পূজায় কেহ দেয় না অর্ঘ্য, দধি ও ক্ষীর।
কড়ি ও গোবরে গড়িয়া শুধুই মূর্তি তার,
কুলার বাদ্য বাজায়ে করে যে বহিষ্কার।

বাণীর পিছনে তেমনি তুমিও প্রেতিনী-বাণী—
তেমনি গব্যে গড়িব তোমার প্রতিমাখানি ;
ভাঙ্গা কলসীর কানা দিয়ে গলে, বরণ করি
এস গো তোমায়, নব-নবীনের বাগীশ্বরী !

শ্রীকৃত্তিবাস ওঝা

('শনিবারের চিঠি' : ফাল্গুন ১৩৩৪, পৃ ৩৩-৩৭)

প্রশ্নোত্তরে

বেতাল

(১)

কোন্ দেশে হয় বলিতে পার কি মোরে ?
খোকা পেটে এল জানে ছোট বউ স্নান ক'রে এসে ভোরে
বিধবা কোথায় মদ খেয়ে করে কৃষ্ণ-রাধিকা লীলা—
ভাগলপুরেতে ? ঐ যা, ভুলিয়া গিয়াছি কি যেন villa ?

(২)

'লজগজে' ভাষা কোথায় কাহারা বলে ?
পালঙ্কে শুয়ে গরীবের লাগি যেথা চোখ ভাসে জলে।
নিচে যারা মেকী তবুও বিকায় খাঁটি গব্যের দরে—
লক্ষ্ণৌ, না না মস্কো হবে বা, পুছ পণ্ডিতবরে।

(৩)

উকীল কোথায় গল্প নবেল লেখে—
রাহাজানী আর খুনী মাম্‌লার ব্রিফগুলা শুধু দেখে ?
ভদ্র ঘরের প্রেম ভালবাসা কে দেখাল মিছা ফাঁকা—
কেহ কহে, বুঝি ভবানীপুরেতে, কেহ বলে, না না ঢাকা।

(৪)

সাহিত্য কোথা মৃত্তিকা ফুঁড়ে উঠে ?
পদী খেঁদি আর পটলি কোথায়, দেয় সাহিত্য-ঘুঁটে ?
যার সনে ছেলে, ছোটদি ও ভাই, দেওর বৌদি সনে—
প্রেম করে কোথা ? পটলডাঙ্গাতে ? কেহ বলে ঠনঠনে।

(৫)

ইচড়ে পাকিলে কোথা হওয়া যায় কবি ?
'বেদে' এম-এ পড়ে, 'লা গায়োকোণ্ডা, দ্য ভিঞ্চির' ছবি।

ভদ্র বাড়ীতে শিক্ষিতা মেয়ে গোলাপী সেমিজ গায়—
থাকে কোথা শুধু? লেখকের ঘরে—আর কোথা পুছ তায়।

(৬)

বেনামী ভদ্র নাম করে কোথা ভাই—
ঘেয়ো মন নিয়ে ঘেয়ো কারা দেখে সকল দুনিয়াটাই?
মুটে মজুরের কবি যেবা তার ভেঙে গেল শিরদাঁড়া—
কাশী কালীঘাট যেথাই সে থাকে, খায় শুধু নথ-নাড়া।

(৭)

তরুণ বয়সে ভীমরতি কোথা হয়?
বালকের মন রমণ-রণেতে নিতি মাগে পরাজয়—
ঝুটা কোথা হয় শাস্ত্র-বিবাহ, স্বামী নামটাই ফাঁকি,
কপিলাবস্তু? যশোধরা কা'র হস্তে বাঁধিল রাখী?

(৮)

রবির আলোকে জোনাকি কোথায় জ্বলে?
আইন-না-মানা বীরপুরুষেরা প্রেম মাগে আঁখিজলে!
ভাঙা ক্লীব দেহ, pan-মৈথুন-ইচ্ছা কোথায় মনে?
কোথায় কে জানে? বঙ্কিমবাবু মরেছে শুভক্ষণে!

('শনিবারের চিঠি' : অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ ২৭৮-২৭৯)

'শনিবারের চিঠি'র (অগ্রহায়ণ ১৩.৫) "মণি-মুক্তা" বিভাগে (পৃ ২৭২-২৭৮) যে-সব গল্প উপন্যাস প্রবন্ধের উল্লেখ আছে এখানে সে সবেরই অনুষঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে আগ্রহী পাঠকদের জন্য সে-সব বিষয় উল্লেখ করা হল—

১. খোকা আয়! খোকা আয়, 'কালি-কলম,' ভাদ্র, ১৩৩৪
২. 'ঠাট্-টা', 'কল্লোল,' কার্ত্তিক, ১৩৩৪
৩. বিচার, শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'বঙ্গবাণী,' আশ্বিন, ১৩৩৪
৪. মিথ্যে খবর, 'বঙ্গবাণী,' আশ্বিন, ১৩৩৪
৫. মাঠ ও বাজার, 'উত্তরা,' ভাদ্র, ১৩৩৪

৬. দিদিমণি, 'কালি-কলম', বৈশাখ, ১৩৩৩
৭. শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, "সাহিত্যে নব কলেবর", 'উত্তরা', আশ্বিন, ১৩৩৪
৮. ডাকঘর, 'কল্লোল', অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'

'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩৪-এর মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য ধর্ম্ম" প্রবন্ধ বিষয়ে মন্তব্য আছে। সেখানে বলা হয়েছে,—'কবি বলেন, "উপনিষদ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁকে না পাই মনে না পাই বচনে, তাঁকে যখন পাই আনন্দ বোধে, তখন আর ভাবনা থাকে না। আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে প্রেমে, যে ধ্যানে, যে দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপকলায়।" সাহিত্যের রসকলার প্রকৃতি এইভাবে নির্ণয় করিয়া বাকি আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলিতেছেন—

'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখনকার কেউ কেউ মনে করছেন, নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা মাখামাখির রূঢ়তায় একটা শক্তি আছে, সত্য, কিন্তু "এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্য-কলার নয়"।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আশা করি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতা অপনীত করিয়া সংযমের সূত্রপাত করিবে। (১৯শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ ৮২)।'

আশ্বিন ১৩৩৪-এ "সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতা" নামে শ্রীবসন্তকুমার ভৌমিকের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন কিছুদিন হল বঙ্গসাহিত্যে নূতন এক শ্রেণীর উপন্যাস লেখকের আবির্ভাব হয়েছে তারা বিদেশ থেকে নতুন রকমের আর্টের আমদানি করে আর্টের কসরৎ করছেন। 'ইহাদের চিন্তার ধারা ভাগীরথীর পূত খাত পরিত্যাগ করিয়া গোবর নালার পঙ্কিল স্রোতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।'

স্ত্রী পুরুষের অবাধ ব্যভিচার, ভোগলিপ্সার বহ্নিতে আত্মসমর্পণ আর্টের নামে সাহিত্য বলে চলছে। এ-সব উপন্যাসে অসংযত চিত্তের উদ্দাম উত্তেজনাকে 'প্রেম'

বলে প্রচার করা হচ্ছে। শেষে লেখক মন্তব্য করেছেন, 'এই সমস্ত উপন্যাস বিছানায় ছারপোকার বংশবৃদ্ধির মত বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। এই কামেশ্বর বা মদনানন্দমোদক মার্কা সাহিত্যের ঝালবড়াগুলি সুকুমারমতি যুবকদের মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি করিতেছে। এইগুলি সাহিত্য নহে—ইহা মা সরস্বতীর প্রাঙ্গণের আবর্জনা; সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে ঝাঁটাইয়া আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপেই এই জাতীয় আবর্জ্জনা-দূরের সঙ্গত উপায়।' (আশ্বিন ১৩৩৪, পৃ ১৬৩)

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪-এ মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা পর্যায়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" প্রবন্ধের সূত্রে বিস্তৃত পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথ-নরেশচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের আলোচনায়। এখানে মন্তব্য করা হয়েছে—'আমাদের মনে হয় শরৎবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বক্তব্য ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাহিত্যের অলংকার জিনিসটাই হলো চরমের প্রতিরূপ। অলংকৃত বাক্য হচ্ছে রসাত্মক বাক্য। সাহিত্যধর্মের এই সুন্দর দ্যোতনাকে উপহাস করেছেন শরৎচন্দ্র। বলেছেন, 'রস বস্তু লইয়া আমি আলোচনা করিতে পারিব না। কারণ ও আমি জানি না'।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে সাহিত্যের ধর্ম নির্দেশ করেছেন। বলেছেন, রসবোধ নিয়ে সাহিত্যের বেসাতি, বিজ্ঞানের কাজ সেটা নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ধারণা রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের প্রতি বিমুখতা দেখিয়েছেন। আধুনিক সাহিত্যে অশ্লীলতা, বে-আব্রুতার যে সকল চিত্র বের হচ্ছে তা সাহিত্য পদবাচ্য নয়, কারণ তাতে রসের সম্পূর্ণ অভাব। ঐ সকল রচনায় আছে Anatomy, sex-psychologyর কথা—mental aberration-এর চিত্র—এ-সবও আবার রসের সাহায্যে বলা হয় না। এ-সকল রচনার স্থান তাই সাহিত্যে নয়—বিজ্ঞানের রাজ্যে।

শরৎচন্দ্রের আরো একটি অভিযোগ, যে-সকল রচনার উপর খড়্গহস্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ রচনা করেছেন, 'সে সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময় ধৈর্য্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক-আধটা টুকরো টাক্‌রা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুইই গিয়াছে। সুরু হইয়াছে শুধু চিৎপুর রোডের খচ্‌-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্তিত গর্জ্জন।' তারপর তিনি বলেছেন যে সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এতবড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, তাঁরও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নেই। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ তো কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। মনস্তত্ত্ববিৎ ফ্রয়েড প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকদের তথাকথিত সত্যগুলি যারা পরীক্ষা না করে কেবলমাত্র অনুকরণ করেই সাহিত্যের বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে, তাদের লক্ষ্য করে তিনি বলতে চান—যদি এই সকল সত্য প্রমাণিত সত্য হয়, তাহলে বিজ্ঞানের বই লেখাই কাম্য, রসলেশহীন রচনা সাহিত্য বলে চালানোর চেষ্টা ঠিক নয়। কারণ বিজ্ঞানের ধর্ম হচ্ছে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখানকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরেছে। এর হাত থেকে প্রকৃত সাহিত্যকে বাঁচাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌন-মিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চলবে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশন যুগে যেটা ছিল লালসা। কিন্তু সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটীকা চিরদিনের মতো পায়নি, আজ-কালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিকৃতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'রান্নাঘরে ভাঁড়ার ঘরে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজন কিন্তু বিশ্বজনের কাছে গৃহস্থ ঐ দুটো ঘরই গোপন করে রাখে।'—শরৎচন্দ্রও লিখেছেন, 'কবি তাঁহার সাহিত্যধর্মে নরনারীর যৌনমিলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার মনে হয় উপন্যাস সাহিত্যেও তাহা খাঁটি কথা।' বস্তুত এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মত-পার্থক্য নেই। শরৎচন্দ্র এরপর লিখেছেন শরীর ব্যাপার মাত্রই অপাঙ্‌ক্তেয় নয়, নরেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র থেকে তিনি উদাহরণও দিয়েছেন। "চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যসম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে।"—এরপর শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'আমি নিজেও ত একজন ছোট সম্রাট, কিন্তু আলিঙ্গন ত দূরের কথা চুম্বন কথাটা আমার বইয়ের মধ্যে কোথাও দিতে পারিলাম না।'...

কিন্তু 'চুম্বন' 'আলিঙ্গন' শরৎচন্দ্রের লেখায় কোনো বিরল ঘটনা নয়। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে স্বামী, চরিত্রহীন, গৃহদাহ ইত্যাদি লেখা থেকে।

ক) হাঁ ঠাকুরপো আমিই।—বলিয়া কিরণময়ী বিহ্বল দিবাকরের বুকের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

খ) সুরেশ হাত ছাড়িয়া দিল, কিন্তু চক্ষের পলকে উঠিয়া বসিয়া দুই ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া অচলাকে তাহার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিল।

গ) 'সাবিত্রী'র মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সেই উৎস অশ্রু নিজের অগ্ন্যুত্তপ্ত ওষ্ঠাধরের ওপর টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিল।

ঘ) কিরণময়ী তাহার (দিবাকরের) অশ্রুসিক্ত মুখ নিজের বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিল এবং ধীরে ধীরে তাহার মাথার মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

শরৎচন্দ্র নরেশচন্দ্র বিষয়ে লিখেছেন—'তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই, কখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার সমতুল্য লেখক কেহ আছেন বলিয়া ত স্মরণ হয় না।'

শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য আছে—এই প্রবন্ধ শরৎচন্দ্রের গৌরবকে ম্লান করিয়া দিয়াছে অন্ততঃ সমালোচনা করিবার, যুক্তিদ্বারা যুক্তিজাল খণ্ডন করিবার শক্তি ইহাতে তাঁহার আদৌ দেখা গেল না; অধিকন্তু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে সকল দোষে অভিযোগ তিনি আনিয়াছেন, সেগুলি হইতে নিজেও তিনি মুক্ত নহেন।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে ফাল্গুন ১৩৩৩-এ বিপিনবিহারী গুপ্ত'র "অর্ব্বাচীন" প্রকাশিত হলো। সেখানে তিনি এই মন্তব্য করলেন যে বাংলা সাহিত্যে যে নতুন বিকাশ অর্থাৎ অত্যন্ত আধুনিক রিয়ালিজম্ তা বেশিদিনের নয়। গত বিশ-বাইশ বৎসরের মধ্যেই এর নানা সূত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ব্যবস্থায় কলেজের তরুণ ছাত্ররা অবসর বিনোদনের জন্য একটা আলাদা ঘর পেলেন। তাঁদের সম্মুখে সমস্ত আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য উপস্থাপিত করা হলো। 'রুষিয়া, জার্ম্মানি, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, ইটালী, ইংলণ্ড একেবারে হুড়মুড় করিয়া তাহাদের সম্মুখে হাজির।' অনেকেই মনে করল সেইসব বিষয়ই চিরন্তন সত্য। সেইসব সমস্যা যে ইউরোপীয় সভ্যতার একান্ত নিজস্ব, বিস্ময়ের ঘোরে তরুণদের মনে এ প্রশ্ন জাগল না। মার্কিন লেখিকা 'ইণ্টারন্যাশনাল জর্নাল অব এথিক্স্' পত্রিকায় নারী জাতিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করলেন—mother woman, lover woman এবং Neuter woman। আমাদের তরুণদের পক্ষে এ-ধারণা দুষ্পাচ্য হলো। কিন্তু বাঙালী মেয়ে লিখলেন সতীত্বের সঙ্গে দেহের কোনো সম্পর্ক নেই। আর-এক লেখিকা তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রের মুখ দিয়ে বলালেন, ধর্মপত্নীর চেয়ে বারবণিতা ঢের ভালো। উভয়েই দেহ বিক্রয় করে, কিন্তু পতিতা ইচ্ছা করলে না করতেও পারে।

('মাসিক সাহিত্য সমালোচনা': অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ ৩৯১-৩৪৪)

'উত্তরা'

"সাহিত্যের নব-কলেবর" লিখলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'উত্তরা'র আশ্বিন সংখ্যায় (পৃ ৬৫-৭০)। তিনি বললেন দৈনন্দিন জীবনে আজ কি ভীষণ উত্তাপ, প্রতিযোগিতার কি অশোভন লীলা, হৃদয়হীনতার কি নিদারুণ অভিব্যক্তি। আজ রাজপথে মজুর ও মধ্যবিত্ত কাঙাল গা ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়াল। দৈন্য, ক্লেশ, নির্যাতন মানুষের নিত্য সঙ্গী, তবুও এর সঙ্গে আছে মায়া মমতা, স্নেহ-প্রীতি, মানুষের মহত্ব, আত্মার চরম অভিব্যক্তি। এই নূতন জীবনের অভিজ্ঞতাই নব্য-সাহিত্যের কথা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো সবাই—প্রবীণ সম্পাদক বললেন, 'বকাটে ছেলের অপরিপক্ক জেঠামির সাহিত্যে অনধিকার প্রবেশ'। আর্টিস্ট বললেন, 'এ সাহিত্য একেবারে নগ্ন ও অসভ্য, ইহাতে শিল্পের সৌন্দর্য্য নাই।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ ও অচিন্ত্যকুমার সাহিত্যে নিয়ে এলেন নতুন মানুষদের যারা এতদিন সাহিত্যে ছিল নিষিদ্ধ-প্রবেশ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উল্কী-কাটা সুরকীর কলের মজুরনী নেত্য, বা ঠনঠনের মুচীর মেয়ে পাঁচি—অবহেলা, দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যেও রয়েছে এদের মনুষ্যত্বের ইতিহাস। বাস্তবিক বস্তি-জীবন শৈলজা প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যর লেখায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

এদের ভাষা সতেজ, মর্মস্পর্শী, যেমন মানুষগুলোর শুকনো খোসা-ওঠা মুখ, কোটরে ঢোকা চোখ, রোগে অতিশ্রমে ঠোঁট বাঁকা, তীক্ষ্ণ, ভাষাও তেমনি তীক্ষ্ণ শক্ত ও জোরাল। লেখক মন্তব্য করেছেন, 'সর্বাপেক্ষা বড় গৌরব ইহাদের, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অপেক্ষা ইহারা জীবনের জটিলতা ও বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাইয়াছেন।' রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র নৌকাডুবি, চোখের বালি এবং চরিত্রহীন সংস্কারের সীমানা যাতে অতিক্রম না হয় এই সাবধানতায় আড়ষ্ট এবং ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু আমাদের নব্য সাহিত্যিকেরা এই বাধা থেকে মুক্ত। যাদের জীবন এঁরা আঁকছেন তারা যে একেবারেই বে-পরোয়া, সংসারের পরিত্যক্ত টুটা-ফুটার দল। সমাজ এদের ঘৃণ্য, দূষিত বলে ত্যাগ করেছে তাই সমাজের বিরুদ্ধে এদের অভিযান।

অনেকে অভিযোগ করেছেন আধুনিক সাহিত্যে আদিম প্রবৃত্তিকে নগ্ন করে

দেখানো হচ্ছে। যৌনপ্রেম কদর্যভাবে অঙ্কিত হচ্ছে। কিন্তু এখানে সমাজের ভাঙা-গড়াকে আশ্রয় করেই যৌনপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে তিনি বলেছেন বহুদর্শী, দার্শনিক। শৈলজানন্দ অবনত মানব-সমাজের কথক ও প্রচারক। অচিন্ত্যকুমারের বিষয় ও ভাষা সর্বতোমুখী এবং অনবদ্য।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী ষষ্ঠ অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসেবে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিভাষণ দেন সেখানেও 'সাহিত্য-ধর্ম' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ছিল। ('উত্তরা' : মাঘ ১৩৩৪, পৃ ৩২৫-৩৩৯)

প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন দিল্লী অধিবেশনে পঠিত "অতি-আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য" প্রবন্ধটির কথা যেখানে তরুণ সাহিত্যিকদের রচনার উপর তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে। তারপর বেহার-প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর মোজঃফরপুর মজলিসে, আধুনিক সাহিত্যের ভাষা, রীতি, নীতি ও নগ্নতার বিরুদ্ধে পুনরায় কড়া মন্তব্য করা হয়। তরুণরা তখন নিজেদের পক্ষে মতবাদ প্রকাশ করা শুরু করেন। তাঁদের বর্তমান অবস্থার কদর্যতা, যৌনকামনার নগ্নতা ও কুৎসিততা সত্যের খাতিরে তাঁরা দেখাতে চান। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-ধর্ম' প্রকাশিত হলো। যেহেতু সাহিত্যের আসরে ঘাতপ্রতিঘাত চলছিল তাই কেউ কেউ তাকে সাদরে গ্রহণ করলেও একদল তার বিরুদ্ধে কথা বলল।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'আমার মনে হয়—"সাহিত্য-ধর্ম" পড়ে আমরা তার বিচারটা করেছি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি—বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ায়। তাই সেটা বিতণ্ডার আকার ধরে কেবল কথাই বেড়ে চলেছে।'

সাহিত্য আমাদের গৌরবের জিনিস হয়ে গড়ে উঠেছে, তাকে নব নব শ্রী দান তরুণরাই করবে—সকল দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির তারাই অগ্রদূত। জাতীয় হোক, বিজাতীয় হোক প্রথম স্রোতের প্রবাহকে পথ করে চলতে হয় তাই তাতে আবিলতা আবর্জনা এসে পড়া অস্বাভাবিক নয়। ক্রমে তা আপনিই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। যাঁদের লেখায় ক্ষমতার পরিচয় আছে, লেখার মধ্যে তেমন কিছু থাকলে তা বুঝতে আর বাদ দিতে তাঁদের বিলম্ব হয় না। লেখক J. Garrett Underhill-এর মন্তব্য উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'Great art must not only be original, it must be tolerant and sincere.'

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লেখেন "সাহিত্যে দলাদলি"। প্রবন্ধটি 'উত্তরা' পত্রিকায় ভাদ্র ১৩৩৪-এ (পৃ ৮৫৩-৮৫৪) প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি লিখলেন

যে লোকে বলছে কল্লোল কালিকলম ও প্রগতির সঙ্গে অন্যান্য পত্রিকার আদর্শগত পার্থক্য আছে। কিন্তু কী কারণে পার্থক্য সেটা লেখকের কাছে স্পষ্ট নয়। শরৎ-বাবুকে সকলেই বঙ্গসাহিত্যের 'বয়াটে' ছেলে বলেই জানে। তিনি এক প্রবাসী ছাড়া অন্যসব পত্রিকাতেই লিখেছেন। নরেশ সেনগুপ্তর লেখাও সর্বত্র সমাদৃত হচ্ছে। আদর্শতান্ত্রিক ও বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য বলে কোন কথা নেই, সব তন্ত্রই সময়সাপেক্ষ। 'আজকের আদর্শ, পরস্পর জীবনানুভূতি। সাহিত্য নয় ভাল, নয় মন্দ, অর্থাৎ সাহিত্য হয় সাহিত্য, না হয় সাহিত্য নয়।' লেখকের মতে দাসত্ব করা আর্টের ধর্ম নয়। জীবনের কোন প্রকার প্রয়োজনীয়তা, দেহরক্ষা, সমাজরক্ষা ধর্মরক্ষা আর্টের বিষয় নয়। আর্টের তাই দল নেই, আর সেইজন্যই বোধহয় আর্টিষ্টের কোনো জাতি নেই, ধর্ম নেই। কিন্তু আর্ট যখন স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করে তখনই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। লেখকের মতে কল্লোল কালিকলম, প্রগতির লেখকরা যদি সমাজসংস্কারে বদ্ধপরিকর না হয়ে সত্যিকারের সাহিত্যসেবী হতেন অথবা অনুরূপা দেবী, যতীন্দ্রনাথ সিংহ প্রভৃতি লেখকরা যদি হিন্দুধর্ম ও সমাজের আদর্শরক্ষায় অত ব্যস্ত না হতেন তা হলে বাংলা সাহিত্যের যথার্থই উপকার হতো।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের "সাহিত্যে অশ্লীল" প্রকাশিত হয় ফাল্গুন, ১৩৩৪-এর 'উত্তরা'য় (পৃ ৪৫৬-৪৫৭)। তাঁর মতে সাহিত্য অনেক সময় নতুন প্রকার যৌন-সম্পর্ক কল্পনা করে, সমাজের অভ্যস্ত ধর্মকে অতিক্রম করে একটা নতুন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন সমাজপতিরা সেই সাহিত্যকে বলে এ সাহিত্য সমাজদ্রোহী ও অশ্লীল।

সাহিত্য যখন ইন্দ্রিয় ভোগের পশ্চাতে পরোক্ষকে, মনোময় বস্তুকে অন্বেষণ করে তখন তা কিছুতেই অশ্লীল বা অসুন্দর হয় না। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে বইগুলিকে অশ্লীল বলা হয়, তাদের মধ্যে দেখা যায় রক্তমাংসের পশ্চাতে দেহের একটা জৈব আনন্দ, যা Growth of the soil অথবা Sanineএ অসুন্দরকে সুন্দর করে তুলেছে। Growth of the soilএ মানুষ প্রকৃতির বরপুত্র। তার কান যেন আকাশের বা গাছপালার রঙের পরিবর্তনের মতো নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। Sanineএ সম্ভোগ সরল ও অকৃত্রিম। এখানেও মনোময় বস্তুটি দেহের উপাদানে গঠিত, তবুও দেহের অতীত। তাই সাহিত্য অশ্লীল হয়নি। লেখক শেষে মন্তব্য করেছেন যে আমরা নিয়মকানুনের দাস হয়ে প্রেমকে পদদলিত করি। প্রেমের রূপ হচ্ছে দেহ, প্রাণ হচ্ছে আনন্দ। 'প্রেমের

বাহিরের রূপ মনসিজ মদনের ; অন্তরের রূপ শিব-সুন্দরের। যাহা নিত্য আনন্দের প্রস্রবণ তাহাই সুন্দর। হইলেই বা তাহা বাহিরে কুৎসিত।'

'উত্তরায়' ১৩৩৫-এর বৈশাখ সংখ্যায় লেখা হলো যে, আধুনিক সাহিত্য নিয়ে বাংলা দেশে কোনো রকমেরই অসহিষ্ণুতা আর অসংযম বাকি রইল না। রবীন্দ্রনাথ চিৎপুরের রোডে কাদা ছোঁড়াছুড়ির কথা বলেছিলেন আজ তা সত্য হয়ে উঠল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুঃখ এইখানে যে শনিচরদের ব্যক্তিগত কুৎসা রটনার যে কদর্য প্রবৃত্তি তাকে তিনি বেশ 'ক্ষমাসুন্দর চক্ষে' দেখে, তার যেখানে কলমের জোর দেখলেন সেখানেই উচ্ছ্বসিত হয়ে আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন। শনির শক্তি তাঁর চোখে পড়ল খুবই অনায়াসে। অথচ শনির উদয়ের আগে যে সব তরুণ লেখক শ্রী-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের তেমন করে উৎসাহিত করলেন না। 'একে ভাগ্যচক্রের লীলা ছাড়া আর কি বলা চলে? কারণ রবীন্দ্রনাথকে অনুদার মনে করতে আজও আমাদের লজ্জা হয়।'

উত্তরাপন্থীদের মনে হয়েছে যদি রবীন্দ্রনাথ বাংলার তরুণ সাহিত্যিকদের তাঁরই ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী মনে করে, তাদের অপরিণত শক্তিকে বিকার মুক্ত করবার চেষ্টা করতেন, তাদের রূঢ় আঘাত না করে যদি স্নেহদৃষ্টি দিয়ে শাসন করতেন তাহলে এতদিনে বাংলা সাহিত্য বিকারে পূর্ণ না হয়ে অন্যরকম হলেও হতে পারত।

কিন্তু এখন শনিচরদের পৈশাচিক গালাগালি অপরদিকের বিকারগ্রস্ততাকে বাড়িয়ে তুলচে। 'এতে শনিমণ্ডলের আনন্দ হবারই কথা, কারণ শনিমণ্ডলকে বেঁচে থাকতে হলে বিকৃত সাহিত্য থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।'

'কালিকলম'

'কালিকলমে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৩-এর বৈশাখে। প্রথম সংখ্যায় ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের "মানুষের মানে চাই" সেখানে কবি ঘোষণা করলেন, মানুষের মানে চাই—গোটা মানুষের মানে! / রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা, / ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত / গোটা মানুষের মানে চাই (পৃ ৫০)

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩-এর দ্বিতীয় সংখ্যা শুরু হয়েছে নজরুল ইস্‌লামের "মাধবী প্রলাপ" কবিতা দিয়ে।

আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে প্রতি।
তার নিধুবন-উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন,
বুকে পীন যৌবন
উঠিছে ফুঁড়ি,
মুখে কাম-কণ্টক ব্রণ মহুয়া কুঁড়ি।
করে বসন্ত বনভূমি সুরত কেলি
পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি।

এই কবিতা নিয়ে সাহিত্যের দণ্ডধারী কর্তারা বিচলিত হয়েছিলেন। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় জীবনানন্দ দাশগুপ্তর "পতিতা" (পৃ ৯৮) প্রকাশিত হয়েছিল—আগার তাহার বিভীষিকা-ভরা, জীবন মরণময় /···মানুষ তবু সে,—তার চেয়ে বড়—সে যে নারী, সে যে নারী···।

'কালিকলমে' প্রথম বছরেই নজরুলের "মাধবী প্রলাপ" ছাড়াও "অ-নামিকা" কবিতাও প্রকাশিত হয়। সে-কবিতা নিয়েও অশ্লীলতার প্রসঙ্গ উঠেছিল! এ-ছাড়াও প্রথম বছরে "গোপন প্রিয়া", "সিন্ধু" প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হয়।

জীবনানন্দ দাশেরও আটটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে প্রথম বর্ষে। মোহিত-লালের "নাগার্জুন" ছাপা হয়েছে প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায়। সে-কবিতাও অশ্লীলতায় অভিযুক্ত।

'কালিকলমে' ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপা হয়েছিল মোট ছ'টি। তার মধ্যে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চিত্রবহা" উপন্যাসের দুটি পরিচ্ছেদ নিয়ে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল। একটি 'যৌবনবেদনা' আর একটি 'নরকের দ্বার'। এর সঙ্গে অভিযুক্ত ছিল নিরুপম গুপ্তের "শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে"। এই ছদ্মনামে আসলে লেখক ছিলেন কাশীর মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩-এর 'কালিকলমে' প্রেমেন্দ্র মিত্রর "পোনাঘাট পেরিয়ে" ছাপা হয়েছিল। এরই বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন মহেন্দ্র রায়। আর তাঁরই গল্প "শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে" ছাপা হলো ১৩৩৪-এর জ্যৈষ্ঠ মাসে—সে-গল্প অশ্লীলতায় অভিযুক্ত হলো। অবশ্য অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন মহেন্দ্র রায় 'কালিকলমে' প্রকাশিত 'লেখরাজ সামন্ত' ছদ্মনামে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "দিদিমণি" গল্পের বিরুদ্ধেও। নজরুলের "মাধবী প্রলাপ" এবং মোহিতলালের "নাগার্জুনে"র বিরুদ্ধেও আপত্তি ছিল তাঁর। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগে' এর বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়। পুলিস এসে 'কালিকলমে'র অপিসে হানা দিয়েছিল। সম্পাদক মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রকাশক শিশিরকুমার নিয়োগীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা।

মুরলীধর বসু আর শৈলজানন্দ লালবাজারে গিয়ে শুনেছিলেন যে পুলিশ অফিসারদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ও-সব লেখা পড়ানো হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন 'কল্লোল যুগে', 'সাহিত্যজগতের সব শূর-বীর, ধন-রত্ন—এক কথায় সব কেষ্টবিষ্টু। তাদের কথা কি ফেলতে পারি?'

বিচারের দিন আদালতে দাঁড়িয়ে মুরলীধর বসু বলেছিলেন, 'আমাদের পক্ষে কোন উকিল নেই। একমাত্র ভবিষ্যৎই আমাদের উকিল'। বিচারের রায়ে আসামীদের benefit of doubt দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। "চিত্রবহা"কে কেন্দ্র করে যে মামলা চলেছিল সে বিষয়ে বিচলিত হয়েছিলেন তৎকালীন আর-এক তরুণ সাহিত্যিক। তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি তখন বিলাতে। এই বইকে সমর্থন করে 'নবশক্তি'তে তাঁর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। চিঠিতে অচিন্ত্যকুমারকে লিখেছিলেন, 'হঠাৎ একই যুগে এতগুলো ছোট-বড়-মাঝারি লেখক মিথুনাশক্তিকে অত্যধিক প্রাধান্য দিতে গেল কেন? দেখে শুনে মনে হয় বিংশ শতাব্দীর লেখক-মাত্রই যেন Keats-এর মতো বলতে চায়, "I felt like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken." আলিবাবার সামনে যেন পাতালপুরীর দ্বার খুলে গেল। "শোনো শোনো অমৃতের পুত্রগণ,

আমি জেনেছি সেই দুর্বার প্রবৃত্তিকে, যে প্রবৃত্তি সকল কিছুকে জন্ম দেয়, সে প্রবৃত্তি স্বীকার করলে মরণ সত্ত্বেও তোমরা বাঁচবে—তোমাদের থেকে যারা জন্মাবে তাদেরি মধ্যে বাঁচবে। অসার এই সংসারে কেবল সেই প্রবৃত্তিই সার, অনিত্য এই জগতে কেবল সেই প্রবৃত্তিই নিত্য।" এ যুগের ঋষিরা যেন সেই তত্ত্বই ঘোষণা করছেন। Personal immortality-তে তাঁদের আস্থা নেই—race immortality-ই তাঁদের একমাত্র আশা। এবং race immortality-র কুঞ্চিকা হচ্ছে sex। যে বস্তু গত কয়েক শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া সাহিত্যে taboo হয়েছিল কিংবা বড় জোর রেস্টোরেশন যুগের ইংলণ্ডে বা ভারতচন্দ্রীয় যুগের বাংলাদেশে বৈঠকখানাবিহারী বাবুদের মদের সঙ্গে চাটের স্থান নিয়েছিল। সেই বস্তুই আজকের সমস্যাসংকুল বিশ্বে নতুন নক্ষত্রের মতো উদয় হলো। একে যদি বিকারের লক্ষণ মনে করা যায় তবে ভুল করা হবে। আসলে এটা হচ্ছে প্রকৃতির পুনরাবিষ্কার। মানুষের গভীরতম প্রকৃতি বহু শত বছরের কৃত্রিমতার তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। এতদিনে পুনরুদ্ধারের দিন এল। অনেকখানি আবর্জনা না সরালে পুনরুদ্ধার হয় না। অথচ আবর্জনা সরানো কাজটা বড় অরুচিকর। sex সম্বন্ধে ঘাঁটাঘাঁটি সেইজন্যে বড় বীভৎস বোধ হচ্ছে। কিছুকাল পরে এই বীভৎসতা—এই বিশ্রী কৌতূহল—এই আধেক ঢেকে আধেক দেখানো—এসব বাসি হয়ে যাবে। sexকে আমরা বিস্ময় সহকারে প্রণাম করবো, আদিম মানব যেমন করে সূর্যদেবতাকে প্রণাম করতো।'

'কালিকলমে'র ১৩৩৩-এর ফাল্গুনে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন "সাহিত্য" (পৃ ৭০৫)—'ফটোগ্রাফের সঙ্গে শিল্পীর আঁকা ছবির যে পার্থক্য আমার বন্ধু নজরুল ইসলামের এই কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়সের লেখা তনু, চুম্বন, বিবসনা, দেহের মিলন, ও স্তন কবিতাগুলির পার্থক্য আছে বলে মনে হয়। খণ্ডরূপের বর্ণনায় সমগ্রতার আভাষ দেওয়ার যে কি প্রয়োজন আছে তা যে কেউ এই কবিতা কয়টি পড়লেই সহজে বুঝতে পারবেন—("মাধবী প্রলাপ") কবিতাটিতে একটা মাংস লোলুপতা ফুটে বের হচ্ছে। নারীকে শুধু মাংস পিণ্ড ভেবে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।'

তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মহেন্দ্রচন্দ্র রায় লিখেছেন—"জীবন ও আধুনিক সাহিত্য"। সেখানে তিনি মন্তব্য করলেন যে আমাদের বাঙলা সাহিত্যে যে 'আধুনিকতার উপদ্রব' দেখা দিয়েছে তা অনেকাংশে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও শিল্পের (সিনেমা) প্রভাব। আমাদের সাহিত্য হচ্ছে নাগরিক সাহিত্য। নাগরিক জীবনে

মানুষ নানা দিক দিয়ে তার কামশক্তিকে প্রকাশ করতে বাধা পাচ্ছে বলেই সে ফিরে এসে আবার যৌনকামনার মধ্যেই উগ্রভাবে আপনার তৃপ্তির সন্ধান করতে আরম্ভ করেছে। আধুনিক সাহিত্যেও তাই অতিমাত্রায় দেহাত্মবাদ।

'কালিকলমে' "সাহিত্যের আটচালা" বিভাগে আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনে সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকত। সেখানে 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিও কটাক্ষ থাকত মাঝে মাঝে। ১৩৩৫-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লেখা হল যে অতি আধুনিক সাহিত্যিকেরা সুলেখক কিনা সে বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে, কিন্তু তাঁরা যে শক্তিমান লেখক সে বিষয়ে সন্দেহ করবার আর বিশেষ অবসর নেই। ওঁদের লেখা সে শুধু তরুণ বয়স্কদেরই মাথা খারাপ করেছে তা নয়, অনেক প্রবীণ বয়স্কদেরও বিকৃত মস্তিষ্ক করে তুলেছে।

'শনিবারের চিঠি'র "মণিমুক্তা" নিয়েও বিদ্রূপ আছে "সাহিত্যের আটচালা"য়। 'শনিবারের চিঠি'র হট্টগোলের হাট থেকে "মণিমুক্তা"র হঠাৎ অন্তর্ধানের হেতু কি? রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে বাংলার সকল সাহিত্যিকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁরা এতদিন এটা বন্ধ করেননি। তাই সন্দেহ হয় যে বাহিরের টিপ্পনীর ফলে নয়, হয়তো কোনো রকম অন্তরটিপুনির ফলে তাঁদের "মণিমুক্তা"র ব্যবসায় বন্ধ করতে হলো।

কিন্তু ওই ব্যবসাটাই ছিল যে লাভজনক। মণিমুক্তাবিহীন 'শনিবারের চিঠি' যে মাটির দরে বিকুবে, কেউ কিনবে কি? ভূতের মুখে রাম নাম শুনতে অপরের যতই ভালো লাগুক ভূতের পক্ষে তো সেটা বিশেষ সুবিধার নয়।

'প্রগতি'

'প্রগতি' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৩৩৪-এর আষাঢ়ে। সাহিত্যের এই বিতর্কের দিনেই তার প্রকাশ আর এরও চেয়ে বড়ো কথা এর সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতম হলো "রজনী হল উতলা"র লেখক। 'কল্লোল' গল্প উপন্যাস প্রকাশ করে তরুণদের যতখানি প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদের সপক্ষে যুক্তি বিচারের আলোচনা প্রকাশে যে-বলিষ্ঠতার পরিচয় তা সেখানে ততদূর ঋদ্ধ নয়। কিন্তু সে-ভূমিকা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছে 'প্রগতি'। 'প্রগতি'র "মাসিকী"তে প্রতিসংখ্যায় তরুণদের সপক্ষে প্রায় এক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন বুদ্ধদেব। ভাদ্র ১৩৩৪-এর মাসিকীতে মন্তব্য করা হলো যে সাহিত্যে দেখা যাচ্ছে কিছু ভুঁইফোড় সাহিত্যিক। এঁদের সবচেয়ে দুর্বলতা এই যে তাঁরা লেখাটাকে নিন্দা করতে গিয়ে লেখকদের নিন্দা করে ফেলেন। সেই সঙ্গে করেন ব্যক্তিগত কুৎসা। অসংযমকে নিন্দা করতে গিয়ে ভব্যভাষার গণ্ডী এড়িয়ে যাওয়াটা বোধহয় খুব আত্মসংযমের পরিচায়ক নয়। কিছুদিন আগে বাংলার এক কবি ছদ্মনামে বাংলাদেশের তরুণ লেখকদের জন্য স্বচিকাভরণ প্রেসক্রাইব করেছেন। এতদিন বাংলা সাহিত্য 'Sanitary Inspector'এর প্রকোপেই অস্থির হয়েছিল, হালে একজন 'medical officer' জুটলেন। এঁরা সকলে মিলে আবিষ্কার করেছেন যে, আধুনিক সাহিত্য কঠিন রোগগ্রস্ত, এবং সে রোগ আবার দেশজ নয়—ফ্রান্স কি নরোয়ে, ইতালি কি র‍্যাশা, ঐ রকম কোনো এক দেশ থেকে জাহাজে চ'ড়ে নাটক-নভেলের পৃষ্ঠার মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থান করে সে রোগের বীজ বাঙলা দেশের মনোজগৎকে বিষবাষ্পে দূষিত করে তুলছে। বিদ্বেষ-প্রসূত নগ্ন অভদ্রতা যে কত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে, 'স্বচিকাভরণে' তা পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। ও কবিতা পড়লে মনে হয় যে বাঙলায় Post-war সাহিত্য যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে, তারা প্রত্যেকেই ডন জুয়ান-এর এক একটি বাঙালী সংস্করণ। প্রত্যেকেই 'রতি-বিষে-অজ্ঞান' হয়ে নিজ নিজ ভাবে 'কামায়ণ' রচনা করছেন।

ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বনামধন্যা, বাংলার জনসাধারণের পরম শ্রদ্ধাস্পদা একটি মহিলা মজঃফরপুর সাহিত্য সম্মিলনে এ-কথা ভেবে অবাক হয়েছিলেন যে আধুনিক

কালের সাহিত্য-রচয়িতাদের আঁতুড়-ঘরে থাকতেই লবণ-সংযোগে হত্যা করা হয়নি কেন। কিন্তু এ-আলোচনার কোনো যুক্তিতর্ক নেই। 'যুবনাশ্ব' ভূমিষ্ঠ হয়েই "পটলডাঙ্গার পাঁচালী"র ছড়া বাঁধতে শুরু করেননি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দু'দিন বয়সেই "গাবো আজ আনন্দের গান" লেখেননি। তখন তাঁরা বাংলা দেশের অন্যান্য শিশুরই মতো নিরীহদর্শন ছিলেন। এঁরাই যে বড়ো হয়ে কুৎসিত-সাহিত্য-স্রষ্টাদের অন্যতম হবেন এ খবর কোনো ভবিষ্যদ্বক্তা তখন তাঁদের মাতা-পিতাদের জ্ঞাপন করেননি।

'প্রগতি'র মাসিকীতে "রজনী হল উতলা"র প্রসঙ্গও আছে। 'প্রগতি'র মতে যাঁরা ঐ গল্পকে এবং গল্পের লেখককে তিরস্কার করছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন ঐরূপ বিশ্রী একটা ঘটনা একটা ব্যারিস্টারের পরিবারকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল বলে, আবার কারো কারো চোখে আঠারো বছরের ছেলের সঙ্গে ষোলো বছরের মেয়ের শৃঙ্গার-সম্ভোগ অত্যন্ত বিসদৃশ ও দৃষ্টিকটু। এর থেকে মনে হয় যে ঘটনাটা কোনো সাধারণ পরিবারে ঘটলে এবং পাত্রের বয়েস কিছুটা বাড়িয়ে দিলে হয়তো তেমন আপত্তি উঠত না। কিন্তু তাতে মূল গল্পের খুব একটা পরিবর্তন হতো না। ফলে গল্পটি সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে ভালো কি মন্দ সে-কথা কেউ ভেবে দেখেনি, হয়তো গল্পের কোনো বিশেষ ঘটনা বা পারিপার্শ্বিক তাদের খারাপ লেগেছে। কিন্তু তারই জন্য তাঁদের অন্তরের রোষ ও বিষ বর্ষিত হয়েছে লেখকের ওপর। এ-সব আলোচনা সাধারণের চক্ষে এলে সমজদার বলে চলা হয়তো সহজ কিন্তু কোনো প্রকৃত সাহিত্য-শিল্পীকেই বোধহয় এসব কুৎসিত পঙ্ক-নিক্ষেপ স্পর্শ করতে পারে না।

'প্রগতি'র অগ্রহায়ণ (১৩৩৪) সংখ্যায় নিজেদের প্রতিষ্ঠার স্বরূপকে চিহ্নিত করেছেন বুদ্ধদেব। কোথায় স্বাতন্ত্র্য তাঁদের, কোথায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা। রবীন্দ্রনাথের পর থেকে একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগ যে বাঙলা সাহিত্য-জগতে এসে গিয়েছে, এবিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সাধারণ লোকের কাছে এঁরা অতি আধুনিক বলে পরিচিত। হয়তো এঁরা এঁদের উপযুক্ত কালের পূর্বে জন্মেছেন। এঁদের রচনার বিষয়বস্তু, জীবনের অভিজ্ঞতা, আশা ও বেদনা পূর্বতন সাহিত্যিকদের চাইতে একেবারে আলাদা—তাই তাঁদের হাতে পড়ে ভাষাও একটুখানি বেঁকে চুরে তেরছা চলতে শুরু করবে, তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই। ভাষাটাকে তাঁরা নিজেদের কাজের উপযোগী করে তুলেছেন মাত্র। তাঁদের ভাষা হয়তো রবীন্দ্রনাথ বা আনাতোল ফ্রাঁসের সমপন্থী নয়, কিন্তু সমপন্থী না হলেও

সমকক্ষ হতে পারলে দোষ কি? কার্তিকের মাসিকীতে লেখা হলো—'শনিবারের চিঠি' 'কল্লোল' 'কালিকলম'কে প্রাণ খুলে গালাগাল দিতেই থাকবেন, কারণ ঐ দুই পত্রিকাতে প্রকাশিত গল্প ও কবিতায় স্ত্রী-পুরুষের দেহের কামনা মাঝে-মাঝে উঁকি মারে। রচনাগুলি সাহিত্য সৃষ্টিরূপে কেমন হয়েছে, সে বিষয়ে শ্রীসজনীকান্ত দাস বা রবীন্দ্রনাথ কেউই কিছু বলেননি; একজন আবেদন করেছেন আধুনিক অশ্লীলতার বন্যাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য, অপরজন—যদিও 'আধুনিক সাহিত্য' তাঁর 'চোখে পড়ে না', তবুও তাতে 'হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে' বলে মত দিয়েছেন। আব্রু ঘুচে যাওয়ার বিরুদ্ধে কী 'সাহিত্যিক' কারণ আছে, তা রবীন্দ্রনাথ জানালেও পারতেন। সে কি এই যে, ভদ্রশ্রেণী—উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হওয়া এতকাল যাঁদের একচেটে সৌভাগ্য ছিল,—ও নিম্নস্তরের লোকের মধ্যে সাহিত্যের দিক দিয়ে যে-ব্যবধান এতকাল ছিল, তা হঠাৎ খসে গেছে; না এই যে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যেসব জিনিস ইঙ্গিতমাত্র করেছেন, আধুনিকরা সেইটেই একটু স্পষ্ট ক'রে বলেছেন? গোগলের আমলে রুশীয় নাটক-নভেলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ভিন্ন কোনো লোক স্থান পেত না,—সেই ব্যবধান লঙ্ঘন করে চেহহব, গর্কী নিশ্চয়ই মহাপাতক করেছেন। 'যুবনাশ্বে'র গল্প যে ভালো নয়, তার একমাত্র কারণ কি এই যে, তাঁর চরিত্রগুলি পুরোনো আমলের জমিদার বা বালীগঞ্জ-নিবাসী-ব্যারিষ্টার নয়?

'প্রগতি'র প্রথম সংখ্যায় "ভোর হলো যেই শ্রাবণ-শর্বরী" নামে গল্পে গণিকা ভবনের হুবহু রূপ ছাপা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের এক ইংরেজি সাপ্তাহিক কাগজ তাই ক্ষুব্ধ। যেন ঐ বর্ণনার কারণেই গল্পটি অপাঠ্য। পরিবর্তে একটা দেবমন্দিরের বর্ণনা ঠিক একইভাবে ও ভঙ্গিতে লিখলে বোধহয় গল্পটি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারত। পুরুষ যে নারীর দেহকে কামনা করে, এই কথাটা একটু খোলাখুলি ভাবে উল্লেখ ছিল বলে "বন্দীর বন্দনা" কবিতাকে সাহিত্যের পুলিশম্যানরা ধরে নিয়ে একেবারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে বিচারের জন্য উপস্থিত করলেন। কবিতার ভাব যাই হোক-না-কেন—যাতে 'রমণী-রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি'—এ-কথা থাকতে পারে, সে কবিতা ভালো হতে পারে না। বেশ্যাবাড়ি নিয়েও যে ভালো গল্প লেখা যায়, অতি পরম সতীসাধ্বী স্ত্রীর কথা নিয়েও যে খারাপ গল্প লেখা যায়, এ-কথা বিশ্বাস করতে অনেকেই অপারগ হবেন। মোপাসাঁর Boul de Suif বারনারী, ফ্রাঁসের Thais সাধারণ বাঈজীমাত্র, Paphnutius এর মনের চিন্তারাজি, আর যাই হোক ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উপযুক্ত নয়,—বুদ্ধদেবের ভাষায় 'কিন্তু

এ-সব নজীর দেখিয়েই বা কি হবে? যে জেগেও ঘুমিয়ে থাকে, তাকে জাগানো যে সত্যি অসম্ভব। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় দীর্ঘ সাহিত্য সেবার মধ্যে একটিও 'অশ্লীল' লাইন লেখেন নি; তাঁর সব নারীই সতী, সব পুরুষই চরিত্রবান; তাই এঁদের মতানুসারে তিনিই বোধহয় বাঙলার শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র তাঁদের বিনোদিনী-বিমলা-কিরণময়ী-সাবিত্রীর দল নিয়ে চির নির্বাসন লাভ করুক।'

'বিচিত্রাসভা'

বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-আলোচনা সভার প্রথম অধিবেশনের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বিবরণ "সাহিত্যরূপ" নামে 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৩৫-এ (পৃ ১২২-১২৯) প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের অনেক বিবাদেরই কারণ আমরা পরস্পরকে স্পষ্ট বুঝি না, তাই প্রতিপক্ষের মনে ব্যক্তিগত বিরুদ্ধতা আমরা কল্পনা করে নিই, তাতে মতান্তরের সঙ্গে মনান্তর মিশে যায়। কিন্তু মূল বিষয়ে আমাদের মিল আছে, যে জিনিসটা নিয়ে তর্ক করছি সেটা আমাদের দুই পক্ষেরই দরদের জিনিষ, সেটা বাঙলা সাহিত্য।

প্রসঙ্গের 'গোড়াপত্তন' করার জন্য বাংলাসাহিত্যের আরম্ভের সূত্রপাতের প্রসঙ্গ আলোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক বাংলাসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। 'তিনিই প্রথম ভাঙনের, এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে।...একথা সত্য, বাংলা সাহিত্য মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না।...তিনি ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না...'। বঙ্কিমচন্দ্র গল্প-সাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। পূর্বেকার গল্প-সাহিত্য ছিল মুখোশ পরা, তিনি সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের একটি সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কথাসাহিত্যের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সত্য, যেমন মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন হোমার, ভার্জিল আর মিলটনের কাছ থেকে। একদিকে এর মধ্যে আছে অনুকরণ অন্যদিকে আত্মীকরণ। কিন্তু দুয়ে মিলে সাহিত্যে এক নবরূপের আবির্ভাব ঘটল।

খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন, তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা সৃষ্টি করবার তাগিদ কাজ করে। সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্ন রকম। তার মধ্যে যদি পানওয়ালি বা খনিক আপনি এসে পড়ে তো ভালো, কিন্তু সেটা যেন যুগধর্মের কায়দার অন্তর্ভুক্ত না হয়।

'কোনো-একটা উদ্ভট রকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গি বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি একথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয়নি সেইজন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হোলো সেও

অসংগত। পাগলামির মতো অপূর্ব আর কিছুই নেই—কিন্তু তাকেও ওরিজিন্যা-লিটি ব'লে গ্রহণ করতে পারিনে। সেটা নূতন, কিন্তু কখনোই চিরন্তন নয়—যা চিরন্তন নয় তাকে সাহিত্যের জিনিস বলা যায় না।'

সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম আছে, এইজন্য মাঝে মাঝে সে-সাহিত্যে অবসাদ ক্লান্তি রোগ মূর্ছা আক্ষেপ দেখা দেয়—তার মধ্যে যদি প্রাণের জোর থাকে তবে এ-সমস্তই সে আবার কাটিয়ে যায়। কিন্তু দূর থেকে তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার করে নেওয়া হয়। 'মনে করি তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই লক্ষণগুলো বলবান ও স্থায়ী যেহেতু এটা আধুনিক।' সাহিত্যে যখন বিষয়টা প্রবল হয়ে দেখা দেয় তখন তারই মধ্যে যেন অপ্রকৃতিস্থতা প্রকাশ পায়। এখন সাহিত্যে রূপের মূল্যটা যেন গৌণ হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ মন্তব্য—'বিষয়ের দল বর্তমানের গরজের দাবি ক্রমে ত্যাগ করবে এবং সাহিত্যে রূপের স্বরাজ আবার ফিরে আসবে। মার্শাল্ ল যেখানে কোনো কারণে চিরকালের হয়ে ওঠে সেখান থেকে গৃহস্থকে দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা করাই কর্তব্য। বিষয়প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয় তা হলে বল্‌তেই হবে এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।'

'প্রবাসী' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫-এ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা (পৃ ২২২-২২৭) প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৩৪, ৭ চৈত্র, মঙ্গলবার, বিশ্বভারতী সম্মিলনের সাহিত্য-সমালোচনা অধিবেশনের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বিবরণ এই রচনা। প্রথমেই জানানো হয়েছে যে ৪ চৈত্র আলোচনার যে বিবরণ ৬ চৈত্র, সোমবার 'বাংলার কথা'য় প্রকাশিত হয়েছে তা যথাযথ নয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই জানিয়েছেন যে আলোচনা এমন নয় যে একপক্ষে তিনি আর আধুনিক সাহিত্য অন্য পক্ষ। অনেক তরুণ সাহিত্যিক তাঁকে এ-প্রশ্ন করেছেন যে কেন তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছেন? রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট জানিয়েছেন যে কোন ব্যক্তি বিশেষকে উপলক্ষ করে তিনি লেখেন নি—'কতকগুলি লেখা আমার চোখে পড়েছিল যেগুলিকে সাহিত্যধর্ম বিগর্হিত মনে হয়েছিল' অবশ্য সমাজধর্ম রক্ষার ব্রত যাঁরা নিয়েছেন তিনি সে-দলের নন। তাঁর বিচার্য হল মানুষ যে সকল মনের সৃষ্টিকে চিরন্তন মূল্য দিয়ে চিরকালের হিসেবে চিহ্নিত করে তারই কথা।

যে সমস্ত লেখা সমাজে তিরস্কৃত হতে পারত যখন দেখা যায় তাও সম্ভব হয়েছে তখন বুঝতে হবে বাতাসে কিছু ঘোরতর বিষ সঞ্চারিত হয়েছে। হয়তো

এই বেদনা থেকেই তিনি কিছু বলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'বেদনা কিছু ছিল দেশের দিকে, কালের দিকে, সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে। যদি কেউ মনে করেন এই বেদনা প্রকাশের অধিকার আমাদের নাই; অসংযতভাবে তাঁরা যা বলেন সেটা এখনকার Democratic সাহিত্যে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, তা হলে বলতে হবে তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই।'

এরপর রবীন্দ্রনাথ জানালেন যে আজকের এই সভায় প্রত্যেকে স্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করল। সেই প্রশ্নোত্তরের কিছু কিছু অংশ নিচে উদ্ধার করছি—

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়—সামাজিক প্রাণী হিসেবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে ভাঙবার কতটা অধিকার আছে আপনি বিচার করবেন।

রবীন্দ্রনাথ—সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যেমন একসময় আমাদের একান্নবর্তী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠ ছিল, অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি শিথিল হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থার যখন পরিবর্তন হয়, সে-পরিবর্তন যে কারণেই হোক, (ধর্মনৈতিক কারণেই যে সব সময় হয় তা নয়, অধিকাংশস্থলে অর্থনৈতিক কারণেও হয়।) তখন একটি কথা ভাববার আছে। তৎকালীন যে-সমস্ত ব্যবস্থা প্রবল ছিল, যার প্রয়োজন ছিল, তখন সেগুলোকে রক্ষা করবার জন্য কতকগুলো বিধি-নিষেধ পাকা করে দেওয়া হয়। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রয়োজন চলে যায় অথচ নিয়ম শিথিল হতে চায় না। সমাজ অন্ধভাবেই আপন নিয়ম আঁকড়ে থাকে। সে বলে, যে কারণেই হোক, একটাও নিয়ম আল্‌গা হলেই সব নিয়মের জোর চলে যায়। সকল মানুষই সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধি খাটাবার অধিকার দাবী করলে সমাজ টিকতে পারে না। সমাজের পক্ষে এই কথা। সাহিত্য সমাজের এই সতর্কতাকে সম্মান করে না। সর্বকালের নীতির দিকে তাকিয়ে সাহিত্য অনেকসময় তাকে বিদ্রূপ করে, তার বিরুদ্ধবাক্য বলে। অবশ্য সমাজের এমনও অনেক বিধি আছে যার আয় অল্প নয়। রীতির চেয়ে নীতির উপরে যার ভিত্তি। যেমন আমাদের হিন্দু সমাজে গো-হত্যা পাপ বলে গণ্য অথচ সেই উপলক্ষ্যে মানুষ-হত্যা ততদূর পাপ বলে মনে করি না। মুসলমানের অন্ন খেয়েছে বলে শাস্তি দিই, মুসলমানের সর্বনাশ করেছে বলে শাস্তি দিইনে। সমাজ ব্যবস্থার জন্য বাঁধাবাঁধি যে নিয়ম হয়েছে সাহিত্য যদি তাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করে সাহিত্যকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু যে সমস্ত নীতি মানুষের চরিত্রের মর্মগত সত্য, যেমন লোককে প্রতারণা করব না ইত্যাদি, সেগুলির ব্যতিক্রম কোনোকালে হতে পারে বলে মনে করি না।

প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়ের তরুণদের সাহিত্যে ভগবান, প্রেম ইত্যাদি না-মানার প্রবণতার প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানালেন যে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে ঐশ্বর্যই হচ্ছে প্রেম, কামনা নয়। কামনায় উদ্‌বৃত্ত কিছু থাকে না। উদ্‌বৃত্তটাই নানা রূপে প্রেমে বর্ণে প্রকাশ পায়। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পঙ্কিলতা প্রকাশ পায়। বস্তুত স্রোত ক্ষীণ হয়ে পাঁক বড়ো হলেই বিপদ।

সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ নিয়ে প্রশ্ন করলে রবীন্দ্রনাথ জানালেন যে সমালোচনা শুধু অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তিনি তাকে ঠিক মনে করেন না। সেই সব সমালোচনার ভিতর নিষ্ঠুরতা রয়েছে। সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিক ভাবেই হওয়া উচিত অর্থাৎ রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকেই দেখতে হবে। তাঁর কথায়, 'সুবিচার করবার ইচ্ছাটা দণ্ডবিধান করবার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল থাকা উচিত।' সজনীকান্ত দাস প্রশ্ন করেন যে এই আলোচনা কি 'শনিবারের চিঠি' নিয়েই। রবীন্দ্রনাথ জানান 'হাঁ'। এরপর 'শনিবারের চিঠি'র আদর্শ, 'মণিমুক্তা,' আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক ও সামাজিক doctrine ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এ আলোচনায় ছিলেন—নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অপূর্বকুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। 'শনিবারে'র চিঠির "মণিমুক্ত" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, যা মনকে বিকৃত করে সেগুলিকে সংগ্রহ করে সকলের কাছে প্রকাশ করলে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়।

এরপর আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মন্তব্য জানান। যে জিনিস বরাবর সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলা হয়, তাকেই এক শ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিক চরম বর্ণনীয় বিষয় বলে দেখান। অনেকে এটাকে স্পর্দ্ধার বিষয় মনে করে, অনেকে আবার একে প্রতিক্রিয়ার ফল বলছেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়া তো প্রকৃতিস্থতা নয়। তা ক্ষণস্থায়ী, চিরন্তন নয়। ঈশ্বরকে, ভালবাসাকে না মানার মধ্যে কোনো সাহিত্যিকতা নেই।

রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'র বিষয়ে বলেন যে তারা যদি সাহিত্যের সীমার মধ্যে থেকে বিশুদ্ধভাবে আলোচনার পথে অগ্রসর হয় তবে বেশি ফল লাভ করতে পারবে। আর যদি একান্ত দোষ নির্ণয়ের দিকে সমস্ত মননিবেশ করে তাতে শক্তির অপচয় ঘটবে।

রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনা-

নৈপুণ্যের প্রশংসা করেন, কিন্তু তারই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন তাঁদের দায়িত্বের কথা। তাঁর ভাষায়, 'তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করবার উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্যের প্রমাণ হবে'। রবীন্দ্রনাথ উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে অস্ত্র-চিকিৎসায় অস্ত্র-চালনার সতর্কতা অত্যন্ত বেশি দরকার, কারণ আরোগ্য বিধানই এর লক্ষ্য, মেরে ফেলা নয়।

সবশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে কেউ কিছু লিখতে পারে না। আধুনিক সাহিত্যে যে দারিদ্র্যের অনুভূতি প্রকাশ বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে তা সাহিত্যের পক্ষে গৌণ। এই ভঙ্গিমা বিস্তারের প্রশ্রয় সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এছাড়া তিনি বলেন যে দল বেঁধে সাহিত্য হয় না। 'সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি যা মানুষ একলাই করেছে'। শেষে মন্তব্য করেন, 'তোমাদের অনেক লেখকের মধ্যে আমি প্রতিভার লক্ষণ দেখেছি। আমি কামনা করি, তাঁরা যুগ-প্রবর্ত্তনের লোভে পড়ে তাঁদের লেখার সর্ব্বাঙ্গে কোনো দলের ছাপের উল্‌কি পরিয়ে তাকে সজ্জিত করা হ'ল বলে না মনে করেন। তাঁদের শক্তির বিশুদ্ধ স্বকীয় রূপটি জগতে জয়ী হোক'। (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ ২২৭)

'কল্লোল' বৈশাখ ১৩৩৫-এ "ডাকঘর" পর্যায়ে 'বিচিত্রাসভা'র বিবরণ প্রকাশিত হয় (পৃ ৮১-৮২)। বিবরণে বলা হয় যে ঐ দুটি আলোচনা সভার প্রথম দিনের বিষয় ছিল 'বর্তমান সাহিত্যের প্রবর্তনা' ও দ্বিতীয় দিনের বিষয় ছিল 'সাহিত্য সমালোচনা।' এই সভার প্রথম দিন মাইকেল মধুসূদনের কথা অবতারণা করে কবি বলেন, মধুসূদনের মনের সামনে কাব্যের একটা রূপ ছিল, সেই রূপকে সার্থক করবার জন্য তিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিভায় বাঙালা ভাষাকে নিজের মতো করে গড়েছিলেন। তিনি এজন্য বাঙলায় কি কথা চল্‌তি তার দিকে দৃষ্টিপাত করেননি; পৌরাণিক যুগের শৌর্য বীর্য মহিমার যে দৃশ্য মনশ্চক্ষে দেখেছিলেন তাকে কাব্যে ব্যক্ত করছি তার সাধনা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ পরে বলেন, নব যুগ বলে সাহিত্যে কিছু আছে তা তিনি বিশ্বাস করেন না। সাহিত্যের মহারথীরা পুরাতনকে মুছে ফেলেও আসেন না। বঙ্কিম-চন্দ্র পশ্চিম থেকে ধারাবাহিক গল্পের এক নতুন রূপ পেয়েছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় সেই সকল গল্পের রূপকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন, অনুকরণ তিনি করেননি। পশ্চিম থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন মাত্র। 'সাহিত্যের সত্যকারের কোনও সিংহাসন নাই যে, একজনকে না সরাইলে আর একজন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না।—অনুকরণ মাত্রই যে দোষের তাহা নয়। অনুকরণের ভিতর

দিয়া সত্যকার সাহিত্যিক তাঁহার নিজের বিশিষ্টতা খুঁজিয়া পান। সাহিত্যের বিষয়-বস্তু কি, তাহার উপর সাহিত্যের মূল্য নির্ভর করে না। লেখক নিজের রূপকে পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন কিনা এবং তাহা সত্যকার সাহিত্য হইয়াছে কিনা তাহাই বিচার্য্য। সাহিত্য বিষয়বস্তু হইতে অপরূপ কৌশলে রস সৃষ্টি করে। সেই রসসৃষ্টি যেখানে না হয় সেখানে বিষয়ের কোন পৃথক মূল্য নাই।'

আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচনার নামে যে জঘন্যভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং অত্যন্ত নীচতার সঙ্গে কারো পারিবারিক কুৎসা প্রচার হয় সেজন্য রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করেন।

'আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর নিমন্ত্রিত সাহিত্যিকদিগকে, বিশেষ করিয়া নবীন লেখকদিগকে তিনি বলেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের কোনও পার্থক্য নাই, এবং তিনি এটি জানিতেন বলিয়াই তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।' গালাগাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে তিনি নিজেও অনেক সহ্য করেছেন। একে ভয় করলে চলবে না।

দ্বিতীয় দিনের সভার বিষয় ছিল 'সাহিত্য সমালোচনা'। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বলেন, মানুষের মধ্যে যা চিরন্তন শ্রদ্ধার অধিকারী সেই মহামূল্য মনুষ্যত্বের পরিচয়ই আমরা পাই সাহিত্যে। 'যে ক্ষুধা বা যে প্রবৃত্তি মানুষের ক্ষুদ্র, যাহা ভোগ করিলে আর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না তাহা লইয়া শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনা সার্থক হয় নাই। মানুষের যে সব ক্ষুধা যে সকল কামনা পূর্ণ হইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, সেই উদ্বৃত্ত ঐশ্বর্য্যই কাব্যে, শিল্পে, বর্ণে, বাক্যে, ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করে।'

'যাহাকে আধুনিক সাহিত্য বলা হয় তাহার সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি কখন কিছু বলেন নাই। শুধু দুই একটি অস্পষ্ট লেখার গতি দেখিয়া সাহিত্যের বিপদ সম্বন্ধে ভীত হইয়া তিনি নিজের কথা লিখিয়াছেন। তাহাতে কাহাকেও তিনি নিন্দা করিতে চাহেন নাই।'

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ নবীন লেখকদের ডেকে বলেন যে তারা যেন রাগ না করে। তাঁকেও চিরকালই আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। 'তোমাদের শক্তি আছে তোমরা নিজের শক্তির পরিচয় দিয়ে নিজের পথ কেটে যাবে, সত্যকার সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তোমরা নিজেদের সত্যকার মর্য্যাদা দিও।'

('কল্লোল' : বৈশাখ ১৩৩৫, পৃ ৮২)

চৈত্রের 'শনিবারের চিঠি'তে (১৩৩৪) "আলোচনা" নাম দিয়ে হিরণকুমার সান্যালের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। 'বিচিত্রসভা'র ব্যঙ্গাত্মক বিবরণ আছে সেখানে।

হিরণ সান্যাল ব্যঙ্গশৈলীতে লিখেছেন যে স্বয়ং কবি সম্রাট এক বৃহৎ কাঁচাপাকা সম্মিলন ডেকে 'শনিবারের চিঠি'র সকলকে নাকি তরুণদের সামনে আচ্ছা করে 'কড়কাইয়া দিয়াছেন'। তাতে লজ্জিত হওয়া দূরের কথা 'শনিবারের চিঠি'র সকলে গালিগালাজ করে তরুণদের উপরে জাত আক্রোশ মেটাবার চেষ্টা করেছেন 'চকিত-ভীত-নিরীহ সাহিত্য গড়ের মাঠের তৃণ-রোমন্থনপুষ্ট শিশুগুলির মৃদু আর্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া উপর্যুপরি তাহাদের উপর বাক্যবাণ তাহাদেরই তূণ হইতে চুরি করিয়া নির্দয়ভাবে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ? তখন কবি নাকি স্বয়ং তাহাদের গায়ে অতি কোমলভাবে সস্নেহে হাত বুলাইয়া কানে কানে বলিয়াছিলেন, ওদের ঐ রকম অব্যেস, তোমাদের সব হাতিয়ার এবার থেকে তোমাদের হাতেই রেখো।'

বিতর্ক বিচার

সজনীকান্ত দাস 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন যে এই ব্যাপক সাহিত্য বিক্ষোভের অন্যতম নেপথ্য নায়ক তিনি। যদিও 'কল্লোল যুগে' অচিন্ত্যকুমার জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের "অতি-আধুনিক সাহিত্য"-এর বিষয়ে আর্জি 'সরাসরি খারিজ' করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সজনীকান্তের মতে তার আবেদনের দুই তিন মাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "সাহিত্যধর্ম"। সজনীকান্তের ভাষায়, 'সত্য কথা এই যে, আমার আবেদনের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্যধর্ম" প্রবন্ধ ঠিক আণবিক বোমার মত নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ১৩৩৪ সালের ১লা শ্রাবণ 'বিচিত্রা'য়। বোমা নিক্ষেপ করিয়া তিনি মালয় ভ্রমণে চলিয়া যান, ফিরিয়া আসেন কার্তিকের মাঝামাঝি। তাঁহার আরও মারাত্মক বোমা "সাহিত্যে নবত্ব" ১৯২৭ সনের ২৩শে আগস্ট 'প্লানসিউস' জাহাজে নির্মিত হইয়া অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ 'প্রবাসী'র "যাত্রীর ডায়ারি" শিরোনামায় নিক্ষিপ্ত হয়' ('আত্মস্মৃতি': পৃ ১৯১)।

২৩ পৌষ ১৩৩৪-এ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র প্রকাশিত হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৩৪-এর মাঘ সংখ্যায়। সে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে 'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার অসামান্যতা অনুভব করেছেন তিনি, এবং সেই ক্ষমতা আর্টের পদবীতে গিয়ে পৌঁছেছে। শেষে লিখেছিলেন যে 'শনিবারের চিঠি'র অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান।

এই বিতর্কে 'শনিবারের চিঠি'র সমর্থনের একাধিক সাক্ষ্য প্রমাণ সজনীকান্ত উপস্থিত করেছেন তাঁর গ্রন্থে। ২৮ কার্তিক ১৩৩৪-এ লেখা এক চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তোমার বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে বড় বড় মহামহো-পাধ্যায়দের পণ্ড পাণ্ডিত্যের বর্মচ্ছেদন যখন করো তখন তার মধ্যে একটা মহাকাব্যিক মহিমা দেখতে পাই'।

৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪-এর এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তোমার হ'ল সার্জিকাল ডিপার্টমেণ্ট আর আমার আরোগ্য স্নানের মহল'।

'বিচিত্রাসভায়'ও কবি জানিয়েছিলেন যে—'শনিবারের চিঠির লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনা-নৈপুণ্যেরও আমি প্রশংসা করি' বলেছিলেন তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করবার উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্যের প্রমাণ হবে। সাহিত্য সংস্কার-এর কাজ যদিও অপ্রিয় তবু সেই ক্ষেত্রের সীমা তাঁদের রক্ষা করতে হবে। 'সাহিত্যের চিকিৎসাই 'শনিবারের চিঠি'র লক্ষ্য, এই কারণেই এই লক্ষ্যের একটু মাত্র বাইরে গেলেও তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে। চিকিৎসকের পক্ষে অস্ত্রচালনার কৌশলই একমাত্র জিনিস নয়, প্রতিপত্তিও মহামূল্য। সেই প্রতিপত্তি রক্ষা ক'রে 'শনিবারের চিঠি' যদি কর্তব্যের খাতিরে নিষ্ঠুরও হন তাঁকে কেউ নিন্দা করতে পারবে না'। ("সাহিত্য-সমালোচনা", 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)

আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জানান, যে জিনিস বরাবরই সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় বলে দেখান এক শ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের বিশেষ লক্ষ্য। এইটেকে অনেকে স্পর্দ্ধা মনে করেন। কেউ বলেন প্রতিক্রিয়া কিন্তু প্রতিক্রিয়া তো প্রকৃতিস্থতা নয়। কেবলমাত্র না-সাজার দ্বারাও সাহিত্যিক হওয়া যায় না। আধুনিকরা 'গরীবিয়ানা'কে সাহিত্যের অলংকার করে তুলছে। আধুনিকদের পক্ষে একেবারে শেষে কবির মন্তব্য যে অনেকের মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ তিনি দেখেছেন। তাঁরা যেন যুগপ্রবর্তনের লোভে পড়ে তাঁদের লেখার সর্বাঙ্গে কোন দলের ছাপের উল্কি পরিয়ে তাকে সজ্জিত না করেন। এ-সব মতামতই 'বিচিত্রাসভা'র দ্বিতীয় দিনের কবির মন্তব্যের বিবরণ। এর আগে প্লানসিউজ জাহাজ থেকে লিখিত ২৩ শে আগস্ট ১৯২৭ "যাত্রীর ডায়ারি"তে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে স্পষ্ট মতামত দিয়েছেন তিনি। বলেছেন বিলিতী পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডার বাঁধা নিয়মে তৈরি করে রাখে, যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে—লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে—অপটু লেখকদের পাঠশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডার'। এর সঙ্গে রয়েছে লালসার অসংযম।

নবীন লেখকের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় নেই একথা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছেন মোহিতলালের। তার কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অকৃত্রিম বল্‌চি এইজন্তে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তাড়া-

মারা পালোয়ানি নেই'। আর প্রশংসা করেছেন শৈলজানন্দের গল্পের কারণ তাঁর আছে দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি। তাঁর রচনায় দারিদ্র্য-ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। 'দরিদ্রনারায়ণের পূজারির মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেচি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেচেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি।'

কেউ কেউ মন্তব্য করছেন তরুণ লেখকদের নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেছে বলেই আজ অসংযমের সাহিত্য তৈরি হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এ-মতে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে এরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া মত গ্রহণ করেছে। এতে দুঃসাহসিক বলে বাহবা পাওয়া যায়। তরুণের পক্ষে তা প্রলোভনের। তারা বলতে চাইছে কিছু না-মানাটাই তরুণের ধর্ম। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু না-মানতে শক্তির দরকার হয়। সেই শক্তির অহঙ্কার তরুণের পক্ষে স্বাভাবিক। হয়তো সেই অহঙ্কারের আবেগে তারা ভুল করে। 'সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণের স্পর্দ্ধাকে আমি শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু সেখানে না মানাই হচ্ছে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহঙ্কার তরুণের পক্ষেই সব চেয়ে অযোগ্য।' তারা যদি ভাষাকে 'মানিনে' বলতে পারে তবে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে, তাহলে উপস্থিত মতো কাজ চালান যায় 'কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা'।

'বিচিত্রাসভা'র যে বিবরণ 'প্রগতি' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল সেখানে তরুণদের পক্ষে এবং আধুনিকতার স্বপক্ষে উত্তর দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সে-সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন রেখেছিলেন আধুনিকদের কাছে, 'তোমরা যারা বলছ যে সাহিত্যে একটা নবযুগ এসেছে, তোমাদের এই নবত্ব কোন্ বিশেষ রূপটি ধারণ করেছে, বল্‌তে পারো? কোথায় তোমাদের সেই নব-প্রতিমা? কেমন তাঁর অলঙ্কার? কোথায় তার রূপের বৈশিষ্ট্য?'

'প্রগতি' জানিয়েছে যে এর সন্তোষজনক উত্তর হয়তো অতি-আধুনিকেরা দিতে পারেন নি। শিল্পীর মনের যে অংশ সাধারণ দৃষ্টির বহির্ভূত, সেই গোপন অন্ধকারে শিল্পের একটি অপরূপ ও নিজস্ব প্রতিমাকে সস্নেহ অন্তরঙ্গতায় তারা নিশ্চয়ই রচনা করে, কিন্তু সমালোচক যখন সেই প্রতিমা দর্শনের দাবি করেন, তখন তাঁরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

অতি-আধুনিক বলে যাঁরা অভিহিত তাঁদের একমাত্র শৈলজানন্দ ছাড়া আর

কারুরই রচনা পুস্তকাকারে বের হয়নি। ফলত এদের লেখায় যে বিশেষ রূপটি ধরবার চেষ্টা চলছে তা সাধারণের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না।

এই সভার বিবরণ দিতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু 'সেই দুটি লেখা যে সেই দুটি সভার যথাযথ বিবরণ না তা নিঃসংশয়ে বলা যায়' কারণ 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে রাধারাণী দত্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যে প্রতিবাদ করেন তার উল্লেখ নেই সে লেখায়। নেই প্রমথ চৌধুরী, অপূর্বচন্দ্র বা প্রশান্ত মহলানবীশের কথা। প্রগতির বক্তব্য, 'কোথাকার শ্রীসজনী দাস—তিনি কি বলেছিলেন, সযত্নে প্রকাশ করাতে কোন কুণ্ঠা বোধ হল না? মোট কথা ঐ দুটি প্রবন্ধ দুই সভার যথাযথ বিবরণ নয়।'

'প্রগতির' "মাসিকী"তে যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সংখ্যায় সেখানেই তরুণ সাহিত্যিকরা নিজেদের প্রতিরোধ আর অবস্থানের কথা স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কতদূর গ্রাহ্য সে-কথাও কুণ্ঠাহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁরা। সজনীকান্তের অভিযোগ আর রবীন্দ্রনাথের চিঠি নিয়ে প্রগতির মাসিকীতে মন্তব্য লিখেছিলেন বুদ্ধদেব। 'শনিবারের চিঠি' 'কল্লোল' 'কালিকলম'কে প্রাণখুলে গালাগাল দিতে থাকবেন। কারণ ঐ দুটি পত্রিকাতে প্রকাশিত গল্প ও কবিতায় স্ত্রী-পুরুষের দেহের কামনা উঁকি মারে। রচনাগুলি সাহিত্যসৃষ্টি রূপে কেমন হয়েছে সে বিষয়ে সজনীকান্ত দাস বা রবীন্দ্রনাথ কিছুই বলেননি। একজন আবেদন করেছেন আধুনিক অশ্লীলতার বন্যাকে ঠেকিয়ে রাখতে। অপরজন যদিও আধুনিক সাহিত্য তাঁর চোখে পড়ে না তবু তাতে 'হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে' বলে মত দিয়েছেন। সে কি এই যে, ভদ্রশ্রেণী—উপন্যাসের নায়ক নায়িকা হওয়া এত কাল যাঁদের একচেটে সৌভাগ্য ছিল ও নিম্নস্তরের লোকের মধ্যে সাহিত্যের দিক দিয়ে যে ব্যবধান এতকাল ছিল তা হঠাৎ খসে গেছে। অথবা এও হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যে সব জিনিসের ইঙ্গিতমাত্র করেছেন আধুনিকরা সেটাই একটু স্পষ্ট করে করেছেন।

রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা কীভাবে অস্বীকার করতে চাইছেন তার প্রমাণ আছে পৌষ ১৩৩৪-এর "মাসিকী"তে। তাঁদের অভিমত হলো সাহিত্য যখন একজন সম্রাটের দ্বারা শাসিত ও চালিত হয় তার চেয়ে দুর্দিন বোধহয় নেই।

'উত্তরা' পত্রিকায় ১৩৩৫-এর বৈশাখ সংখ্যায় মহেন্দ্রচন্দ্র রায় লিখেছেন "সাহিত্যপ্রসঙ্গ"। সেখানে আধুনিকদের পক্ষে সমর্থন রেখে লেখক রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছেন। লিখেছেন, 'আধুনিক সাহিত্য নিয়ে বাঙলা দেশে কোনো

রকমেরই অসহিষ্ণুতা আর অসংযম বাকী রইল না। মানুষ মানুষকে কতখানি হিংস্রভাবে আক্রমণ করতে পারে তারই যেন একটা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। সভ্য মানুষের পালিশী মনের অন্তরালে ইতরতা আজ তার হর্ষোল্লাসের দিন এসেছে। রবীন্দ্রনাথ চিৎপুর রোডের কাদা ছোড়াছুড়ির কথা বলেছিলেন, সাহিত্য-রোডে আজ তা সত্য হয়ে উঠল।'

শনিচরদের 'সমালোচনা' তীক্ষ্ণ এবং নির্মম। হয়তো সেটা ততদূর অন্যায় নয় কিন্তু আলোচনার মাঝে যখন হিংস্র পশুর রক্তলোলুপ জিহ্বাটা লিক্‌লিকিয়ে ওঠে আর 'দ্রংষ্ট্রাবিকাশে'র অপরূপ ভঙ্গী যখন সেই সমালোচনার ফাঁকে দেখা দেয় তখন তাকে সমালোচনা বললে ঠিক সত্য বলা হয় না। শনিগ্রহের ছিদ্র সন্ধানটাই প্রবল হয়ে উঠেছে এবং তাতে তরুণ লেখকদের অনেক বিকারই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে সত্য কিন্তু তরুণ সাহিত্যের মাঝে সেই বিকারটাই একমাত্র বস্তু, তার মাঝে আর কোনো সত্য নেই, একথা নিরপেক্ষভাবে অস্বীকার করা চলে না।

'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের মনে দুঃখ হয় এইখানেই, শনিচরদের ব্যক্তিগত কুৎসা রটনার এই যে কদর্য্য প্রবৃত্তি তাকে তিনি বেশ 'ক্ষমাসুন্দর চক্ষে' দেখে, তার যেখানে কলমের জোর দেখলেন সেইখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে আদর-আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন। শনির শক্তি তাঁর চোখে পড়ল খুব অনায়াসে।' অথচ তরুণ লেখকদের মাঝে কারু কারু আবির্ভাব শনির উদয়ের পূর্বেই হয়েছিল আর তাদের লেখায় অন্য রকমের শক্তি-শ্রী এবং কলমের জোরও অনেকদিন পূর্বে প্রকাশ পেয়েছিল। 'অথচ রবীন্দ্রনাথ কখনো তেমন ক'রে তাঁদের উৎসাহ দিয়েছেন বলে আমাদের মনে পড়ে না।'

তরুণদের পক্ষ হয়ে তিনি বলেন, যদি রবীন্দ্রনাথ বাংলার তরুণ সাহিত্যিকদের তাঁরই ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী মনে করে, তাদের অপরিণত শক্তিকে বিকার-মুক্ত করবার চেষ্টা করতেন, তাদের রূঢ় আঘাত না করে যদি স্নেহদৃষ্টি দিয়ে শাসন করতেন তা হলে এতদিনে বাংলা সাহিত্য বিকারে পূর্ণ না হয়ে অন্যরকমও হতে পারত।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫-এ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "দরিদ্রিয়ানা"। প্রবন্ধটির পাঁচটি উপনাম—ভঙ্গিমা, নূতন অভিজ্ঞতা, সাহিত্য ও সমাজ-রীতি, মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, নবযুগ। গরীবদের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নতুন সাহিত্যে দেখা দিয়েছে অনেকে তাকে বলছে একটা 'ভঙ্গী'। কিন্তু সমাজকে দেখার দৃষ্টি পালটে গেছে। আগে যে রাজ-রাজড়ার অলৌকিক কাহিনীর প্রাধান্য ছিল এখন

জীবনের সংগ্রাম ও উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা মানুষের মহত্বকে সর্বস্থানে, দীনহীনের কুটীরেও খুঁজছি। এটা ভঙ্গী নয়। এর পেছনে আছে সংযম ও আত্মনিবেদন। মানুষ দীন, হীন পাপী হয়েও আপনার মনুষ্যত্বে যদি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে তবে কিসের লজ্জা। পাপের ক্লেদ, পাশবিকতার উত্তাপ নবীন সাহিত্যকে স্পর্শ করেছে সত্য, কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা তাকে সকল পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করছে। 'কারখানার শ্রমিক, কয়লার খনিক, মাঠের মজুর, বাজারের পানওয়ালী সাহিত্যের আসরে নামিয়াছে বলিয়াই যে যুগ-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল, তাহা নহে। ইহাও ঠিক নহে যে, সাহিত্যের নব-যুগ বর্তমান সাহিত্যের ধারাকে একেবারে অগ্রাহ্য বা লুপ্ত করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মানুষের নিয়মই এই যে একযুগ পরবর্তিকালের মধ্যে সফলতা লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করে।' যে নতুন সামাজিক ভাবুকতা আজ রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ভাঙ্গাগড়ায় জন্মগ্রহণ করেছে তা এ-সাহিত্যের প্রাণ। সমাজের নীচ উচ্চ হীন মহৎ সকলকে সে বরণ করেছে। একটা গভীরতম সমবেদনায় সে দীনহীন অধম পতিতের সঙ্গী। 'অ-মানুষের হিংসা, লোভ, পাপকে আজ সে ঘৃণা করে নাই, বরং এই ঘৃণিত জগৎ তাহার হৃদয়ে গভীর দুঃখ জাগাইতেছে, রুদ্ধ আবেগ তাহার যুগপরম্পরাসঞ্চিত সমাজ-বিধি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে আজ একটা মহাযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, নিঃসংশয়ে, অসীম অবহেলায়, কারণ সে পরশমণির সন্ধান পাইয়াছে—

'প্রগতি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪-এর আষাঢ় মাসে আর ঐ একই বছরে বৈশাখে বেরিয়েছিল 'ধূপছায়া'। 'কল্লোল' 'প্রগতি'র মতো 'ধূপছায়া'ও আধুনিক সাহিত্যের সমর্থক ছিল। এর লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে আছেন—প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশ গুপ্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রভাতকিরণ বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি।

শ্লীলতা অশ্লীলতা বিতর্কের সঙ্গে 'ধূপছায়া'র-ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছিল সক্রিয়। আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে 'প্রগতি'র মতো তাদের সমর্থনের এক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল 'ধূপছায়া'। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধর্মের উত্তরে ভাদ্র ১৩৩৪-এ সেখানে এই মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে যে আধুনিক সাহিত্যে বে-আব্রুতা এসেছে বলে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস তা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন না আর কারো ভুয়ো কামতু উপদেশ শুনে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। আধুনিক সাহিত্যে যে নির্জলা নির্লজ্জতা এসেছে তার

অন্তরালের মনোভাব যে একান্তই অসঙ্গত—আজকালকার লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গবেষণা করে, তিনি যদি এই সহজ সিদ্ধান্তে এসে থাকেন,—তবে অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তার আব্রু খুলে কেন তিনি বলতে সাহস করলেন না, কার কার ও কোন কোন লেখা মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে পঙ্কিল হয়েছে। আধুনিক সাহিত্য বলতে তিনি কি বুঝেছেন তাও স্পষ্ট করে জানানো উচিত ছিল; এককাল ছিল তাঁর বিমলাও সকলের চোখে বিমলা ছিল না। অনেকের তাকেই অত্যন্ত বে-আব্রু লেগেছিল।

আধুনিক সাহিত্যে এমন কোন বে-আব্রুতা আসেনি যাকে নির্বিচারে অসঙ্গত বলা যেতে পারে। যদি কিছু বা এসেই থাকে তার নাম অশ্লীলতা নয়,—অক্ষমতা। আধুনিক সাহিত্যে হট্টগোলই বা কোথায়, অট্টহাস্যই বা কোথায়—তবে এতে যে নবশক্তির উদ্দীপনা আছে, আছে মৌলিকত্ব, জীবনকে নূতন সুসম্পূর্ণ করে লাভ করবার জন্য আগ্রহ ও সংগ্রাম, দুঃখ দারিদ্র্য অভাব উৎপীড়নের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা—এবং জ্যোতির্ময় আদর্শনের অনুপ্রাণনা—সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই।

'ধূপছায়া' বৈশাখ ১৩৩৪-এর সংখ্যায় শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের "জংলা পাখী" গল্প ছাপা হয়েছে। 'চোখের বিদ্যুৎ দ্বিগুণ করে ময়না নামে সেই ছুঁড়ি বাবুর বাড়ি ঝিয়ের কাজে যায়। তার ভিজে কাপড়ে যৌবন যখন উথলে ওঠে, তখন বাবুলাল চোখ তুলে চাইতে পারে না।' এ-গল্পের শ্লীলতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সজনীকান্ত।

'ধূপছায়া' অতি-আধুনিক সাহিত্যের সমর্থন জানিয়েছে বার বার। তাই বৈশাখ ১৩৩৫-এর সংখ্যায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর নাটক "বুকের বিষ" প্রকাশিত হয় এবং তারই সঙ্গে লেখকের ছবি। কারণ নরেশচন্দ্র ছিলেন আধুনিকদের অন্যতম সমর্থক। "ঘরে বাইরে" পর্যায়ে লেখা হয়েছে যে 'ধূপছায়া', 'কল্লোল' অথবা 'প্রগতি'র ছাপ মারা থাকলেই অতি-আধুনিকের পর্যায়ে পড়ল, অথবা কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের অনুকরণে যাঁরা লেখেন তাঁরাই আধুনিক এমন কোনো কথা নেই। সাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে অতি আধুনিকদের সম্পর্ক আছে এবং এই সম্পর্কটার মধ্যেই তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ এবং চিন্তার ধারার বাইরে এর অর্থ খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। 'ধূপছায়া'র আধুনিকতা বিষয়ে মন্তব্য হলো যে, লেখার ভিতর যুগধর্মের প্রভাব পূর্ণভাবে ফোটে, বর্তমান সমাজ এবং সভ্যতার রূপটুকুই যার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে কেবল তাকেই

আমরা অতি আধুনিক বলে স্বীকার করব। সে লেখার লেখক তরুণ হোন বা বৃদ্ধই হোন।

'বস্তির চিত্র আঁকা, অসহায় পতিতা সমস্যা লইয়া মাথা ঘামান উচিত না, গরীব দুঃখী এবং মুটে মজুরের ব্যথা বেদনার ছবি অহেতুক—এমন বিধি নিষেধের মানে হয় না। ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেবের সংসারের সম্পূর্ণ চিত্রটিরও সাহিত্যের দরবারে প্রবেশের যতটুকু অধিকার আছে পতিত এবং দুঃখীরও তেমনি।'

বস্তুত এরই মধ্য থেকে সাহিত্যের সনাতন শুচিরেখার পরিধি পরিবর্তিত হচ্ছে ক্রমান্বয়ে একথা যেমন স্পষ্ট তেমনি সমাজের অবহেলিত, সাহিত্যে এতকাল অগ্রাহ্য চরিত্ররা তাদের জীর্ণ নগ্নরূপ নিয়েই বিকারহীনভাবে সাহিত্যে প্রকাশিত হচ্ছে সে-কথাও নানারূপে ধরা পড়ছে। প্রতি সময়ে যেমন হয়, সক্ষম সাহিত্যের পাশাপাশি অপুষ্টরুগ্ন সাহিত্যের প্রকাশে ভারাক্রান্ত হয়েছে অজস্র গল্প কবিতা—সেখানে হয়তো সাহিত্য নয়, শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্নই বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের শুদ্ধাশুদ্ধির দণ্ডধারী বিচারকরা যেভাবে বিপন্নতায় বিদ্ধ হয়ে অশ্লীলতার প্রাধান্যকেই একমাত্র গ্রাহ্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন তা আজকে অনেকেই মেনে নেবেন না। যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ক্রমান্বয়ে আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়েছেন, আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ তেমনভাবে গ্রাহ্য হয়নি অনেক ক্ষেত্রেই। তার কারণ মনে হয় একদিকে যেমন আধুনিক বাংলা সাহিত্য তার পরিণতি নিয়ে গড়ে ওঠেনি তখনো, তেমনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ও তুলনায় খুব সীমাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের সমর্থন যে তরুণদের প্রতি ততটা নয় এ-সত্য প্রকাশিত হয় আরো কিছুকাল বাদে তাঁর 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলনের মধ্য দিয়ে।

১৩ জুন ১৯৩৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'বাংলা কাব্য পরিচয়'। ১৩৪৫ আশ্বিন 'কবিতা'য় বুদ্ধদেব বসু লিখলেন আদি রসের কবিতা বাদ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যে সর্বজনের জন্য রবীন্দ্রনাথ আদি রস বাদ দিলেন তারা কারা? 'সৎ সাহিত্যের আদি ও অকৃত্রিম দালাল' বসুমতীর পাণ্ডারা? মাননীয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও তাঁর পরিজন? সেই ব্যক্তি কে? আদি রসের কবিতা থাকলে এ বই যার কাছে অগ্রাহ্য হতো? যদি এমন কোনো উন্মাদ থাকেই আমাদের কি আজ এত বড়োই দুর্ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ তাকে এতখানি খাতির করে গেলেন?

'বাংলা কাব্য পরিচয়ে'র দ্বিতীয় সংস্করণের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন সজনীকান্ত দাসকে। চিঠিতে লিখেছিলেন, 'কাব্য পরিচয়ের আন্ত ও মাধ্যদের

শ্রাদ্ধ সমাধা হয়ে গেছে।…অন্ত-রা ভয়াবহ।…তোমার চর্মে খরনখরের প্রখরতা প্রতিহত হবে জানি। কবির দল বরযাত্র দলের মতো, সংকলনকর্তা কন্যাকর্তার সমপর্যায়ের। মাথা হেঁট করেও বোধহয় তুষ্টিসাধন করতে হবে। তাই বলে মাথা ধুলোয় লুটিয়ো না। এই অনুষ্ঠানে হিটলার-চেম্বারলনী পালার সাহিত্যিকরূপ দেখতে পাব আশা করছি'। এ-ঘটনার উল্লেখ অনিবার্য মনে হলো এই কারণে যে এর থেকে আরো স্পষ্ট হয় সেদিনের বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল কোন পক্ষে?

অশ্লীলতায় অভিযুক্ত

যুবানশ্ব'-র "পটলডাঙার পাঁচালী" প্রকাশিত হয়েছে 'কল্লোলে'র শ্রাবণ ১৩৩৩-এর সংখ্যায় (পৃ ১৮১-১৮৮)।

সে হলো পটলডাঙার ভিখিরী পাড়া। প্যাচ্‌প্যাচে পাঁকের ভেতর ছোট ছোট ভাঙা কুঁড়ে, সার সার গায়ে গায়ে লাগান।

চরিত্র হলো—নফর, ফক্‌রে, সদি, গুব্‌রে, নুলো, খেঁদী পিসী ইত্যাদি। এ মদ, মাতাল, ভিখারী আর দেহবৃত্তির জগৎ—কোথাও কোনো মূল্যবোধের পরিচয় নেই।

এখানে এই আলোবাতাসহীন বদ্ধ ঘরে যারা প্রবেশ করে তাদের বর্ণনা এরকম—"ঝাপ ঠেলে একজন চুরচুরে মাতাল, বয়স বছর তিরিশ বত্রিশ হবে ঘরে ঢুকল। বীভৎস, কদাকার মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ীতে অন্ধকার। দু'কস বেয়ে লালা গড়াচ্ছে"—

এখানকার পরিবেশ—স্যাঁৎসেতে মাটির মেজের ওপর, ছেঁড়া মাদুর, খবরের কাগজ, তালি দেয়া কাঁথা···ধোঁয়ার গন্ধ, বাইরের পচা কাদা ও নোংরা আস্তাকুঁড়ের গন্ধ—···

এ-সব চরিত্রের কথা বলার ভাষাও আলাদা—

কুঠে বুড়ী—হাড় শয়তান। হাড় শয়তান।—ছেনাল মাগি।—যে রূপের ছিরি, —ঐ নিয়ে আবার যায় মানুষ পটাতে। ঘেন্নায় মরি।

নফর—সদি, তু' এত রেতে জেগে যে?

সদি—বাইরে গেছ্‌নু।

ন—একন?

সদি—হ্যাঁ।

ন—ক্যানে।

সদি—পিসীর তাড়ায়।···কাল থেকে দস্তরী দিতে পারিনি। বললে, খেতে দোব না।

ন। হুঁ।···আজ খাসনি তামাম দিন।

স। না।

ন। তা ঘুরে এলি, হোলো কিছু ?

স। ছাই। ওরা আবার কবে কাকে পয়সা ছ্যায়। আরো হুমকি দিলে যে, থানায় নে যাবে।···

ন। ভিখ মাঙতে যাসনি ? তবে কোতা গেছলি ?

স। তাই ত গেছনু। পতে···এক ব্যাটা কনেষ্টবল—

ন। কনেষ্টবল!

স। হ্যাঁ। ঝিমুচ্ছিল। আমায় দেকে বল্‌ল, পয়সা দেবে। সারাদিন দানা নেই পেটে ; আমার কোনো সাড় ছিল না। পয়সা দেবে শুনে···

কু। (খিল খিল করে হেসে) কত দিলে লা ? মরি মরি···যে রূপ···বলি দিলে কত···অ পুলিশ-পিয়ারী···

(ঝাপ ঠেলে একজন চুরচুরে মাতাল···ঘরে ঢুকল। একহাতে একটা ভাঙা মাটির ভাঁড়···সে ফক্‌রে।)

···(ভাঁড় ধরে একচুমুকে সবটা তাড়ি নিঃশেষ করে সদি উঠে দাঁড়াল)

ফ। কোতা চললি ?

স। যেকনেই যাই, তোর কি!—গুয়ো কোতাকার!

ফ। মাগি না খিঙ্গী!—আমার খেয়ে আমাকেই চোখ রাঙাবি ?

স। একশ' বার। গেঁজেল ভূত কোতাকার। মর্—মর্—

[সদির হাবভাব দেখে নফর অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল]

স। আ মর মিন্‌সে! চোক্ মাচ্চিস্ যে ?—হু হু বাপধন,—ওতে হয় না।—পয়সা আচে ?—নগদ ? ফ্যাল আগে—তা'পর।—ফ্যাল কড়ি মাখ তেল···

ফ। মোক্কম বলিচিস মাইরি! হিঃ হিঃ হিঃ। ফ্যালো কড়ি,—কিনা—হোঃ হোঃ

স। খিক খিক রাক।—আর আচে···নেই—মড়া—কিপটের ডিম কোতাকার!

ফ। মুক্ সামলে কতা কস সদি। কিপ্‌টে! ফকিচ্চাদ কিপ্‌টে। তবে কাপ্‌টেন কে বাবা ? মামার হোতা আজকের মাইফেল চালাল কে শুনি ? কুসমি, রত্‌না, হেবো,—দেক্ গে যা, এক একটা পেট ফুলে ঢাক হয়ে পড়ে আচে। দিনের রোজগার বিল্‌কুল্ সাফ হয়ে গেল, এক সন্ধ্যায়—কিপ্‌টে। কোন্ শালা বলে কিপ্‌টে।

স। নে' নে'—ডমফাই রাক্। হেবো কুসমির পেট ফুল্‌ল, তাতে মোদের কি

এল গ্যাল রে ? ঠোঁটও ত ছাই ভিজল না ! –এই নপা !—এই শুয়োর ! ঘুমুচ্ছে ভ্যাক্ ।

বুদ্ধদেব বসুর "রজনী হল উতলা" 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়েছে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩-এ। এ-গল্প নিয়ে সেদিন যে ব্যাপক অভিযোগ উঠেছিল আজকের দিনে তা হয়তো তেমন কোনো অশ্লীলতার প্রসঙ্গ তুলবে না। তবু 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠা থেকে সেই অংশগুলোর উল্লেখ করছি—

...তখন আমার সেই বয়স, যে বয়সে একটুখানি শাড়ির আঁচল দেখলেই বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে...তখন যখনি যেখানে কাঁচা বয়েসের মেয়ে দেখতুম, ইচ্ছে হত ছুটে গিয়ে ওকে আমার নিজের ঘরে টেনে নিয়ে আসি...

...তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কি কতগুলো খস্‌খসে জিনিষ এসে পড়ল—তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ রিম্‌ঝিম্ করে উঠল। প্রজাপতির ডানার মত কোমল দুটি গাল, গোলাপের পাপ্‌ড়ির মত দুটি ঠোঁট, চিবুকটি কি কমনীয় হ'য়ে নেমে এসেছে, চারু কণ্ঠটি কি মনোরম, অশোকগুচ্ছের মত নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দুটি বক্ষ—কি সে উত্তেজনা, কি সর্বনাশা সেই সুখ, তা তুমি বুঝবে না...

তারপর ধীরে ধীরে দু-খানি বাহু লতার মত আমায় বেষ্টন করে' যেন নিজেকে পিষে চূর্ণ করে ফেল্‌তে লাগলো—আমার সারাদেহ থেকে-থেকে কেঁপে উঠতে লাগল...আমি আবার দু'হাত বাড়িয়ে ওর লতায়মান দেহটি সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগলুম। নিঃশব্দে ও আমার বুকের উপর এলিয়ে পড়ল।

...আবার দেহের অণুতে অণুতে সেই স্পর্শসুখের উন্মাদনা—সেই মধুময় আবেশ,—সেই ঠোঁটের উপর ঠোঁট ক্ষইয়ে ফেলা—সেই বুকের উপর বুক ভেঙে দেওয়া—তারপর স্নিগ্ধ অবসাদ—

'শনিবারের চিঠি'র "মণি-মুক্তা" অংশ দেখলেই বোঝা যাবে আধুনিক সাহিত্যের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে তাদের আপত্তি কোথায়। অবশ্য তরুণ সাহিত্যিকদের ভাষা ব্যবহারের রীতি নিয়েও বিদ্রূপ করেছে 'শনিবারের চিঠি'। যেমন "সাহিত্য-ধর্ম প্রসঙ্গে" সজনীকান্তের লেখায় ১৮৬ পৃষ্ঠায় নরেশ সেনগুপ্তর লেখা থেকে দীর্ঘ উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। অন্তত ৩২টি বাক্যাংশ তুলে ভাষা ব্যবহারের রীতি দেখিয়ে বিদ্রূপ করেছেন।

"শ্রাবণঘন গহন মোহে"—নিরুপম গুপ্ত ('কালিকলম', আষাঢ় ১৩৩৪)

আলোটা কখন নিবিয়া গেছে। অন্ধকারে তবু তাহার হঠাৎ মনে হয়, হাতের পরশটা যেন সে চেনে...চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কে' ?

'আমি'।

'আপনি? ছোড়দি! এখানে এত রাত্তিরে! কি ভয়ানক, কি করে' এলেন আপনি! যান যান এক্ষুনি।'

ঝড়ো বৃষ্টির হাওয়া জানালা দিয়া হু হু করিয়া ঢোকে, ওই পাশের গাছটাকে যেন ভাঙিয়া চুরিয়া পিষিয়া ফেলিতে চায়। ছোড়দি বলে, 'কি করে' এলাম? তুমি আমায় আর থাকতে দিলে না।—তাই এলাম।'

'ছোড়দি, এসব কি বলচেন, আমি কিছুই বুঝতে পারচি না'—নির্মল বলে, কিন্তু এসবই যেন চকিতে সে বুঝিতে পারে।

'বুঝতে পারছ না, সত্যি বলচ?'

'হয়ত পারচি, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারচি না—'

কথা শেষ হইতে পায় না, আবেগ-উদ্বেলিত বুকে ছোড়দি নির্মলকে আকর্ষণ করে, বলে, 'বিশ্বাস কর, অবিশ্বাস ক'রো না—' বলে, আর উন্মাদ চুম্বনে তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে চায়।···

"বিচার"—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ('বঙ্গবাণী', আশ্বিন ১৩৩৪)

'ভদ্রলোকের ঘরে আমার জন্ম।···শরীরে শক্তির চর্চ্চাটা করেছিলাম।

···আমার এক ইয়ার একদিন আমাকে গোপনে বল্লে, এক গোয়ালার ঘরে এক সুন্দরী বউ আছে—···সোজা গয়লার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলাম।···ইয়ার আমার ওৎ পেতে ছিল, বউটা বের হতেই তাকে জাপটে ধরে কাঁধে ফেলে ছুট দিলে।

···আমি নিশ্চিত মনে গয়লা বউকে দখল ক'রে ব'সলাম। ·· গয়লা বউয়ের আগেও অনেকে ছিল, পরেও অনেকে হ'য়েছিল। কারও জন্য আমার এতটা বেগ পেতে হয়নি।

···নিস্তারিণীর সঙ্গে আমার আলাপ হয় এর বছর দশেক পরে। সে ভদ্রলোকের মেয়ে ব্রাহ্মণী, আমার সঙ্গে একটু দুর সম্পর্কও আছে। ···অনেক দিন সে আমাকে এড়িয়ে ছিল, কিন্তু শেষে তাকে ধরা দিতেই হল।···যখন সে ধরা দিল তখন একেবারে আমাতে সে ডুবে গেল। সে আমার জন্য ঠিক পাগল হয়ে উঠলো। ক্রমে তার লজ্জা সরমও ছুটে গেল। দুঃসাহসের তার অন্ত ছিল না—ধরা পড়বার ভয় সে বড় করত না যদিও আমি করতাম, তার মানসম্ভ্রমের খাতিরে। অত লোক ভরা বাড়ি, তার ভিতর থেকে সে অনেক দিন রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে পালিয়ে আসতো আমার বজরায়। আমি বলতাম, 'এ কি দুঃসাহস তোমার! ফিরে যাও।'

সে হেসে গড়িয়ে পড়তো আমার কোলের উপর।…নিস্তারিণীর স্বামী কলকাতায় চাকরী করে, ডেলী প্যাসেঞ্জার, কাজেই তার কাছে ধরা পড়বার আশঙ্কা ছিল কম। কিন্তু শেষে নিস্তারিণী ধরা পড়ে গেল তারই কাছে।…দ্বিপ্রহর রাত্রে। নিস্তার আমাকে যেতে বলেছিল…তার স্বামীর সে রাত্রে না ফেরার কথা।… আমি যেতেই সে আমাকে সাপ্‌টে ধ'রে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল তার সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছে।…ঘরের ভিতর ঢুকে তাড়াতাড়ি সে খিল এঁটে দিলে, ঘর একদম অন্ধকার।…তারপর সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে…

"ঠাট্ট-টা" ('কল্লোল', কার্তিক ১৩৩৪)

মাছের মাও বিয়োয় কিন্তু পালে না—হয়তো মা বসুমতীর ব্যভিচারের মরা-হাজা সন্তান সব। অনাহারের শীর্ণতা, জীর্ণ প্রাণের ব্যাকুলতা, বুক নিঙ্‌ড়ানো দীর্ঘশ্বাস—এরাই সম্বল।…হাত বাড়াইয়া লোকটা যাইবার সময় তাহাকে ডাকে। কিন্তু মেয়েটা ওঠে না, চিৎ হইয়া শুইয়াই ডান হাতটি বাড়াইয়া বলে, কালকের পাওনাটা?…আয় না, দেবো রে।…মেয়েটি নিঃশব্দেই হাসে। বাঁ হাতের বুড়া আঙুলটা দেখাইয়া বলে, "কলা! ভাগ।" লোকটা আর দাঁড়ায় না।…হাওয়া বয় না,—বাগানের ফুলতলায় সে হাওয়া আসে।…মানুষের বাসিমুখের গন্ধ জানোয়ারের শুকনো রক্তের ধুলা মিশানো, বদ্ধতার মধ্যে অনৃকির প্রলাপ, মিঠাইয়ের দোকানে হলদে মাছির পোকা প্রসব—এ সেই হাওয়া!…রক্তের অণুপরমাণুসম পৃথিবীকে যেন পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। জীবশোণিত সে ব্যভিচারিণীর বড় প্রিয়।

'প্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গল্পকে 'শনিবারের চিঠি'র পৌষ ১৩৩৪-এর "মণিমুক্তা" বিভাগে (পৃ ৩৪৫-৩৪৬) এইভাবে উদ্ধার করা হয়েছে—

"টান" (Pornography নয়, সাহিত্য Boule de Suif-এর বাংলা সংস্করণ) শ্রীবুদ্ধদেব বসু (বয়স ২০/২১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র) 'প্রগতি', কার্তিক ১৩৩৪

বলি, লোক বসাবে?

—জানলা দিয়ে বের-করে'-দেয়া হাতখানি একটু নড়ে ওঠে। শুনি, আসুন না বাবু ওপরে।—অন্ধকারে পা টিপে' টিপে' উপরে উঠি। মাঝ-পথে একটা কুপি জলছে আবার—না জললেই ভালো ছিলো।

ঘরের ভিতর ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় বাড়িউলী এসে পথে আট্‌কালো।—বল্লে, আগে কথাবার্তাটা হয়ে যাক।—বল্লাম—তুমিই শুরু করো।—কতক্ষণ

থাকবেন? সারারাত।—গজেন্দ্রগামিনী নয়, গজেন্দ্রদেহী নথ নাড়া দেখে দুনিয়ার সকল ঈভ্-এর উপর ভক্তি চটে' যায়।—

খ্যানখেনে আওয়াজে বলে, তুমি বাছা ভদ্দরলোকের ছেলে, বেশি আর কি বল্‌বো? পাঁচটে টাকা দিয়ো।—আচ্ছা, কিন্তু তুমি এখন খসে পড়ো তো।—হ্যাঁ, যাচ্ছি বইকি বাবা, এই যাচ্ছি। তোমরা আমোদ আহ্লাদ করো যতক্ষণ খুসি—আমি তার মধ্যে—কিন্তু এখুনি কিছু দিয়ে দাও বাবা—ঝনাৎ করে' দুটো টাকা ফেলে দিলুম। বুড়ী ও-দুটো কুড়িয়ে আঁচলে বেঁধে শাকচুন্নীর মত ফোক্‌লা হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল।—এই-ই ওর মা হয়তো—হয়-তো বা না।—

ঘরে ঢুকেই বল্‌লুম, তোমাদের ব্যবসা চলে কি করে'? ঐ রকম জাঁদরেল একটা মেয়েমানুষকে পেরিয়ে সবাই কি আর আস্‌তে পারে? ওটাকে বাদ দিলে চলে না।—

মেয়েটি জানলার কাছ থেকে সরে' এসে বললে, কি করবো বলুন—আমাদের এখানকার এই হাল। যারা আসে, তারা জেনে শুনেই আসে।—আপনি এই প্রথম এলেন বুঝি?—মেয়েটির হাত দুটি বড় সরু, রঙটা বড় ফ্যাকাশে। ওর দিকে চেয়ে মিথ্যে বলতে ইচ্ছে করলো না। স্বীকার করলুম, হ্যাঁ।—

ও কি গো?—চললুম।—সে কি? এখুনি? কিছুই তো হ'ল না।—বেরিয়ে যাচ্ছিলাম ও ছুটে' এসে আমার হাত ধরলে।—সেই জন্যেই এত রাগ। বাবাঃ—আচ্ছা লোক তুমি! তা এসো, তোমার আশ মিটিয়ে দিচ্ছি—

চক্ষের নিমেষে দু'টো সাপের মতো ওর দুটো হাত আমাকে ঘিরে ধরলো। আমার মুখের নাগাল পাবার জন্য ওর মুখের সে কী বিশ্রী কাৎরানি।—চুলের খোঁপা খসে গেছে—গায়ের আঁচল লুটিয়ে পড়েছে—চোখ দুটো লাল—কথা বলবার ক্ষমতা ওর আর নেই। তারপর হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওর জামার বোতামগুলো পট্‌পট্ করে ছিঁড়তে লাগলো—একটা দুটো।

"বন্দী ভগবানের আর্ত্তনাদ"—

দোরের কাছ দিয়ে নব্‌নে জেলের বিধবা ডব্‌কা মেয়েটা প্যাট্ প্যাট্ করে তাকিয়ে যায়, একটুখানি মুচকি হাসেও। ছিদাম বোঝে না। মেয়েটা উঠে অন্ধকারে হঠাৎ ছিদামকে জড়িয়ে ধরে। অনাবৃত ভরন্ত দেহটার পরশ ছিদামের শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়। ছিদামের কাছে সবই যেন তখন সহজ হয়ে আসে—সে বুঝতে পারে সবই। একটু দূরে স'রে বসে, বলে, বাড়ী যা ক্ষেন্তি—হয়তো মেয়েটার জন্য ছিদামের একটু দুঃখ হয়—আহা ছোট বেলায় সোয়ামী

মারা গেছে, আজ এই ভরা বয়স···মেয়েটা যায় না···বসেই থাকে। ছিদাম আবার বলে···দুম দুম করে মেয়েটা চলে যায়।

ক্ষেন্তি আবার তার সমুখ দিয়ে আসে যায়···একদিন ফাগুনের বেলা শেষে অকাল-বাদ্‌লা নেমে আসে। দিনটা মন-মরা, কে যেন গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছে—ছিদাম আজ আর বেরোয়নি।

ক্ষেন্তির দিকে সে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে···জলে সারা গা ভেজা—ছপ্‌ ছপে, ভেজা কাপড়ের ভিতর দিয়ে সমস্ত শরীর ফুটে উঠছে—বুকে তার কী সে উদ্দাম যৌবন-শ্রী! যেন দুটি ফুটন্ত ফুল পূজার জন্যে উন্মুখ আকুল···সে ঘরের কোণ থেকে টাকার পুট্‌লিটা এনে ক্ষেন্তির হাতে গুঁজে দেয় কোনমতে, তারপর—উন্মাদের মতো ক্ষেন্তিকে দুহাতে বুকের মাঝে চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় তার সমস্ত মুখটা ভরে দেয়—ছাড়া পেয়ে ক্ষেন্তি খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে···ঠোঁটে হাত ঘষতে ঘষতে বলে, হেরে গেলি ছেদাম।···

সবাই যেমন শোনে, ছিদামও শুন্‌তে পায়—মেনো কাল রাত্তিরেই ক্ষেন্তিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।···

ছিদামও আর সে ছিদাম নেই, একমুহূর্তে ক্ষেন্তি তাকে বদলে দিয়ে গেছে। তার ভেতরকার ক্ষুদ্র ভগবানটি আজ অভাবের তাড়নায় আর্ত্তনাদ করে—সে আজ ভুখা—কিন্তু কী সে ক্ষুধা? কিসের সে অভাব! ছিদাম ভালো করে বুঝতে পারে না, শুধু সে এইটুকু বুঝতে পারে—পথ দিয়ে যখন কাঁচা বয়সের মেয়েরা জল নিয়ে যায়, তার ইচ্ছা করে তাদের কলসীগুলো এক ঢিলে ভেঙে দিয়ে তাদের নিয়ে আসে তার কুঁড়ের ভেতর, তার জীর্ণ শয্যার পাশে···

কালো, কুশ্রী, সারা দুনিয়ার অবজ্ঞার নারী, যার বুকে যৌবন আছে,—তাকে দিয়েই সে তার ক্ষুধিত আত্মার বাসনার দুয়ারে ধূপ ধূনা দেবে—

যে ঘাটে মেয়েরা নাইতে আসে দলে দলে, তারি একটু দূরে জাল ফেলে বসে, তাদের নাওয়া দেখে—

বিকৃত ক্ষুধায় অন্তরের বন্দী ভগবান আরো আর্ত্তনাদ করে ওঠে।

"গুরুজনের মান" (অথবা চুম্বন প্রকরণ)—গিরিজাকান্ত বসু, 'কেতকী', শ্রাবণ, ১৩৩৪ [নায়িকা—অরুণা, বিবাহিতা যুবতী। নায়ক—গণদেব, নায়িকার পূর্ব্ব প্রণয়ী ও সুবাদে দাদা]

ছি! গুরুজনকে কি চুমু খেতে আছে? নেই? স্বামী কি তবে গুরুজন নয়? তাঁকে তাহলে চুমু খাওয়া চলবে না?···অরুণা বললে, 'তা কেন?···স্বামী—সে,

না, ও কথা আমি বলছিলুম না। আমি যে সত্যই স্বামী ছাড়া অন্য গুরুজনকে চুমু খাওয়ার ভিতর কোনো দোষ আছে তা ভাবি না—তবে সংস্কার এমন প্রবল যে মনে বড় বাধে—বড় লজ্জা করে'।...গণদেব বললে 'সে আলাদা কথা; জেনে রেখো সে লজ্জা দূর করবার উপায় মনের শুভ্র আকাঙ্ক্ষা জোর করে চাপা নয়—সরমেই হোক্ বা সাহসেই হোক্ তাকে অভিব্যক্ত করা—লজ্জা ক্ষণভঙ্গুর ব্যাপার—আর একবার ভাঙ্‌লে তাকে আর মেরামত করবার দরকার হয় না। তুমি কি আমাকে আদর ক'রে চুমু খাওনি কখনো'?...'খেয়েছি, কিন্তু আজ বড় লজ্জা করছে'...'এতদিন পরে ফিরে এলে—তবু এই প্রেমের চিহ্নটুকু আমাকে উপহার দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছ? আমি শাস্ত্র বুঝি না, মানি না।'

[Gin a body meet a body
Comin thro, the rye
Gin a body Kiss a body
Need a body cry ?]

"বিবাহের চেয়ে বড়"—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ('প্রগতি', আশ্বিন, ১৩৩৪)

ঘরের এককোণে একটা ভাঙা তক্তপোষের ওপর পা মেলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রভাত ঘুমিয়েই পড়েছে হয়ত—খোলা দরজা ঠেলে ঘরে কে যেন এল।—

তারার অস্পষ্ট আলোতে খানিকক্ষণ সমস্ত ঠাহর করে নিয়ে অশ্রু বাতি জ্বালালে। প্রভাতের কাছে এসে সহজ সুরে বল্লে—ঘুমুচ্ছ ওঠ, বিছানা পেতে দি, তারপর ভালো করে শোও।—

প্রভাত চোখ কচলে জেগে ওঠে—অশ্রু বলে—ওরকম হাঁ হয়ে গেছ কেন? ভাল করে শোও—তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।—

প্রভাত বলে—আজ তোমার বিয়ে না? লজ্জায় চোখ নামিয়ে বলে—হাঁ—হয়ে গেছে?—হয়নি এখনো? এই ত' হচ্ছে।—তিনু, যে একদিন তোমার খবর নিতে এসেছিল, তারই সঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে এসেছি।—আবার কখন যাবে? এইখেনেই থাকব।—

প্রভাত—আচ্ছা, আজ রাতে একটা উৎসব করলে হয় না? অশ্রু উৎফুল্ল হয়ে বলে—খুব চমৎকার হয়। কিন্তু, কিন্তু কি উৎসব করব?—আমি তোমার বুকের কাছে শুয়ে মরে যাব—আর তুমি উলু দেবে।—

ম্লানমুখী অশ্রু প্রভাতের হাতখানি নিজের কোলের ওপর টেনে নেয়, বলে—তুমিই দিয়ো।

আজকে একটা ইলাহিরাত।—প্রভাতের ইচ্ছা করে অশ্রুর ঐ মুখ, উত্তপ্ত বক্ষঃস্থল, বসনান্তরালের সমগ্র দেহের প্রতি রোমকূপ অজস্র মদির চুম্বনে পাণ্ডু করে দেয়,—অশ্রুর ইচ্ছা করে রথের চাকার তলে মাটির ঢেলার মতো নিজের অস্তিত্বটা প্রভাতের বুকের তলায় গুঁড়া ক'রে ফেলে।

'শনিবারের চিঠি'র মন্তব্য—

আমরা লেখকের প্রতি অবিচার করিব না। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ। এই উপন্যাসখানিতে গল্পচ্ছলে বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতাকে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

ঘরে আইবুড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতির মুখ
এড়াইয়া ঝির বিয়া দায়॥
বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ
বিয়া হইলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা কত না সহিবে বালা
কথায় রাখিব কত ঠেলে॥

'প্রগতি', পৌষ-মাঘ ১৩৩৫, পৃ ৩৭৮

…যেথায় স্ফুরিছে নাসা কটিলগ্ন স্বেদের আঘ্রাণে,
বাতাসে ভাসিছে যেথা জন্মবীজ, রতি-সম্মোহন।
আমি সেথা গিয়েছিনু সন্ধ্যাবেলা—প্রলুব্ধ, অস্থির ;
আসঙ্গ-বাসনা-পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক।
সারঙ্গ-সঙ্গীত-স্বনে শিহরিছে উৎসব-উৎসুক
হেমচ্ছটা বিচ্ছুরিত বাতায়ন প্রতি পণ্য-স্ত্রীর।
উজ্জ্বল বসন বর্ণ, বিষবাষ্প, উত্তপ্ত নিঃশ্বাস,
কৃত্রিম-রক্তিম ওষ্ঠে লালসার বলিষ্ঠ বিলাস
মদ্যফেনা তীব্র গন্ধ কী আনন্দে পশিলো রুধিরে।
আমারে ডাকিয়া নিলো তরঙ্গিত দেহ গঙ্গানীরে।
সেথায় আকাশ নাই, তারা সেথা কখনো ফোটেনা,
কটু গন্ধ অন্ধকারে শুধিলাম বিধাতার দেনা।

* * *

আমি যে করেছি পান ব্যগ্র কণ্ঠে এই উগ্র সুরা—
মোরে দিয়ে বিধাতার এই শুধু ছিল প্রয়োজন,
স্রষ্টা, শুধু এই চাহে, এ বীভৎস ইন্দ্রিয়-মিলন—
নির্ব্বিচারে প্রাণী-সৃষ্টি করে' থাকে যেমন পশুরা।

"বন্দীর বন্দনা"—বুদ্ধদেব বসু ('কল্লোল', ফাল্গুন ১৩৩৩)

বাসনার বক্ষমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষ বর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গারের হিয়া
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি।
তাদের মিটাতে হয় আত্মবঞ্চনার নিত্য ক্ষোভ।
আছে ক্রূর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় স্বার্থপর লোভ,
হিরণ্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসাসর্প গুপ্ত আছে;
আনন্দ-নন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রিতা।...
জ্যোতির্ময়, আজি মম জ্যোতির্হীন বন্দীশালা হতে
বন্দনা-সংগীত গাহি তব।
স্বর্গলোভ নাহি মোর, নাহি মোর পুণ্যের সঞ্চয়
লাঞ্ছিত বাসনা দিয়া অর্ঘ্য তব রচি আমি আজি
শাশ্বত সংগ্রামে মোর বিক্ষত বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা
হে চির সুন্দর, মোর নমস্কার সহ লহ আজি।

"গাব আজ আনন্দের গান"—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ('কল্লোল', আষাঢ় ১৩৩৩, পৃ ১২৭)

মৃন্ময় দেহের পাত্রে পান করি তপ্ত তিক্ত প্রাণ,
গাব আজ আনন্দের গান।
বিশ্বের অমৃত-রস যে আনন্দে করিয়া মন্থন,
লভিয়াছে নারী তার সুখোদ্বেল তপ্ত পূর্ণ স্তন;
লাবণ্য-ললিত তনু যৌবন-পুষ্পিত পূত অঙ্গের মন্দিরে,
রচিয়াছে যে আনন্দ কামনার সমুদ্রের তীরে,
সংসার-শিয়রে;—
যে আনন্দ আন্দোলিত সুগন্ধ-নন্দিত স্নিগ্ধ চুম্বন-তৃষ্ণায়,

বঙ্কিম গ্রীবায় ভঙ্গে, অপাঙ্গে, জঙ্ঘায়;
লীলায়িত কটিতটে ললাটে ও কটু ভ্রূকুটিতে,
চম্পা-অঙ্গুলিতে ;—
পুরুষ-পীড়নতলে যে আনন্দে কম্প্র মুহ্যমান,
গাব সেই আনন্দের গান।
যে আনন্দে বক্ষে বাজে নব নব দেবতার পদনৃত্যধ্বনি,
যে আনন্দে হয় সে জননী।

যে আনন্দে সতেজ প্রফুল্ল নর, দম্ভদৃপ্ত, নির্ভীক, বর্ব্বর,
ব্যাকুল বাহুর বন্ধে কুন্দকান্তি সুন্দরীরে করিছে জর্জ্জর,
শক্তির উৎসব নিত্য যে আনন্দে স্নায়ুতে শিরায়
যে আনন্দ সম্ভোগ-স্পৃহায় ;—
যে আনন্দে বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে গড়িছে সন্তান,
গাব সেই আনন্দের গান।

* * *

যে আনন্দে পতঙ্গেরা পাখা মেলি' আগুনেরে করে আলিঙ্গন
যে আনন্দে চঞ্চরীরা গুঞ্জরিয়া করে পুষ্প-মঞ্জরীর মন্দিরা ভুঞ্জন,
যে আনন্দে উপবাসী, পতিতার শুষ্ক ওষ্ঠে করে লুব্ধ ক্ষুধার্ত্ত চুম্বন,
যে আনন্দে প্রেয়সীর নব অবগুণ্ঠনের লজ্জা উন্মোচন,
যে আনন্দে পত্রে পত্রে দীপ্ত করতাল,
সে আনন্দে হইব মাতাল।...

'কালিকলম' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ২য় সংখ্যা, শুরু হয়েছে নজরুলের "মাধবী প্রলাপ" কবিতা দিয়ে—

আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে পতি।
তার নিধুবন-উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন,
বুকে পীন যৌবন
উঠিছে ফুঁড়ি—
মুখে কাম-কণ্টক ব্রণ-মহুয়া কুঁড়ি।

কার   বসন্ত বনভূমি সুরত কেলি
পাশে   কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি।
ঝুরে আলু-থালু কামিনী
জেগে সারা যামিনী
মল্লিকা ভামিনী
অভিমানে ভার
কলি   না-ছুঁতেই ফেটে পড়ে কাঁঠালি-চাঁপার

…আসে   ঋতুরাজ। ওড়ে পাতা জয়ধ্বজা
হল   অশোকে শিমূলে বন পুষ্প-রজা।
তার পাংশু চীনাংশুক
হল রাঙা কিংশুক
উৎসুক উন্মুখ
যৌবন তার
যাচে লুণ্ঠন-নির্ম্মম দস্যু তাতার।

প রি শি ষ্ট

রচনা সংকলন

সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত

বাঙ্‌লা সাহিত্যে কিছুকাল হইল একটা নূতন ধারা বহিয়া চলিয়াছে ইহা সকলেরই নজরে পড়িয়াছে। অনেকের মতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয় এ ভাবগঙ্গার ভগীরথ। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ধারাপন্থীরা রসোদ্বোধনের সাবেক মামুলী ক্ষেত্র ছাড়িয়া নূতন অনাসংশিতরসমূর্ত্তি বিষয়ের ভিতর রসের উৎস খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ফলে অনেক সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার রসের স্বরূপ ও উৎস পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য হইতে অনেক অংশে ভিন্ন।

নূতনের সাড়া পাইলেই স্থিতি-স্থাপক জনসমাজে একটা প্রচণ্ড কোলাহলের আবির্ভাব হয়। এ-ক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছে। অনেক আঘাত এই নূতন সাহিত্যকে সহিতে হইয়াছে। উন্মত্তের মত সাবেক সমাজ এই সাহিত্যের দিকে ইট-পাটকেল যা' খুসী ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। উন্মত্তের নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্ররাশির মত তার অনেকগুলিই ঠিক জায়গায় পোঁছায় নাই, লক্ষ্য-বস্তুর চারিদিকে কেবল নিরর্থক আবর্জনা হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। আর আঘাতের লক্ষ্য-নির্ণয়েও এই সব ক্ষাত্রধর্ম্মী সাহিত্য-সমালোচক তাঁদের লক্ষ্য নিশ্চয় করিতে গিয়া বাছবিচার করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন —কে শত্রু, কে মিত্র, কে বা নূতন, কে বা পুরাতন, কে লক্ষ্য, কে অলক্ষ্য তাহা বাছাই করিবার চেষ্টা না করিয়া, এলোমেলোভাবে তাঁরা গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। যাঁরা এতদিন এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, রসসৃষ্টি ও রসের নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের বিধিদত্ত অধিকারে তাঁরা বঞ্চিত। তাই নূতন ধারার সাহিত্য তাহাতে বিচলিত হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ এই আক্রমণকারীদের রথের উপর আজ এমন একজন আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাকে দেখিয়া নব-সাহিত্য চমকিত হইয়া চক্ষু বারবার মাজিয়া অবাক্-বিস্ময়ে চাহিতেছে। আজকার সংগ্রামে যিনি রথী তিনি রথীশ্রেষ্ঠ, রসসাহিত্যে তাঁর অবিসম্বাদী অধিকার। তা'ছাড়া তিনিই তো এতদিন সমালোচক জগতের কষাঘাতের পোনেরো আনা নিজের বিশালপৃষ্ঠে বহন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র-সমরে দ্রোণাচার্য্যকে আপনার বিরুদ্ধে রথারূঢ় দেখিয়া গাণ্ডীবীর ক্লৈব্যের উদয় হইয়াছিল। যাঁকে নিত্য নূতন রসের পূজারী, নূতন ধারার মন্ত্রগুরু ও অগ্রদূত বলিয়া নবসাহিত্য এতদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে,

আজ তাঁহার হাতে আঘাত খাইয়া সে যদি হঠাৎ বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইয়া উঠে তবে তাহা বিচিত্র নয়।

এতদিন নূতন সাহিত্য সম্বন্ধে যে-সব নিন্দা শোনা গিয়াছে, তার প্রধান কথা এই যে, ইহা সমাজনীতিবিরুদ্ধ। তা'ছাড়া আর একটা কথা শোনা গিয়াছিল যে, ইহা বিলাতী, এ-দেশের আব্‌হাওয়া বা জীবনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সাহিত্যধর্ম্ম"-প্রবন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন তার তলায় তলায় যে এই কথাগুলিই তাঁকেও অনবরত খোঁচা মারিতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তবু সাহিত্যের প্রকৃতি বিচারে যে এই সব কথা একেবারে অবান্তর, রসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ সে কথাটা নিজের কাছে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—'সাহিত্যে যৌন-সমস্যা নিয়ে তর্ক উঠেছে, সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক দিয়ে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে।' এই প্রথম স্বীকার্য্য ধরিয়া লইয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে' তাহা কলারস-বিরুদ্ধ। কবিবরের এই সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সহিত আলোচনার যোগ্য।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, শ্রদ্ধেয় লেখক তাঁর এ-সিদ্ধান্ত যুক্তির উপর নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র একটা শ্রেণীবদ্ধ কাব্যস্তূপের উপর বসাইয়া দিয়াছেন এমনভাবে, যে পড়িয়া মনে হয় তাঁর পূর্ব্বের কথাগুলি যুক্তি, কিন্তু হাত্‌ড়াইয়া দেখিতে গেলে ধরিবার ছুঁইবার মত কিছুই পাওয়া যায় না। যুক্তির একটা পাকা জবাব যুক্তি দিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু কাব্যের উত্তরে যুক্তির বাণ কেবলি একটা ধোঁয়ার মধ্যে ঘুরিয়া মরে, কোনও কঠিন লক্ষ্যের সন্ধান পায় না। তা'ছাড়া সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া কবিবর এই যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন তাহার বিষয়বস্তু ঠিক নির্দিষ্ট করিবার কোনও চেষ্টা তিনি করেন নাই। 'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে বে-আব্রুতা এসেছে' তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে? সমস্ত আধুনিক সাহিত্য ইহার লক্ষ্য বস্তু হইতেই পারে না, কেননা যে-সাহিত্যের ভিতর শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মতন খড়্গহস্ত শুচিধর্মী সাহিত্যিকও আছেন, তাহা আদ্যোপান্ত এই অভিযোগের বিষয় হইতে পারে না। 'বিদেশের আমদানী' কথাটায়ও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা কেবল কয়েকখানি অনুবাদগ্রন্থ ছাড়া কোনও গ্রন্থের লেখকই তাঁদের বই বিদেশের আমদানী বলিয়া প্রচার করেন নাই, এবং এমন অনেকে আছেন যাঁরা তাঁদের লেখা সম্পূর্ণরূপে এই দেশের জল-মাটির উপর

প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করেন,—যাঁদের হয়তো কবি এই সমালোচনার বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন না। তা'ছাড়া 'বিদেশের আমদানী' কথাটা পরিচয়হিসাবে কোনও নির্দ্দেশই দেয় না,—কেননা এক হিসাবে রাজা রামমোহনের পরবর্তী সমস্ত সাহিত্যই অল্পবিস্তর বিলাতের আমদানী। বিদেশী কবিতার রসাস্বাদে যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার রসাস্বাদই অসম্ভব, এ-কথা হয়তো কবির কোনো ভক্তই অস্বীকার করিবেন না।

'বে-আব্রুতা' এবং যৌন-সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াও কবি বিষয়-নির্ণয় সুকর করেন নাই। কেননা যৌন-সম্বন্ধের আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যেই অল্পবিস্তর হইয়াছে—হয়তো সব চেয়ে বেশী হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিজের বিরাট গ্রন্থাবলীতে। সেই আলোচনার ভিতর কতটা যে আব্রু-যুক্ত আর কোনটা যে বে-আব্রু এ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। বে-আব্রু কাহাকে বলে এ-সম্বন্ধে মত ও রুচির ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিতর তো আছেই, একই যুগে ও দেশে বিভিন্ন মানুষের ভিতরও আছে। মুসলমানদের কাছে যে-নারী একেবারে বে-আব্রু, বিলাতে সে অত্যধিক আবৃত বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর আমাদের দেশে যাঁরা সেমিজবিহীন সূক্ষ্ম-সাড়ী-পরিহিতা নারীর দিকে চাহিতে কোনও সঙ্কোচ বোধ করেন না, তেমন অনেক পুরুষকে আধুনিক ইংরাজমহিলার পরিচ্ছদের বে-আব্রুতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে শুনিয়াছি।

সাহিত্যের বে-আব্রুতার সম্বন্ধেও তেমনি কোনও নিত্য বা সনাতন মাপকাটি নাই, এমন কিছুই নাই যাহার দ্বারা আব্রুতার ও বে-আব্রুর মধ্যে একটা খুব সুনির্দিষ্ট সীমানা টানিয়া দেওয়া যাইতে পারে। 'চোখের বালি'র অনেকগুলি দৃশ্য অনেকের মতে অতিরিক্ত বে-আব্রু। 'ঘরে-বাইরে'র অনেকটা তো বটেই। অথচ আমরা তা' মনে করি না এবং সম্ভবত কবীন্দ্রও তাহা মনে করেন না। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' কিম্বা 'চরিত্রহীন' কি এই বে-আব্রুর অন্তর্ভুক্ত? এ-বিষয়ে কবিবর আমাদিগকে কোনও অভ্রান্ত নির্দেশ দেন নাই। কবির কতক কথায় মনে হয় যে, যতক্ষণ লেখক কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করেন, ততক্ষণ তিনি শীলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়া দেহ লইয়া টানাটানি করেন তখনই তিনি বে-আব্রু। কিন্তু তাহাতেও কথাটা স্পষ্ট হয় না। শারীর-ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সাহিত্যসম্রাট। আলিঙ্গনও

চলিয়া গিয়াছে। তা'ছাড়া "হৃদয়-যমুনা", "স্তন", "বিজয়িনী", "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও একটা সীমারেখা আছে, যাহা অতিক্রম করিলেই সাহিত্য বে-আব্রু পদবাচ্য হইতে পারে। সে সীমারেখা কবি কোথায় টানিয়াছেন, তার বাহিরে কোন বই, ভিতরেই বা কোন বই,—তাহা নির্ণয় করিবার কোনও নির্দেশই কবি দেন নাই।

কাজেই কবির এই সিদ্ধান্ত আলোচনা করা অত্যন্ত দুরূহ। বর্তমান বাঙ্‌লা-সাহিত্যে এমন কতকগুলি বই অবশ্যই জন্মিয়াছে যার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে বলা যায় যে, তাহা একটা শারীর-ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির সেবা করিয়াছে মাত্র, তাহা লইয়া কোনও রস উদ্বোধন করে নাই। কেবল সেই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধেই কবির এই উক্তি প্রযুজ্য এ-কথা যদি নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যাইত তবে তাঁহার এ সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে কোনও আপত্তিই উঠিতে পারিত না। কিন্তু সাহিত্যের এই অকিঞ্চিৎকর আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য কবিবর তাঁর অপরিমেয় শক্তি নিযুক্ত করিয়াছেন এ-কথা মনে করা কঠিন,—কেননা এই সব বইয়ের সংখ্যা হয়তো খুব বেশী নয় এবং সেগুলি সাহিত্যের বাজারে রদী-মাল বলিয়া সুপরিচিত। তা'ছাড়া কবির লিখনভঙ্গী ও তাঁর যুক্তিতর্কের স্বরূপ হইতে মনে হয় যে তাঁর লক্ষিত বস্তু ইহার চেয়ে অধিক ব্যাপক।

রবীন্দ্রনাথ যৌন-মিলন ব্যাপারটার দুইটি স্বতন্ত্র দিকের উল্লেখ করিয়াছেন—প্রথম প্রজনার্থ মিলন, দ্বিতীয় প্রেম। এক দিক ইহার দৈহিক ব্যাপার, অপর ভাগ মানসিক বা আধ্যাত্মিক—এইরূপে তাঁর বক্তব্যের অনুবাদ করিলে বোধ হয় ভুল করা হইবে না। দৈহিক সম্বন্ধের দিকটার বিষয়ে তাঁর মত এই যে, 'রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা, সেখানে এর (বিজ্ঞানের) সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।' এই কথাটা পরবর্তী কথার সঙ্গে সমন্বয় করিলে তাঁর সিদ্ধান্তটা এই বলিয়া মনে হয় যে, যৌন-মিলনের এই দিকটা লইয়া যে-সাহিত্য আলোচনা করে সেইটাই 'বিদেশের আম্‌দানী বে-আব্রুতা' এবং তার উপরই তিনি কশাঘাত করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের লেখার ভিতর খুব একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত কোনও খানেই সাদা কথায় লেখা হয় নাই—সাদা কথাটা কাব্যরস ও বাক্যালঙ্কারের নিপুণ রমণীয় অরণ্যের মাঝখানে যত্নে সংগুপ্ত আছে—কেবল অলঙ্কারের ইঙ্গিত দিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। কাজেই ঠিক তাঁর কি অভিপ্রায় তাহা তাঁর কোনও বিশিষ্ট উক্তির দ্বারা নিশ্চয়রূপে নিরূপণ অসম্ভব। কিন্তু আমি যতদূর

বুঝিয়াছি, তাহাতে কবিবর তাঁর ভাষা ও অলঙ্কারের ইঙ্গিতে এই তথ্যই লক্ষিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

এই তথ্য কবিবর কোনও সুনিবদ্ধ যুক্তিমালার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, কেবল যুক্তির ইঙ্গিত করিয়াছেন কতকগুলি রূপক দ্বারা। সেই রূপকমালা যে যুক্তির স্থান লইতে পারে না তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইব। তিনি সত্য ও সার্থকের মধ্যে যে ভেদ অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করিয়াছেন তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বলিয়াছেন,—'যে জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিষই সার্থক। এক টুক্‌রো কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত (ইহা কি 'সার্থকে'র সঙ্গে একার্থবোধক?) অথচ কাঁকর পদে পদে ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে প'ড়লে তাকে ভোল্‌বার জন্যে বৈদ্য ডাক্‌তে হয়, ভাতে প'ড়লে দাঁতগুলো আঁৎকে ওঠে; তবু তা'র সত্যের পূর্ণতা আমার কাছে নেই। পদ্ম কনুই দিয়ে বা কটাক্ষ দিয়ে ঠেলাঠেলির উপদ্রব একটুও করে না, তবু আমার সমস্ত মন তাকে আপনি এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করে।'

পদ্ম ও কাঁকরের এ দৃষ্টান্ত যুক্তিও নয়, নৈয়ায়িকের দৃষ্টান্তও নয়। সে মাপে ওজন করিতে গেলে ইহার ভিতর এতগুলি ফাঁক ধরা যায় যে নৈয়ায়িক এ-দৃষ্টান্ত বা যুক্তিকে কোনও মতেই স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এ তো যুক্তি নয়, এ একটা রসচিত্র। যে-সত্যটা কবি প্রথমে প্রস্তাব করিয়াছেন ঠিক সেইটাই এই রসচিত্র দিয়া প্রকট করিয়াছেন। সত্য ইহার মধ্যে লজিকের সূত্রে নাই, আছে কবির অনুভূতিতে।

প্রথমতঃ, পদ্মের সার্থকতা ও কাঁকরের অসার্থকতা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবু একের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি অপরের মধ্যে তাকে দেখি না ইহাই যে তাদের মধ্যে প্রকৃত সার্থক প্রভেদ, তার কোনও হেতুই আমরা পাই না। এ-কথা খুব যুক্তির সঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ইহাদের প্রকৃত প্রভেদ এই যে, পদ্ম আমাদের আনন্দ দেয়—আমাদের রূপবোধকে পরিতৃপ্ত করিয়া, আর কাঁকর আমাদের পীড়া দেয়; সম্পূর্ণের প্রকাশ বা অপ্রকাশ এ-বিষয়ে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। তা'ছাড়া পদ্মের মধ্যেই যে সম্পূর্ণের প্রকাশ আছে, কাঁকরের মধ্যে তা' কখনই থাকিতে পারে না, এ-কথাও তো চিরন্তন সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সমস্ত বিশ্বকে যে-দৃষ্টিতে আয়ত্ত করা যায়, সে-দৃষ্টির সম্মুখে কাঁকরও নিরর্থক নয়, তার স্থানে সে সার্থক,—আর সেই সার্থকতায় তার রসরূপের কল্পনা একেবারেই অসম্ভব নয়। যে ব্যক্তি এই বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কাঁকরকে—sub-

specie aeternitatis—দেখিতে পারিয়াছে সে তার সার্থকতা লইয়া রসরচনা অনায়াসে করিতে পারে—তার কাছে তো কাঁকর অসার্থক নয়, তার কাছে কাঁকরের সত্যের পূর্ণতা প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং নৈয়ায়িকের কথায় বলিতে গেলে, এ-দৃষ্টান্ত এক দিকে অব্যাপ্তি, আর একদিকে অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। সজ্‌নে ফুল তার সৌন্দর্য্য সত্বেও, কবির কথায়,—'ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্ব্বতায় কবির কাছেও আপনার যাথার্থ্য হারাল।' তেমনি বকফুল প্রভৃতি সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—'রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে।' পক্ষান্তরে, 'সকল ব্যবহারের অতীত ব'লে মকর বেঁচে গেছে।' এই সব দৃষ্টান্তদ্বারা কবি এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন যে,—'যে জিনিষটা কাজে খাটাই তাকে যথার্থ করে দেখিনে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়।'

এ-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আপত্তি করিবার বহু হেতু আছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে দৃষ্টান্তের সম্বন্ধ যদি আমরা ন্যায়ের মাপকাঠি দিয়া যাচাই করিতে যাই তবে ইহা একদণ্ডও টিকিবে না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে দৃষ্টান্তগুলি অনিন্দনীয়, তবু, ন্যায়ের বিধানে, কেবল পাঁচটা অনুকূল দৃষ্টান্ত দিলেই কোনও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না; দৃষ্টান্তগুলি সমস্ত অভিজ্ঞতার ব্যাপক হওয়া চাই—আর একশত অনুকূল দৃষ্টান্ত একটা বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তে বিপর্য্যস্ত হয়। অথচ এখানে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত যে অনেকগুলি আছে তাহা কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন;—তিনি মানিয়াছেন যে 'যে-কবির সাহস আছে, সুন্দরের সমাজে তিনি জাত বিচার করেন না।' যে সজ্‌নে ফুলের দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন তাহাই অন্ততঃ তাঁর নিজের কাছে সার্থক হইয়া উঠিয়া তাঁর কাব্যে স্থান পাইয়াছে, আর 'বিচিত্রা'র শ্রাবণের সংখ্যাতেই তেমনি কুরুচি ফুল তাঁর কাছে সার্থক হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে বিম্বফল কবির কাছে পরম সার্থক, কবি হয় তো জানেন না, তাহাও লোকে কাজে লাগাইয়া থাকে, এবং কোথাও কোথাও তাহার তরকারীও খাইয়া থাকে। তাঁর মত সাহসিক কবি ছাড়া অন্যেও, মানুষের কাজে খুব বেশী খাটে যে গরু ঘোড়া, তাহা লইয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মকর যদি দেবীর বাহন হইয়া সার্থক হইয়া থাকে, তবে গরু কি দেবী হইয়াও সার্থক হয় নাই?—অথচ ছেলেবেলায় গরুর রচনায় কে না প্রথমেই লিখিয়াছে 'গরু অতি উপকারী জন্তু'?

তেমনি পুরুষের জীবনে পত্নীকে অকেজো বলিয়া কেউ উপেক্ষা করিবেন না—অথচ সেই যে কাজের মানুষ পত্নী, তিনিও অনেক কবির কাছে কাব্যহিসাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছেন।

যাহা প্রয়োজনে লাগে তাই যে কাব্য-হিসাবে অসার্থক, আর যাহা নিষ্প্রয়োজন তাই সার্থক নয়, এ কথা সত্য নহে, আর ইহার পক্ষে প্রকৃত কোনও যুক্তি নাই। কবির কাছে কোন্ জিনিষটা সার্থক, কোন্‌টা অসার্থক তার একমাত্র নির্ণায়ক সেই বিশিষ্ট কবির রস-বোধ। যাহা সেই রস-বোধকে উদ্বুদ্ধ করে তাহাই সার্থক, যাহা তা' করে না তাহা অসার্থক। এই যে রস-বোধের উপর ঘা দেওয়া, সেটা কতকটা নির্ভর করে বস্তুর স্বরূপের উপর, আর কতকটা নির্ভর করে সেই বিশিষ্ট কবির বিচিত্র চিত্তগঠনের উপর। এ কথা সত্য যে, যে-জিনিষের সঙ্গে আমাদের হামেষা পরিচয় হয় এবং যাহা আমাদের চিত্তে অন্য বিশিষ্ট প্রয়োজনদ্বারে নিয়ত প্রবেশ করে, তার প্রতি অনেক সময় আমাদের রসবোধ সাড়াহীন হইয়া পড়ে, আর যে-জিনিষ সদাসর্বদা আমাদের ঘিরিয়া থাকে না, তফাৎ হইয়া কেবলমাত্র রস-বোধের দ্বারপথেই প্রবেশ লাভ করে, তাহার আঘাতে মনটা চট্ করিয়া সাড়া দেয়। এই প্রভেদের কারণ ইহা নয় যে, একটা প্রয়োজন ও আর একটা অপ্রয়োজন,—ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, একটা অতিপরিচিত ও আর একটা অনতিপরিচিত। অনতিপরিচিতের একটা প্রবল আকর্ষণ মানুষের চিত্তের সব দিকেই দেখা যায়।

অতএব কবিবরের রসাবৃত যুক্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের চেষ্টা না করিয়া তাঁর প্রতিপাদ্যটিকে মোটামুটি আলোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। তাঁর মতে যাহা সত্য তাই সার্থক নয়, আর কাব্যের প্রকৃত প্রয়োজন সত্যমাত্র লইয়া নয়, যাহা রসের দিক হইতে সার্থক তাহাই লইয়া। যাহা আমাদের প্রয়োজন, সাধারণতঃ তাহা রসের দিক হইতে সম্পূর্ণ অসার্থক।

স্ত্রীপুরুষের মিলনের দুইটি দিক আছে—একটি পশুভাবে, আর একটি মানুষ-ভাবে—প্রেমের ভাবে। প্রথমটির প্রয়োজন যথেষ্ট আছে, তাহার সত্যতাও অবিসম্বাদিত, কিন্তু তাহা রসহিসাবে অসার্থক। শুধু প্রেম—অর্থাৎ যৌনসম্বন্ধের মানসিক স্বরূপটাই—রসবিচারে সার্থক হয় বা হইতে পারে। প্রেমের ভিতর একটা আব্রু আছে কাজেই সেই আব্রুটা ভেদ করিয়া যৌনমিলনের পশুভাবের আলোচনা সাহিত্যে নিত্যবস্তু হইতে পারে না, ঠিক যেমন ভোজন-ব্যাপার লইয়া রসোদ্বোধনের চেষ্টা ক্ষণিক আমোদ সৃষ্টি করিলেও কোনও নিত্যবস্তু হইতে পারে না। সুতরাং কবিবরের সিদ্ধান্ত এই যে, বিদেশের আমদানী যে বে-আব্রুতা আজকাল সাহিত্যে দেখা দিয়াছে তাহা নিত্য নয়, নিত্য হইতে পারে না।

এই যুক্তির ধারার মধ্যে অনেকগুলি ফাঁক আছে। প্রথমতঃ প্রয়োজন

অপ্রয়োজন দিয়া কাব্যহিসাবে সার্থকতা অসার্থকতার নির্ণয় হয় না—একথা আমি পূর্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ যৌনসম্বন্ধের যে দিকটা পশুধর্ম বলিয়া তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা যে রসের বিচারে চিরকালই অসার্থক এ-কথা ঠিক নয়। কবির কাব্য চিরদিনই কেবল মানসিক প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দৈহিক ব্যাপারে আপনার সার্থকতা খুঁজিয়াছে; চুম্বন আলিঙ্গন ছাড়িয়া খুব কম কাব্যই প্রেমের চিত্ররচনায় সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তা' ছাড়া কালিদাস তাঁর মেঘদুতে বা ঋতুসংহারে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তাঁদের পদাবলীতে সম্ভোগের যে বিচিত্র রসচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কোনও কাব্যামোদীই আজ বাতিল করিতে প্রস্তুত হইবেন না।

কাব্যের মধ্যে দেহের গন্ধ থাকিলেই তাহা কাব্যের 'নিত্য'-রসে বঞ্চিত হইবে একথা যে সত্য নহে তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় আছে। অথচ কেবলমাত্র যৌনসম্বন্ধের শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া পাঠকের চিত্তের রিরংসার উপর বাণিজ্য করা যে নিত্য অনিত্য কোনও রূপ রসই নয় তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং আসল কথা—এই দুইয়ের ভিতর সীমা-নির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ যে কোথায় সীমারেখা টানিতে চান তাহা ঠিক বুঝা গেল না। কিন্তু এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই যৌনসম্বন্ধের দৈহিক ও মানসিক গোটা স্বরূপটা লইয়া ইহার কোনও একটা নির্দিষ্ট স্থানেই অভ্রান্তভাবে চিরকালের তরে সীমারেখা টানিয়া দেওয়া যায় না। যে ব্যাপারটার রসহিসাবে কোনও সার্থকতা নাই বলিয়া এক কবি তাহাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন, আর এক কবি তাহা লইয়াই অপূর্ব রস রচনা করিয়াছেন। যৌনমিলনের যে ভাগটা রসহিসাবে অসার্থক বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নামঞ্জুর করিয়াছেন, Theophile Gautier ও Maxim Gorky সেই ব্যাপার লইয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাকে সামাজিক শীলতার দিক হইতে যাহাই বলিবার থাকুক, রসহিসাবে তার ঐশ্বর্য্য কেহ অস্বীকার করিবেন না। কালিদাস ও বৈষ্ণব কবিদের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এ-কথা যদি সত্য হয় যে, 'সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে, সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে,'—তবে এই সব যে রসোদ্বোধন ব্যাপারে একেবারে চিরকাল অপাংক্তেয় থাকিবেই এ-কথা সত্য নয়।

যাহা রসরচনা এবং যাহা কেবলমাত্র কদর্য্য ইন্দ্রিয়বিলাস তার মধ্যে প্রকৃত সীমা নির্দেশ যৌনমিলন ব্যাপারটার অঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ভিতর একটা লাইন টানিয়া করা যায় না। প্রভেদটা বাহিরের নয় ভিতরের। নগ্ন নারী-মূর্তি

মনোহর রসমূর্তি হইতে পারে, আবার কদর্য্য অশ্লীলতা হইতে পারে। Venus of Milo দেখিয়া অশ্লীলতার কথা বলিবে এমন মূঢ় কম আছে। অথচ ইহা অপেক্ষা অধিক আবৃত নারীমূর্তিও কদর্য্য বলিয়া হেয় হইতে পারে। দুই-এর মধ্যে কার ভিতর আবরণ কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা ইহাদের ভেদের কারণ নয়, ইহাদের ভেদ ভাবের ভেদ। যাহা আমাদের রসবোধে সাড়া জাগায় সেটা আবৃত হউক, অনাবৃত হউক, তাহা আর্ট, আর যাহা রসবোধে সাড়া দেয় না, দিতে চায়ও না, কেবল মানুষের পশু-প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, তাহা আর্ট নয়। কি চিত্রে, কি গল্পে, কি কবিতায় আর্ট-হিসাবে ভাল মন্দের ইহা ছাড়া অন্য কোনও মান নাই। এই যে প্রভেদ ইহা একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ, যাহার স্বরূপ প্রত্যেক রসজ্ঞ স্বীকার করিবেন, কিন্তু অরসিককে অন্য কোনও বাহ্য লক্ষণ দিয়া বুঝাইবার কোনও উপায়ই নাই।

এই কথা রবীন্দ্রনাথ নিজে বহুবার বলিয়া থাকিবেন, এবং আজও যে তিনি ইহা ছাড়া অন্য কিছু বলিতে চান তাহা আমি মনে করি না। কিন্তু ইহাই যদি সত্য হয়, তবে তিনি আব্রু ও বে-আব্রুর ভিতর যে বাহ্য ভেদ স্বীকার করিয়া একের রসের নিত্যতা ও অপরের রসবিচারে অসার্থকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টা একেবারেই অসার্থক।

ইংলণ্ডের সাহিত্য ভিক্টোরীয়-যুগে চারিদিকে সম্ভ্রম বাঁচাইয়া আব্রু রক্ষা করিয়া রস-রচনার আয়োজন হইয়াছিল। সে সাহিত্য শ্লীলতার একটা বাহ্য সীমা স্বীকার করিয়া তার বাহিরের সব বস্তুকে রসরাজ্যের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল। সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফরাসী ও পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকগণ এই অপাংক্তেয় বিষয়গুলি হইতে অপূর্ব রসসৃষ্টি করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, রস-সাহিত্যের এমন কোনও বাহ্য সীমা বাঁধিয়া দেওয়া একেবারে অসম্ভব। ইহাদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃত রসস্রষ্টা তাঁরা যে সত্য সত্যই এই সব বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের রস-সৃষ্টির যথার্থ উপাদান আবিষ্কার ও সম্যক নিয়োগ করিয়াছেন অতি বড় শ্লীলতাবাদীও তাহা অস্বীকার করিবেন না। পক্ষান্তরে তাঁদের বিকৃত পদাঙ্কের অনুসরণে যে ইউরোপে বর্তমান যুগে অনেক স্থলে একটা নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতা, সাহিত্যের নামে বীভৎস অশ্লীলতা ও ব্যভিচার গজাইয়া উঠিয়াছে তাহাও কেহ অস্বীকার করিবেন না। এই সব অপসৃষ্টি ও প্রকৃত রসসৃষ্টির মধ্যে প্রভেদ কোনও বাহ্য সীমার নয়, প্রভেদ অন্তরের রসমূর্তির।

বঙ্গ-সাহিত্যেও এই নূতন প্রেরণার একটা প্রতিঘাত দেখা দিয়াছে এ-কথা

সত্য। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যে যে-প্রদেশ শিষ্ট-সাহিত্যের সীমাবহির্ভূত বলিয়া বর্জ্জিত ছিল, তার ভিতর প্রবেশ করিয়া একাধিক সাহিত্যিক নূতন রসসৃষ্টির আয়োজন করিয়াছেন। তা'র মধ্যে কতকটা যৌন-সম্বন্ধের পূর্ব্ব-নিষিদ্ধ দেশ হইতে সংগৃহীত। যাঁরা এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রকৃত রসসৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁদের সকল সৃষ্টিকে যদি রবীন্দ্রনাথ এই বাহ্য সীমানির্দ্দেশের দোহাই দিয়া অনিত্য বলিয়া ভাসাইয়া দিতে চান, তবে বিনীতভাবে নিবেদন করিতে হয় যে, তাঁর অশেষ প্রতিভা ও অতুলনীয় শক্তি সত্ত্বেও তাঁর এই নিষ্পত্তি চরম বলিয়া মানিয়া লইতে আমি অসমর্থ। চলিত যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে এমন বিচার কোনও কালেই কেহ ষোল আনা অভ্রান্তভাবে করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথের এ-সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত না হইতে পারে। আজ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে স্থান, ইংরাজী সাহিত্যে একদিন জন্‌সন্ সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে জন্‌সনের মতামত ইতিহাস অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের এ-মতও তেমনই একটা প্রকাণ্ড প্রতিভার একটা ব্যর্থ চেষ্টার পরিচয়রূপে ইতিহাসে স্থান পাওয়া অসম্ভব নয়।

রসসৃষ্টির মধ্যে কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তাহা তার বিষয় লইয়া বা অন্য কোনও উপায়েই অভ্রান্তভাবে নির্দ্দেশ করা যায় না। ঈশ্বরগুপ্তের পাঁটা ও তপ্‌সী মাছের কবিতা আজ আর চলে না, বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল স্থানগুলিও অচল হইয়াছে,—সে যে তা'দের বিষয় নির্ব্বাচনের দোষে এ-কথা বলিলে অন্যায় হইবে। **Lamb**-এর **Roast Pig** সাহিত্যের একটা স্থায়ী সম্পদ, কালিদাসের মেঘদূত বা ঋতুসংহারে কিম্বা বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসে যদি কোনও রুচিবাগীশ অশ্লীল স্থান ছাঁটিয়া ফেলিতে চান, তা'তে রস-জগতের একটা স্থায়ী ক্ষতি হইবে। একটা জিনিষ যে চলে নাই মরিয়া গিয়াছে তাহাতেই তার বিষয়-বস্তুর অসার্থকতা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের অনেক কবিতাই এখন চল্‌তির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, যদিও আমাদের যৌবনকালে সেইগুলির চল্‌তি সব চেয়ে বেশী ছিল। তাহা হইতে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তার বিষয়বস্তু রস-হিসাবে অচল—ইহাও বলা যায় না যে, সে-কবিতা বা গানগুলিও সত্য সত্যই সার্থক রসরচনা নয়।

আর দুইটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। নূতন সাহিত্যকে 'বিদেশের আম্‌দানী' বলিয়া কবিবর কটাক্ষ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ-কথা লইয়া কটাক্ষপাতের প্রত্যাশা করি নাই। আলো যদি আমার অন্তরে

আসিয়া থাকে, তাহা কোন জানালা দিয়া আসিয়াছে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, যদি সে আলো সত্য সত্যই আমার অন্তরের ভিতরকার মণিরত্ন উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। আকাশের আলো আরসী হইতে শুধু প্রতিফলিত হয়—এখানে আলোর যে প্রকাশ তার ভিতর আরসীর কোনও কৃতিত্ব নাই। কিন্তু সেই আলোয় যখন সরোবরে পদ্ম ফুটিয়া ওঠে তখন কেহ পদ্মকে এ-কথা বলিয়া নিগ্রহ করে না যে, তোমার ফোটাটা ধার করা। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে অনেকটারই উদ্দীপনা আসিয়াছে পশ্চিমের সাহিত্য ও সমাজ হইতে। টম্‌সন্‌-সাহেব এই সত্য কথাটা বলিতে গিয়া একটা বাজে ও অসত্য বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, 'রাজা ও রাণী' Doll's House-এর ছায়ায় রচিত। ইহাতে শ্রীযুক্ত বাণী-বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে তাঁকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্রভাবে Ibsen বা Maeterlinck-এর প্রভাব যে তাঁর লেখায় আসিয়াছে সে-বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ কি বলিবেন জানি না, অন্ততঃ কবি স্বয়ং তাহা অস্বীকার করিবেন না। তেমনি আরও অনেক লেখকের লেখাই তাঁর অন্তরের পদ্মকোরকে আঘাত করিয়াছে; তবে তিনি তাঁর গৃহীত আলোক শুধু ফিরাইয়া দেন নাই, আলো গিয়া তাঁর অন্তরে রূপের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই বিলাতী বা অন্য যে প্রভাবই তাঁর ভিতর থাকুক্ তা'তে তাঁর গৌরবহানি হয় নাই।

যে সাহিত্যকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই সমরাভিযান, তাহাকে তিনি কেবল এক কথায় বিলাতের আম্‌দানী বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। বিলাতী আধুনিক সাহিত্যের প্রভাব তার উপর আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা যে আগাগোড়া শুধু বিলাতীর পুনরুদ্গীরণ এমন কথা কিছুতেই সত্য বলিয়া মানা যায় না। এই সাহিত্যের মধ্যে এমন অনেক লেখাই আছে যাহা নিঃশেষে দেশের জীবন ও সমাজের সত্য স্বরূপের রসমূর্তি—যা'কে বিলাতের আম্‌দানী বলা একটা নিষ্ঠুর পরিহাস। যদি রবীন্দ্রনাথ নাম গোত্র দিয়া তাঁর লক্ষিত বিষয়ের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেন, তবে তাঁর এ-কথার ভিতর যে অবিচার আছে তাহা দেখান যাইতে পারিত।

তা' ছাড়া এ-সাহিত্যের সম্বন্ধে তিনি এমন কথা বলিয়াছেন যাহা হইতে অনুমান হয় যে, এ-সাহিত্য কতকগুলি বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত সত্যকে আশ্রয় করিয়া, কোনও রূপরসের বিচার না করিয়া, বিজ্ঞানের সত্যকে সাহিত্যে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে। এ-কথা আমরা আগে অন্য লোকের মুখে শুনিয়াছি। এবং যখনই

শুনিয়াছি তখনই বক্তাকে জেরা করিয়া জানিয়াছি যে, এ-কথা বলিবার কোনও উপযুক্ত ভিত্তি নাই।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি যে, একটি বক্তা, আমার উপন্যাসগুলি Criminology-র উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁর কথাটার ভিত্তি শুধু এইটুকু যে, আমার একখানি উপন্যাসে Criminology-র নামটা উল্লেখ আছে, এবং সেই উপন্যাসে একটি নারীর চরিত্র সম্বন্ধে Criminology-ঘটিত একটু আলোচনা আছে। বলা বাহুল্য যে আমার বইখানার নায়িকা সে-নারী নয়—সে কেবল নায়কের চরিত্র-বিকাশের একটা উপায় মাত্র—অন্যথা সম্পূর্ণ অবান্তর, এবং সেই নারীর চিত্তের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া প্রকাশ করিবার কোনও চেষ্টাই আমি সে-গ্রন্থে করি নাই। সুতরাং আমার সে-বই যে Criminology-র দোহাই দিয়া উক্ত বিজ্ঞানের নিরূপিত সত্যের ভিত্তির উপর লেখা এ-কথার কোনও ভিত্তিই নাই। এবং বলা বাহুল্য আমার অপর কোনও লেখাতেই Criminology-র গন্ধ মাত্রও নাই। তবু সেই বক্তা সাধারণভাবে আমার লেখার উপর এই রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আমার বইগুলি প্রধানতঃ Criminology-র উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ যে-উক্তি করিয়াছেন তাহা ব্যাপকতা হিসাবে ইহা অপেক্ষাও বিস্তৃত। ইহার যদি নামরূপ সম্বন্ধে পরিচয় তিনি দিতেন, তবে বোধ হয় ইহা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইত না যে, এ-কথারও ভিত্তি অতি ক্ষীণ ও অনিশ্চিত।

বাস্তবিক বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যে যে-সব অসাধারণ চরিত্রের অসাধারণ কার্য-কলাপ লইয়া কথা লেখা হইয়াছে, তাদের কোনও এক-আধটা সম্বন্ধে হয় তো একথা বলা চলিলেও, সাধারণভাবে তাদের সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না যে, সেগুলি কোনও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি সত্যের উপাদান লইয়া লেখা। যে-সব লেখা সাহিত্যপদবাচ্য, তার সম্বন্ধে সাধারণভাবে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, সেগুলি বিজ্ঞানের বই হইতে উপাদান কুড়াইয়া লেখা নয়, জীবনের প্রত্যক্ষ দর্শন ও আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ-কথা যিনি অস্বীকার করিতে চান, নির্দিষ্ট বিষয় হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া যদি তিনি তাঁর কথা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন, তবে তার সম্যক উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত।

তা' ছাড়া হট্টগোলের তলায় এ-দেশে হাটের যে একেবারে কোনও চিহ্নই নাই—এ-কথা কবি যেরূপ নিশ্চয়তার সহিত বলিয়াছেন, আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, তাঁর সে নিশ্চয়তার কোনও হেতু নাই। হইতে পারে হাটের খবর তাঁর

দীর্ঘ প্রবাস ও নির্জ্জন-নিবাসের আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার কাছে পৌঁছায় নাই, এবং হাটে এমন গণ্ডগোল এখনও জন্মায় নাই যা'তে তাঁর বিদেশের হাটে অভ্যস্ত কর্ণে কোনও সাড়া দিতে পারে, কিন্তু হাট জমিবার একটু চেষ্টা না হইতেছে এমন নয়।

তা' ছাড়া হাট জমিবার আগে হট্টগোল সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক বার শোনা গিয়াছে। রুশো ও ভল্‌টেয়ার লিখিয়াছিলেন বলিয়াই ফরাসী-বিপ্লবের হাট জমিয়াছিল। এবং আজ বিশ্বব্যাপী ভাব-বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি কি? যে-হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে তাতে আমার সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচ্যবাসীর চেয়ে কম নয়।

'বিচিত্রা' : ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ ৩৮৩-৩৯০

সাহিত্যে দলাদলি

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে বেশ একটা ঝগড়া বেধেছে দেখে এলাম। দুই দলেই অস্ত্র-শস্ত্র শাণ দিচ্ছে। নতুন নতুন মাসিক পত্রিকা রেজেষ্টারী হচ্ছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ যে পত্রিকাটি বঙ্গ-সাহিত্যের মুখপত্র ছাড়া অন্য কোন দলের মুখপত্র নয়। কিন্তু প্রবন্ধগুলি পড়্‌লে তা মনে হয় না। সাহিত্য ব্যবসায় অন্য ব্যবসায়েরই মতন, অর্থাৎ সত্য গোপনেই লাভ হয়, সত্য কথা চেঁচিয়ে বোল্লে ক্ষতি হয়। সেই জন্য লাভের দিকে নজর রেখে কোন কোন মাসিক পত্রিকা নরম-পন্থী হয়ে পড়েছেন। জন কয়েক ডাকাবুকো অপরিণামদর্শী যুবক ক্ষতি স্বীকার করবার জন্যই তাল ঠুকছেন। একজন যুবক একটি আদি-রসাত্মক কবিতা কিম্বা গল্প লিখে একটি পত্রিকার জন্য পাঠালেন। সেটি মনোনীত হল না, অমনি সেই যুবকটি বন্ধুমহলে চাঁদার খাতা বাহির কোরলেন, কিম্বা কোন ধনী ব্যক্তির শরণাপন্ন হলেন। ধনী ব্যক্তিটিও কবিযশঃপ্রার্থী অন্ততঃ সাহিত্য-প্রতিপালক নাম কেনবার জন্য ব্যস্ত। তিনিও টাকা দিলেন, কাগজ বেরুল। সে কাগজের চারিধারে জন কয়েক নবীন লেখক জুটে গেল। কাগজটি হল তরুণ সম্প্রদায়ের মুখপত্র—তরুণের কাঁচা লেখাই ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ধারা বোলে প্রমাণিত হল। অন্য ধারে পুরাতন মাসিক পত্রিকার সম্পাদকেরা আর নব্য সাহিত্যিকের লেখা পান না—তাই তরুণের প্রত্যেক লেখাই কাঁচা হল। অমনি জোড়াসাঁকোতে কবির ও অবনীবাবুর বাড়ী কিম্বা বালীগঞ্জে প্রমথ চৌধুরীর বাড়ী ছোটা আরম্ভ হল। কে আগে ছুটতে পারে! যে সম্পাদক তাঁদের লেখা যোগাড় কোরতে পারলেন তিনি এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ কোরলেন যে তাঁর কাগজেই সত্যকারের সাহিত্যসাধনা হয়। অথচ কেউ ভেবে দেখলেন না যে রবিবাবু, অবনীবাবু ও প্রমথ চৌধুরীর মতন মনে তরুণ ছোকরাদের মধ্যে কেউ নেই, এবং ছোকরাদের মধ্যেও একের অধিক সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছে যাঁদের লেখা পড়লে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হবার কারণ পাওয়া যায় না।

লোকে বোলছে যে কল্লোল কালিকলম ও নবপ্রসূত ঢাকার প্রগতির সঙ্গে অন্যান্য মাসিক পত্রিকার আদর্শগত পার্থক্য আছে। পার্থক্য যে কোথায় এখনও

বুঝতে পারি নি। সব পত্রিকাতেই সব রকমের গল্প কবিতা বেরিয়েছে। শরৎবাবুকে-সকলেই বঙ্গসরস্বতীর বয়াটে ছেলে বোলেই জানে। তিনি এক প্রবাসী ছাড়া অন্য সব পত্রিকাতেই লিখেছেন। নরেশ সেনগুপ্ত মহাশয়ের লেখাও সর্বত্র সমাদৃত হচ্ছে। শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্তের গল্প, কাজী নজরুল, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের কবিতাও অনেক পত্রিকায় পড়েছি বোলে মনে হয়, এবং তাঁদের লেখা ফেরত দেবার সাহস এক রামানন্দ বাবু ও প্রমথ বাবু ছাড়া অন্য কোন সম্পাদকের আছে বোলে মনে হয় না। সকলেই জানেন যে আদর্শতান্ত্রিক ও বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য বোলে কোন কথা নেই, সব তন্ত্রই সময়সাপেক্ষ। আজকের আদর্শ, পরস্পর জীবনানুভূতি। সাহিত্য নয় ভাল, নয় মন্দ, অর্থাৎ সাহিত্য হয় সাহিত্য, না হয় সাহিত্য নয়। তার মধ্যে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন সব কিছু আসতে পারে, কিন্তু অন্য কোন ধরণের সাহিত্য সম্ভব নয়। তবু ঝগড়া কেন?

ঝগড়ার গোড়ায় আছে একধারে ভয় এবং অন্যধারে অসহিষ্ণুতা। ভয় অন্নের, নামের, ক্ষমতার জন্য, অসহিষ্ণুতাও অন্নের, নামের ও ক্ষমতার জন্য। বাংলা দেশে যাঁরা চাকরী পান না, তাঁরা তাঁদের সুলভ অবসরে সাহিত্যের সেবা করেন এবং যাঁরা সরস্বতীর সেবা করেন তাঁরা লক্ষ্মীর কৃপাপাত্র নন্। বাংলা দেশে অনেক শিক্ষিত যুবক আছেন, যাঁরা চাকরী পান না অথচ সাহিত্যানুরাগী। তাঁরা যখন মাসিক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন, তখন সাহিত্য ব্যবসায়ে পরিণত হয়। পুরাতন সম্পাদকেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়ে ক্লিষ্ট হন। ব্যবসায়ে লাভালাভের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য, প্রত্যেক সম্প্রদায় এক একটি আদর্শ তৈরী করেন। তখন একটি আদর্শ অন্য আদর্শ থেকে বিভিন্ন হতে হতে বিপরীত হয়ে ওঠে। একটি আদর্শ হয় তরুণের, অন্যটি হয় বৃদ্ধের, একটি জীবনের, অন্যটি মৃত্যুর, একটি অতীতের, অন্যটি ভবিষ্যতের, একটির ভিত্তি প্রমাণ, অন্যটির নির্ম্মাণ, একটি অন্তর্মুখীন, অন্যটি বহির্মুখীন। এই রকম অভিধানে যতরকম বিরুদ্ধ, পরস্পর বিসংবাদী বৈলক্ষণ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে সবগুলিকে দুই ভাগে সাজান হয়। তার পর যার পয়সার জোর আছে সেই জেতে—অর্থাৎ সেই দলের পত্রিকা ও পুস্তক বিক্রী হয়, লেখকদের প্রতিপত্তি হয়, সুনাম হয়, অন্নচিন্তা দূরীভূত হয়। যে যাই বলুন কার্ল মার্কস্ সাহেব যে উপায়ে ইতিহাস ব্যাখ্যা কোরেছিলেন তার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত রয়েছে। তিনি যদি বলতেন, ভয়ের জন্য এবং ক্ষমতা রক্ষা এবং অর্জ্জন করার জন্য মানুষ আর্থিক উন্নতি চায়, তা হলে ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

*অনেকে হয় ত ভাববেন অর্থনীতি পড়িয়ে পড়িয়ে আমি একদেশদর্শী হয়ে

পড়েছি। তা নয়, ভেবে দেখেছি। যখন স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসা চলে গিয়েছে, সম্বন্ধটি শুধু সংসার নামক ব্যবসা চালাবার জন্য বজায় রাখা রয়েছে, তখন স্ত্রী-স্বাধীনতা, সাম্যবাদ প্রভৃতি বড় বড় কথার আড়ালে বৈষম্য লুকিয়ে রাখা হয়। এ যেন কোম্পানী ফেল হবার আগে মূলধন বাড়ান গোছের। আবার বেশ্যালয়ে যত মারামারি, ফৌজদারী মোকদ্দমা—কারণ প্রেমের ব্যবসা সেখানে চলছে। যখন এক ওস্তাদ অন্য ওস্তাদের স্বরভ্রষ্টতা ও মূর্খতা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন, এবং শিষ্যকে সম্বোধন ক'রে বলেন, 'বাপু হে, এ সব জিনিষ আমার ঘরেই পাবে, পাবার জন্য সাধনা চাই, বিশ বৎসরের কম সার্গমই হয় না, অন্য ওস্তাদের কাছে শিখতে পার, তবে গুরুর মতনই মূর্খ হবে।' তখন আমার মনে হয়, ওস্তাদপ্রবর যদি আদিল শাহ, সুলতান শাহ, বাহাদুর সাহের সময় জন্মগ্রহণ করতেন এবং রাজদরবারের বহুদূরের জায়গীরদার হতেন, তাহলে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বরগুলি অন্য ওস্তাদের কাছেও পাওয়া যেত এবং শিষ্যবৃন্দ দশ বৎসরের মধ্যেই ওস্তাদ হ'তে পারতেন। প্রফুল্ল ঠাকুর কিম্বা মুদালিয়র যদি সমবায় প্রাসাদে প্রদর্শনীর সব চিত্রই একই মূল্যে কিনে নিতেন, এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বড় ব্যারিষ্টারের দল কিম্বা বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ যদি হেমেন্দ্র মজুমদারের ছবি না কিনে অবনীবাবুর শিষ্যের ছবি কিনতেন, তা হলে বোধ হয় নব্য চিত্র-শিল্পীদের অঙ্কন-পদ্ধতি চমৎকার হ'ত, লাইনগুলিও শাস্ত্রসঙ্গত হ'ত, এমন কি মুখশ্রীও ফুটে উঠত, আঙ্গুল-গুলিও অত লম্বা থাকত না। প্রেম, সাহিত্য, ছবি, গান এমন কি অধ্যাপনা, গবেষণা পর্যন্ত পেশাদার সম্প্রদায়ের হাতে ব্যবসায়ে পরিণত হলে বিবাদের বিষয় হ'য়ে ওঠে।

কারণ দাসত্ব করা আর্টের কোষ্ঠীতে লেখে নি। জীবনের কোন প্রকার প্রয়োজনীয়তা, দেহরক্ষা, সমাজরক্ষা ধর্মরক্ষা আর্টের বিষয় নয়। আর্ট আপনাতে আপনি মশ্‌গুল। সেই জন্য আর্টের দল নেই, বাইরের কোনোপ্রকার উদ্দেশ্য নেই। সেই জন্য বোধ হয় আর্টিষ্টের কোন জাতি নেই, সম্প্রদায় নেই, ক্লাব নেই, সংসার নেই। সমাজ, ধর্ম, জাতি, দল সব মানুষকে সম্পূর্ণ করবার যন্ত্রতন্ত্র মাত্র। কিন্তু আর্টিষ্ট যেকালে সম্পূর্ণ মানুষ, মুক্ত পুরুষ, তখন বন্ধনগুলি তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। যখনই আর্ট স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ে পরধর্ম্ম অবলম্বন করে, তখনই বাধে গোলমাল। কল্লোল, কালিকলম, প্রগতির লেখকগণ যদি সমাজ-সংস্কারে অত বদ্ধপরিকর না হয়ে সত্যকারের সাহিত্য-সেবী হতেন, যদি অনুরূপা দেবী, যতীন্দ্রনাথ সিংহ, প্রভৃতি লেখকগণ হিন্দু-ধর্ম্মের ও সমাজের আদর্শ বজায় রাখবার জন্য অত ব্যগ্র না

হতেন, তা হলে বাংলা সাহিত্যের যথার্থই উপকার হত। অত দলাদলি মন কষাকষি, ব্যবসাদারী থাকত না। ভিতরের মনুষ্যত্ব নিয়ে ঝগড়া হয় না, হয় বাইরের আদর্শ নিয়ে, যে আদর্শের সঙ্গে প্রেরণার কোন সংস্রব নেই, যোগ নেই, নাড়ীর সম্বন্ধ নেই।

'উত্তরা' : ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ ৮৫৩-৮৫৫

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

কুরুক্ষেত্র-সমরে দ্রোণবধের পর অর্জ্জুন শোক, বিষাদ ও আত্মগ্লানিতে নিতান্ত মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে সাব্যস্ত করতে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। আমাদের বঙ্গসাহিত্য-রণক্ষেত্রের স্বয়ং-নির্ব্বাচিত গাণ্ডীবী বৃদ্ধ সাহিত্যগুরুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করে, সেরূপ বিষাদগ্রস্ত হয়েছেন কিনা জানিনে। যদি হয়ে থাকেন তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারি, তিনি নিশ্চিন্ত হোন। তাঁর হাতের গাণ্ডীব-টঙ্কারে তাঁর নিজের কানে তালা ও শিশু-দর্শকদের চমক লাগলেও তা' বস্তুত লালশালুমণ্ডিত বংশখণ্ডনির্ম্মিত ক্রীড়াগাণ্ডীবমাত্র। বৃদ্ধ রণগুরুর সুশুভ্র কেশরাজি বা সুশুভ্রতর যশোরাশি তাঁর বাণনিক্ষেপে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। কিছুদিন হতে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রের অঙ্গণে আর্টের স্বাধীনতার নামে নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতার যে তাণ্ডব-নৃত্য সুরু হয়েছে, তা' সকলেই লক্ষ্য ক'রেছেন। স্বাধীনতার অর্জ্জন ও পরিচালনে যে সুদৃঢ় সংযম ও বলিষ্ঠ সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন তার অভাব বশতই এইরূপ বিপরীত ব্যাপারের উদ্ভব হয়েছে। যৌন-সম্মিলনের যে-অংশ, মানুষ, স্বাভাবিক হ্রী বশতঃ চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে এসেছে,—বর্ব্বর পরুষহস্তে তার আবরণ উন্মোচন করে এঁরা বিজয়গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠেছেন। এঁদের কেউবা, আপনাকে আর্ট-জগতের নূতন মহাদেশ আবিষ্কারকর্ত্তা কলম্বস্ বলে মনে ক'রেছেন; কারো ভাব বা দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহের মতো। শুনেছি সেকেন্দর সাহ সমস্ত পৃথিবী জয় করার পর 'আর একটা পৃথিবী নেই' ব'লে দুঃখ করেছিলেন। এঁরাও মানবের যুগপরম্পরাব্যাপী সাধন-সঞ্চিত, সুকুমার-সন্তর্পণে রক্ষিত পবিত্র ভাবগুলির গায়ে যে-ভাবে পঙ্কলেপনের হোলি-খেলা সুরু করেছেন, তা'তে ঐরূপ দুঃখ করার আর বেশী বিলম্ব আছে বলে মনে হয় না! এঁরাও অচিরে রণজিৎ সিংহের মত ব'ল্‌তে পারবেন—'বাস্, সব কালো হো গিয়া'—অবশ্য, যদি ইতিমধ্যে মানব-ইতিহাসের ভগবান যোগনিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে—'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত'—গীতার এই প্রতিশ্রুতি-বাক্য পালন না ক'রে বসেন!

যা' হোক্‌ সাহিত্য-রাজ্যের এই শোচনীয় অনাচারে সাহিত্য ও সমাজের [illegible]কাঙ্ক্ষী মাত্রেই একান্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। অনেকে উচ্ছৃঙ্খল অনার্য্য আচরণের প্রতিবাদও করেছেন। তবে প্রতিবাদটা বেশীর ভাগ সমাজনীতির পক্ষ হতেই হয়েছে। যাঁরা আর্টের নামে সাত-খুন মাপ হয় মনে করেন, আমি সে-দলের লোক নই। আর্টের উপদ্রবে সমাজের অকল্যাণ-আশঙ্কা ঘ'টলে, আর্টকে সংযত করার অধিকার সামাজিকদের আছে—এ-কথা আমি পুরাদস্তুর বিশ্বাস করি। তথাপি, আমি মনে করি যে, এ-ক্ষেত্রে প্রতিবাদটা আর্টের নিজের তরফ হতে হলে, বেশী ফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা। কিছুদিন পূর্বে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীমান অমলচন্দ্র হোম তাঁর পঠিত অভিভাষণে, সে-কাজ বেশ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেছেন। শ্রীমানের প্রবন্ধে ধার যতই থাকুক্‌ না কেন, 'সাহিত্যিক'-পদমর্য্যাদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি মর্য্যাদা ও বয়ো-মর্য্যাদার ভার না থাকায়, উহা যথাযোগ্য সমাদর লাভ করেছে বলে মনে হয় না।

সাহিত্য-সমাজের এই বারোয়ারি অনাচার রবীন্দ্রনাথ কেন নীরবে উপেক্ষা করছেন, সে-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উঠ্‌ত। বাংলা-সাহিত্যের চেয়ে ব্যাপকতর বিষয়ে সত্যের সন্ধান ও প্রচারে তিনি ব্যাপৃত আছেন বলে, হয়তো, এদিকে তাঁর নজর পড়েনি, এই কথা মনে করতেম। কিন্তু মনের প্রচ্ছন্ন কোণে এ-গোপন-আশা বরাবরই পোষণ করে এসেছি যে, একদিন তাঁর নজর এ-দিকে পড়বেই, এবং এই তথাকথিত আর্টের প্রকৃত স্বরূপ লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকট হতে বিলম্ব হবে না। সকলেই জানেন গত শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ রসলোকের অমল-শুভ্র আলোকে ফেলে বাংলা-সাহিত্যের নূতন ধারার মর্ম্মগত কদর্য্য স্বরূপটা প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের হাতের বজ্র কুসুমাবৃত হলেও উহা বজ্র এবং তার আঘাতও যেমন অমোঘ, তার বেদনাও তেমনি মর্ম্মন্তুদ। নূতনপন্থীরা চমক ভেঙ্গে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বল্‌ছেন—'একি হোলো! Et tu Brute'! এক অদ্ভুত আত্মম্ভরিতার মোহে তাঁরা মনে করতেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ চিন্তা ও ভাবজগতে যে চিরন্তন সংগ্রাম সুরু করে গেছেন, তাঁরাই উত্তরাধিকার-সূত্রে তারই ধ্বজা বহন করে চলেছেন। হঠাৎ তাঁদের সে মোহ টুটে যাওয়া যে নিরতিশয় মর্মভেদী সকরুণ ব্যাপার, সে-কথা স্বীকার করতেই হবে। মহাত্মাজীর বার্দোলী-সিদ্ধান্তের পর অসহযোগ-সংগ্রামের অনেক বড় বড় মহা-রথীর যে-দশা দাঁড়িয়েছিল, এঁদেরও অবস্থা অনেকটা সেই রকম।

নূতন পন্থীদের দলের প্রধান সেনাপতি হয়ে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম এ, ডি-এল্, ভাদ্রের 'বিচিত্রায়' রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেনাপতিপ্রবর নিজের ও তাঁর সেনার যে শোচনীয় দশা বর্ণনা করেছেন তাতে, তাঁদের উপর অস্ত্রক্ষেপ করা ক্ষাত্রনীতিসম্মত হবে কিনা ঘোর সন্দেহ-স্থল। নরেশবাবুর আত্মদশা-বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করে দেওয়ার লোভ সম্বরণ করা কঠিন:—'কুরুক্ষেত্র-সমরে দ্রোণাচার্য্যকে আপনার বিরুদ্ধে রথারূঢ় দেখিয়া গাণ্ডীবীর ক্লৈব্যের উদয় হইয়াছিল। যাঁহাকে নিত্য নূতন রসের পূজারী, নূতন ধারার মন্ত্রগুরু ও অগ্রদূত বলিয়া নবসাহিত্য এতদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাঁহার হাতে আঘাত খাইয়া সে যদি হঠাৎ বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইয়া উঠে তবে তাহা বিচিত্র নয়।' অর্জ্জুনের 'সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতে' ইত্যাদি আরো বহুবিধ দুরবস্থা ঘ'টেছিল। 'নব-সাহিত্যের' অর্থাৎ 'নব-সাহিত্যের নব-রত্নের' সে-সব ঘটেছে কিনা নরেশবাবু খোলসা জানান নি। বোধ হয় এক 'ক্লৈব্যের' মধ্যেই সে-সব উহ্য রেখে দিয়েছেন। ও-শব্দটি আবার বহুব্যাপকার্থবাচী। যা' হোক্, অর্জ্জুনের এই শোচনীয় দুর্দশা দূর করার জন্য স্বয়ং শ্রীভগবানকে রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গোটা অষ্টাদশ অধ্যায় গীতাখানি extempore রচনা করে শোনাতে হয়েছিল, তবেই নাকি অর্জ্জুনের ক্লৈব্যের অপগম ঘটে। শাস্ত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোনও অবতারের আবির্ভাবের উল্লেখ না থাকায় নরেশবাবুর বোধ হয় সে সৌভাগ্যলাভ ঘটেনি। কাজেই তাঁর লেখাটিতে 'ক্লৈব্য' 'বিভ্রান্ত ও বিচলিত' হওয়া প্রভৃতির লক্ষণ আগাগোড়া দেদীপ্যমান হয়েই ফুটে আছে।

কথাটা অপ্রিয় নিশ্চয়ই—কিন্তু অসত্য মোটেই নয়। প্রমাণের অভাব নেই।

প্রথম প্রমাণ:—খামখা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবতারণা করে অর্জ্জুন সেজে নরেশবাবুর গাণ্ডীবহস্তে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতের মিল না হলে তিনি অনায়াসেই তো জিজ্ঞাসু শিষ্যের মত আপনার সংশয় জানাতে পারতেন। পরস্পরের সম্বন্ধ-বিবেচনায় সেইটেই তো শোভন ও সঙ্গত হোতো। দ্রোণাচার্য্য-অর্জ্জুনের যুদ্ধ-কল্পনা এরূপ ক্ষেত্রে, দেশ-কাল-পাত্র-জ্ঞানশূন্য কল্পনার উৎকট বিকার মাত্র।

দ্বিতীয় প্রমাণ:—সাহিত্যিক প্রতিপক্ষগণের প্রতি 'উন্মত্তের মত' 'ইটপাটকেল যা' খুসী' প্রভৃতি নানাবিধ সুরুচিবহির্ভূত ভাষাপ্রয়োগ। সাহিত্যিক বা সামাজিক কোনও আদর্শেই ও-গুলি শিষ্টাচারসম্মত নয়। Mathew Arnold যাকে

লেখার urbanity (আভিজাত্য) বলে উল্লেখ করেছেন তা শিষ্ট সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। সাহিত্যিক প্রতিপক্ষের প্রতি ধৈর্য্যের অভাবে নিজের অন্তরের সাহিত্যের আদর্শই ক্ষুণ্ণ হয় এবং উহা যথার্থ মানসিক বলের অভাব সূচনা করে। সত্যনির্ণয়েরও উহা প্রকৃষ্ট পথ নয়।

তৃতীয় প্রমাণ :—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও যথার্থ বিনয়নম্র শ্রদ্ধার ভাবের ন্যূনতা। অবশ্য অন্যান্য প্রতিপক্ষদের তুলনায় নরেশবাবু তাঁর সম্বন্ধে অনেক বেশী ভাষার সংযম রক্ষা করে চলেছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাবের অসংযম অনেক সময় ভাষার আড়াল হ'তেও ফুটে বেরিয়েছে। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। নরেশবাবু লিখেছেন—'তাঁর সাহিত্য-ধর্ম্ম-প্রবন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তার তলায় তলায় যে এই কথাগুলিই তাঁকেও অনবরত খোঁচা মারিতেছে তা' স্পষ্ট দেখা যায়। তবু সাহিত্যের প্রকৃতি বিচারে যে এই সব কথা একেবারে অবান্তর রসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ সে-কথাটা নিজের কাছে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন' ইত্যাদি।

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে 'অনবরত খোঁচা মারিতেছে', 'একেবারে অস্বীকার', 'বাধ্য হইয়াছেন' এই কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সোজা কথায় নরেশ-বাবুর মতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তিও তাঁর পূর্ব্বগামীদের মতই—সমাজনীতির দিক হ'তে। তবে তিনি নাকি সাহিত্যরসজ্ঞ-শিরোমণি কাজেই তাঁ'কে পদমর্য্যাদার খাতিরে আসল আপত্তিটাকে সাহিত্যিক আপত্তির সাজ পরিয়ে সাহিত্য-সমাজে বের করতে হয়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সত্যগোপনের অপরাধে অপরাধী তো বটেই—মিথ্যা-প্রচারও সম্ভবতঃ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত বড় গুরুতর অভিযোগ ইতঃপূর্ব্বে শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

যা' হোক্ রবীন্দ্রনাথ যে-উক্তিটির দ্বারা এরূপ গুরুতর অপরাধ করেছেন তা' দেখার ঔৎসুক্য পাঠকদের স্বভাবতই হতে পারে। সে উক্তিটি এই—'সাহিত্যে যৌন-সমস্যার তর্ক উঠেছে, সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক দিয়ে তার সমাধান হবে না—তা'র সমাধান কলারসের দিক থেকে।' ভাবটাও কাটা-ছাটা পরিষ্কার, ভাষাও নির্ম্মল স্বচ্ছ। কোথাও আব্ছায়া বা ধোঁয়াটে কিছুমাত্র নাই। অথচ ওর মধ্য হ'তেই 'খোঁচা মারিতেছে' প্রভৃতি হরেকরকমের জিনিষ নরেশবাবুর অদ্ভুত ভেল্কিবাজীতে বেরিয়ে প'ড়ল। শাস্ত্রে ব'লে শব্দ ব্রহ্ম—এক ওঁ-শব্দ হ'তেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ। আশ্চর্য্য কিছুই নাই!

নরেশবাবু যদি ক্ষমা করেন, তা'হ'লে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি যে-সব

আপত্তি তুলেছেন অতি সহজেই তা'র মীমাংসার পথ বাৎলিয়ে দিতে পারি। একেবারে অমোঘ মুষ্টিযোগ। তিনি শুদ্ধাচারে শুদ্ধাসনে ব'সে নিবিষ্ট শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি অষ্টোত্তর শতবার পাঠ করুন, তাঁ'র সকল আপত্তির উত্তর তাঁ'র আপনার মনের মধ্যেই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌বে। কথাটা পরিহাসের মতো শোনালেও মোটেই পরিহাস নয়। যে-কেহ দু'টি প্রবন্ধ অভিনিবেশসহকারে প'ড়বেন, তিনিই এ-কথার সত্যতা উপলব্ধি ক'রবেন। কিন্তু নরেশবাবু রাজী হ'লেও 'বিচিত্রা'র সম্পাদকপ্রবর যে রাজী হবেন, সে সম্ভাবনা কম। তাঁ'র যে আবার কাগজ পোরাবার গরজ আছে।

নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পড়েছেন স্কুলমাষ্টার ও উকীলের চোখ দিয়ে, রসজ্ঞ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে নয়। তাঁর প্রবন্ধে ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় আছে। প্রথমেই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের 'ষ্টাইল' সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়েছেন এবং কবিবরের ওরূপ ষ্টাইলে লেখা যে, লেখকের পক্ষে বড়ই পরিতাপের বিষয় হ'য়েছে সে-কথাটাও জানাতে ভোলেন নি। তাঁর উক্তিটা এই—'রবীন্দ্রনাথ তাঁর সিদ্ধান্তটি যুক্তির উপর নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল-মাত্র শ্রেণীবদ্ধ কাব্যস্তূপের উপর বসাইয়া দিয়াছেন এমনভাবে, যে পড়িয়া মনে হয় তাঁর পূর্ব্বকথাগুলি যুক্তির, কিন্তু হাতড়াইয়া দেখিতে গেলে ধরিবার ছুঁইবার মত কিছু পাওয়া যায় না। যুক্তির একটা পাকা জবাব যুক্তি দিয়া দেওয়া যায় কিন্তু কাব্যের উপরে যুক্তির বাণ কেবলি একটা ধোঁয়ার মধ্যে ঘুরিয়া মরে, কোনও কঠিন লক্ষ্যের সন্ধান পায় না।' শ্রীমল্লেখককৃত টিপ্পনী এই:—'নিয়মিতভাবে' কথাটার তাৎপর্য্য কি? কিসের বা কার নিয়ম? Deductive ও Inductive Logic-এর কি? 'কেবলমাত্র' কথাটার ইঙ্গিত কি? 'কাব্যস্তূপ' কি 'মানসী' 'সোনার তরী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের স্তূপ? তার উপর উপবিষ্ট সিদ্ধান্ত একটি পরম কৌতুকাবহ দৃশ্য বটে। 'পূর্ব্বকথাগুলি' কোন্ কথাগুলি—সন্ধান মিল্‌ল না। 'কাব্যের উপর' 'যুক্তির বাণ' প্রয়োগ করলে তা যে 'ধোঁয়ার ছায়ার মধ্যে ঘুরিয়া মরে', সে ধোঁয়া, বাণের, না কাব্যের, না উভয়ের রাসায়নিক সংযোগের ফল? হায় রে! লক্ষণেরও ঠিক এই বিপদ হ'য়েছিল—মেঘাবলুপ্ত ইন্দ্রজিতের গায়ে বাণ নিক্ষেপ ক'রে।

ষ্টাইলের বিভিন্নতা বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং উহা খাঁটি হ'লে ব্যক্তিত্বের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নে লাঞ্ছিত হ'য়ে উঠে। সাহিত্যিক প্রবন্ধ সাহিত্যরসাভিষিক্ত ষ্টাইলে রচিত হওয়াই সমীচীন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাই করেছেন এবং তাঁর প্রতিভার

কিরণে "সাহিত্যধর্ম্ম" প্রবন্ধটি সার্থক রসরচানরূপে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যদি ইউক্লিডের প্রতিজ্ঞার ষ্টাইলে ওটা লিখ্তেন তাহলে তিনি যে চমৎকার যুক্তিগর্ভ বা যুক্তিসর্বস্ব একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতার সৃষ্টি করে তুল্তে পারতেন তা নিঃসন্দেহ। এক দুই ভাবে নম্বরওয়ারি যুক্তিগুলি সাজিয়ে প্রবন্ধটি রচিত হলে নরেশবাবুর ভিতরের বেত্রহস্ত গুরুমশায় নিশ্চয়ই খুব খুসী হয়ে উঠতেন। কিন্তু হায় l'etitio Principii! হায় Excluded middle! তোমরা যে মগজের অস্ত্রশালায় পড়ে পড়ে মরিচা সঞ্চয় করতে থাক্লে! কাব্যস্তূপের আবরণে যুক্তিগুলি ঢাকা থাকায় অস্ত্রপ্রয়োগের সুবিধা হলো না। গুরুমশায়ের রাগতো খুব স্বাভাবিক! অনেকে কাগজে কলমে যুক্তির ফাঁক অতি সহজেই ধরে ফেল্তে পারেন, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে ঘটনাপুঞ্জের মর্ম্মনিহিত যুক্তিগুলি কিছুতেই তাঁদের নজরে পড়ে না; ফলে নানাবিধ বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে বসেন। কিন্তু যুক্তিগুলি কাব্যালঙ্কারের সৌন্দর্য্যে ভূষিত হলেই যে একেবারে নস্যাৎ হয়ে যাবে, কাব্যালঙ্কার যে এত বড় ভস্মলোচন তা পূর্বে জানতেম না। রবীন্দ্রনাথের রচনাটি ফুলের মালার মতই সুন্দর বটে কিন্তু তা যে বিনি-সূতায় গাঁথা—তাঁর ভিতরে যুক্তির কঠোর ডোর নেই, এ-কথা নরেশবাবু কি করে জান্লেন!

নরেশবাবুর দ্বিতীয় আপত্তি তাঁর নিজের ভাষায় এইরূপ:—'তাছাড়া সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া তিনি যে এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন তাহার বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করিবার কোনও চেষ্টাই করেন নাই।' এই আপত্তিটিতে নৈয়ায়িক ও উকীল দুয়েরই গন্ধ পাওয়া যায়। 'বাদীর আরজীতে মোকদ্দমার কারণ খোলসা বুঝা যায় না—সুতরাং cause of action-এর অভাব হেতু বাদীর দাবী ডিসমিস করিতে আজ্ঞা হয়' কয়েক পৃষ্ঠা ধরে বহু বাগাড়ম্বরসহকারে নরেশবাবু এই দরখাস্তই পেশ করেছেন। তিনি যে পরে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 'সীমানা নির্দ্দেশ' করেন নি বলে পুনঃপুনঃ অভিযোগ করেছেন, বলা বাহুল্য, তাও এই মূল অভিযোগেরই সামিল।

যাই হোক্ নরেশবাবুর এই অভিযোগের ভিত্তিটা কেমন মজ্‌বুত একবার দেখা দরকার। তাঁর যুক্তি প্রণালীটা এইরূপ:—

(১) তিনি (রবীন্দ্রনাথ) 'সমগ্র' আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 'সমগ্র' সাহিত্য তার লক্ষ্যবস্তু হইতে পারে না—কারণ 'খড়্গহস্ত শুচিধর্ম্মী' অনুরূপা দেবীর মতন সাহিত্যিকও আছেন।

(২) 'বিদেশের আম্‌দানী' কথাটায়ও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ

'কেবল কয়েকখানি অনুবাদগ্রন্থ ছাড়া কোন লেখকই তাঁহাদের বই বিদেশের আমদানী বলিয়া প্রচার করেন নাই এবং এমন অনেকে আছেন যাঁরা তাঁদের লেখা সম্পূর্ণরূপে এই দেশের জলমাটির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করেন—যাঁহাদের হয়তো কবি এই সমালোচনায় বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন না—তাছাড়া 'বিদেশের আমদানী' কথাটা পরিচয় হিসাবে কোনও নির্দ্দেশই দেয় না—কেননা, এক হিসাবে রাজা রামমোহনের পরবর্ত্তী সমস্ত সাহিত্যই অল্প-বিস্তর বিলাতী আমদানী।'

সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি গর্দ্দভের কথা মনে পড়ে ভয় হচ্ছে যে-হতভাগ্য দুদিকের দুই সমান লোভনীয় সবুজ কচি ঘাসের আঁটির দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে' শেষে অনাহারে গর্দ্দভলীলা সাঙ্গ করেছিল—সমালোচকের মুখপ্রিয় এত হরেক রকমের উপাদেয় সামগ্রী নরেশবাবু এই অল্প পরিসরটুকুর মধ্যে সাজিয়ে রেখেছেন! [পাঠকেরা উক্ত ঈশপ-কীর্ত্তি ত যশা চতুস্পদের সহিত এ-পক্ষ লেখকের বুদ্ধির তুলনা করলে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবেন না, কারণ, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে এই লেখাটায় হাত দিয়ে] এ-বিপদে চারদিক হতে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে যে কোনও একদিকে ছুটে যাওয়াই বাঁচার একমাত্র উপায়!

প্রথমে 'সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া' ব্যাপারটা দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ তো দেখ্‌ছি 'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে' এইটুকুমাত্র লিখেছেন। বাহির হতে হাওয়ায় উড়ে আসার যখন সম্ভাবনামাত্র নেই, তখন নরেশবাবুর নিজের মগজ হতেই 'সমগ্র' 'বেষ্টন করিয়া' প্রভৃতি কথা এসেছে, এ-কথা মানতেই হবে। কিন্তু নরেশবাবুর মগজই বা হঠাৎ এমন অঘটনঘটনপটীয়ান হয়ে উঠ্‌লেন কেন, সেটাও ভাব্‌বার কথা। সকলই সেই মহামায়ার খেলা—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেন সংস্থিতা'! নরেশবাবুর স্মৃতি-বিভ্রম ঘটেছে। ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার।

বাল্যকালে নিশ্চয়ই নরেশবাবু বাংলা ব্যাকরণে অধিকরণ কারকের অধ্যায়ে অধিকরণ কারকে 'এ-কার' বিভক্তি এবং সামীপ্য, একদেশ, বিষয়, ব্যাপ্তি এই সব অর্থে অধিকরণ কারক হওয়ার কথা উদাহরণসমেত পড়েছিলেন। এতদিন পরে আর সব ধুয়ে মুছে গিয়ে কেবল এইটুকু মনে আছে যে, অধিকরণে 'এ-কার' বিভক্তি হয় এবং ব্যাপ্তি অর্থে অধিকরণ কারক হয়,—যেমন তিলে তৈল আছে অর্থাৎ তিল ব্যাপিয়া তৈল আছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্ত 'সাহিত্যে'-

শব্দের অর্থ, 'তিলে তৈল আছে' এই উদাহরণ খাটিয়ে, 'সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া' করে বসেছেন।

তারপর 'বিদেশী আম্‌দানী' সম্বন্ধে নরেশবাবু যা' মন্তব্য করেছেন তার যুক্তিটা খুব পাকা সন্দেহ নেই। কোনও বিষয় কেউ স্বীকার না করলেই বা কোনও বিষয় কেউ দাবী করে বস্‌লেই যে, সেটাকে বেদবাক্য বলে মানতে হবে, কোনও দেশের কোনও যুক্তি বা প্রমাণশাস্ত্রে তো এ-কথা বলে না। তবে এ-সব কথা যদি আপ্তবাক্য হয়, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর, রামমোহন রায়ের পরবর্তী সমস্ত সাহিত্যই যে অল্প-বিস্তর বিদেশী আমদানী এ-কথাটাই বা কেমন টেকসই দেখা যাক্। কেবলমাত্র কয়েকটী নাম উল্লেখ করলেই কথাটা যে কিরূপ ভিত্তিহীন তা' হাতে হাতে ধরা প'ড়বে। ঈশ্বরগুপ্ত, নিধুবাবু, রাম বসু—কবিওয়ালার দলের রচিত সাহিত্য, 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম্ প্যাঁচার নক্সা', নাটুকে রামনারায়ণের নাটকাবলী—এই সকল সাহিত্যের কথা মনে ক'রলে নরেশবাবু নিজের কথার মূল্য স্বয়ংই নিরূপণ করতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে নরেশবাবু ঘোষণা ক'রেছেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার মর্ম্মবাণী বুঝ্‌তে হলে বিদেশী কবিতা-জ্ঞানের দো-ভাষীর সাহায্য দরকার। কথাটা মোটেই সত্য নয়। প্রত্যক্ষের চেয়ে বড় প্রমাণ নেই। আমি ঠিক বিপরীত রকমই বহু স্থলে দেখেছি। আসল কথা, রসিক জনেই কাব্যরসের মর্ম্ম বুঝে—সেজন্য বহুভাষাজ্ঞানের কোনই প্রয়োজন হয় না।

কবিতারসমাধুর্য্যং কবি বেত্তি ন কোবিদঃ।
ভবানী ভ্রূকুটীভঙ্গীর্ভবোবেত্তি ন ভূধরঃ॥

নরেশবাবু তাঁর প্রবন্ধে মাঝে মাঝে ব্যাসকূট বা ধাঁধা বা ঐরূপ কিছু একটা সাজিয়ে রেখেছেন, বোধ হয় পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি পরখের জন্য। একটা নমুনা দিই:

'বিদেশের আম্‌দানী' কথাটায়ও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা…'

ঠিক পরবর্ত্তী বাক্যটি এই:—

'তা'ছাড়া "বিদেশের আম্‌দানী" কথাটা পরিচয়হিসাবে কোনও নির্দ্দেশই দেয় না—কেননা……।'

দুইটি বাক্যের কেবলমাত্র হেতু নির্দ্দেশের অপ্রধান অংশ ছেড়ে দিয়ে প্রধান ও মূল বাক্য দুটী একত্র ক'রলে এইরূপ দাঁড়ায়:—'বিদেশের আম্‌দানী' কথাটায়ও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, তা'ছাড়া "বিদেশের আম্‌দানী" পরিচয়হিসাবে

কোনও নির্দেশই দেয় না'—একটা সমভাব-বিশিষ্ট—ইংরাজীতে যা'কে parallel passage ব'লে···হেঁয়ালি মনে প'ড়ছে; বহু বাল্যকালে শ্রুত।

'বিষ্ণুপদ সেবা ক'রে বৈষ্ণব সে নয়,
গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়।
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু-চারি দিবসে,
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।'

মূর্খত্বটাকে মেনে নিয়ে গোড়ায় হার মানাই ভাল—চল্লিশ বৎসর ধ'রে ও-জিনিষটার জের টেনে ওটাকে স্ফীত ক'রে তোলার প্রতি কোনও লোভ নাই।

এতক্ষণ এই প্যারার বড় বড় রত্নগুলির পরিচয় দিতে ব্যস্ত থাকায় একটি ছোট রত্নের প্রতি নজর পড়ে নি। রত্নটি ছোট বটে কিন্তু দামী জিনিষ।

'এবং এমন অনেকে আছেন যাঁরা তাঁদের লেখা সম্পূর্ণরূপে এই দেশের জলমাটির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করেন,—যাঁহাদের হয়তো কবি এই সমালোচনার বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন না।'

অর্থাৎ তাঁদের খাঁটি কাশ্মীরী শালকে রবীন্দ্রনাথ (হয়তো) জর্ম্মণ শাল ব'লে মনে করেন, এই অপূর্ব অনুমানটি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক অবিচার প্রবণতার উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হয়েছে না তার খাঁটি-মেকি, আসল-নকল বিচারশক্তির অভাব প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে?

নরেশবাবুর নিকট হ'তে 'বিষয়বস্তু নির্দেশ' সম্বন্ধে একটা হাতে-কলমে শিক্ষা অর্থাৎ Practical Demonstration নিলে মন্দ হয় না।

তাঁর প্রথম প্যারাটাই ধরা যাক্:—

'বাংলা সাহিত্যে কিছুকাল হইল ইত্যাদি।'

প্রথমেই দেখ্‌ছি 'বাঙ্গলা সাহিত্যে'। ঠিক ঐ কথাটির জন্যই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছিলেন—তবে পণ্ডিতমশায়ের নিজের ছেলের পক্ষে 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়' এরূপ যদি কোনও শাস্ত্রবিধি থাকে তা'হলে স্বতন্ত্র কথা! কেবল একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে। তাঁর এই 'সাহিত্য' শব্দের এলাকার মধ্যে 'খড়্গহস্ত 'শুচিধর্ম্মী' শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর বইগুলি প'ড়ে কি? তার পর দেখ্‌ছি 'কিছুকাল হইল'। 'কিছু,' শব্দটি তো মূর্তিমান 'অনির্দ্দেশ'। তার পর দেখ্‌ছি 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভাবগঙ্গার ভগীরথ।' কলির এই ঠাকুর তো কেবল একটিমাত্র ভাবগঙ্গা নয়, অনেক ভাবগঙ্গার ধারাই মর্ত্ত্যলোকে বহিয়ে দিয়েছেন। তার পর 'ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে' ইতি ভণিতায়

যা' ঘোষণা ক'রছেন তাতেও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বিশেষ কিছু মিলে না। কারণ, 'সাবেক মামুলী' এই বিশেষণ দু'টি চঞ্চল কালপ্রবাহে নিত্যই পরিবর্তিত হচ্ছে। আজ যা 'সাবেক মামুলী' বঙ্কিমবাবুর সময় তা' হয়তো 'নূতন' ছিল—আবার বঙ্কিমবাবুর সময়ের 'সাবেক মামুলী' রামমোহন রায়ের সময় সবেমাত্র রঙ্গশালায় প্রবেশ ক'রছে।

আসল কথা, সাধারণ সাহিত্য-রচনায় কেউ 'বিষয়বস্তু নির্দ্দেশের' জন্য তেমন মাথা ঘামায় না। আর মাথা ঘামালেও, মাথার ঘামে নদী বয়ে যেতে পারে, কিন্তু লেখার ধারা অচল হয়েই থাকবে। এরূপ রচনার ক্ষেত্রে পাঠকদের বোধগম্য হওয়াটাই একমাত্র মাপকাটি।

নরেশবাবু 'বিষয়বস্তু নির্দ্দেশের' পালা সাঙ্গ করেছেন ভেবে একটু আশ্বস্ত হয়েছিলেম। কিন্তু এ-যে দেখ্‌ছি 'ভাট কহে মহাশয়, বাণী যদি শেষ হয়, তথাপিও না হয় বর্ণন।' সুতরাং আবার তল্পীতল্পা বাঁধ্‌তে হলো।

নরেশবাবু উচ্যতে :—'বে-আব্রুতা ও যৌন সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াও কবি বিষয় নির্ণয় সুকর করেন নাই' কেননা যৌন সম্বন্ধের আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের আমল হ'তে বরাবর আছে এবং সব চেয়ে বেশী রবীন্দ্রনাথের বিরাট গ্রন্থাবলীতে! আর আব্রু ও বে-আব্রুর মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই। দেশভেদে, কালভেদে, ব্যক্তি ভেদে তা বিভিন্ন। নরেশবাবুর নিজের কথা এই :—'বে-আব্রু কাহাকে বলে এ-সম্বন্ধে মত ও রুচির ভেদ ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিতর তো আছেই, একই যুগে ও দেশে বিভিন্ন মানুষের ভিতরও আছে।' উল্লিখিত অংশের 'ভিন্ন ভিন্ন মানুষের' ও 'বিভিন্ন মানুষের' মধ্যে ভিন্নতা উদ্ভিন্ন করা নরেশবাবু ভিন্ন আর কারো সাধ্যায়ত্ত কিনা জানি না।

যা' হোক্ 'বে-আব্রুতা'র অনুসরণ করতে করতে নরেশবাবু ভূলোক ছেড়ে একেবারে ভুবর্লোক অর্থাৎ সাহিত্য-লোকে উত্তীর্ণ হলেন। সেখানেও দেখেন সমান অরাজক অবস্থা। সীমানা নিয়ে সমান মারামারি। এই উপলক্ষ্যে 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে', 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম কীর্তন ক'রে নরেশবাবু রায় প্রকাশ ক'রে দিলেন যে, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনও অভ্রান্ত নির্দ্দেশ দেন নাই। পাছে কবির প্রতি অবিচার করা হয় এই আশঙ্কায়, নরেশবাবু সাবধান হ'য়ে জানিয়ে দিচ্ছেন—'কবির কতক কথায় মনে হয় যে, যতক্ষণ লেখক কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করেন, ততক্ষণ শ্লীলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়া দেহ লইয়া টানাটানি করেন, তখনই

তিনি বে-আব্রু।" প্রতিপক্ষের উকীল-ভাবে উক্ত কথা ব'লে পুনরায় হাকিম সেজে নরেশবাবু রায় প্রকাশ ক'রলেন—'তাঁহাতেও কথাটা স্পষ্ট হয় না। শারীর ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যসম্রাট।' যাহা হোক এই ভাবে নরেশবাবু বহু বাগাড়ম্বরসহকারে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা ক'রেছেন যে, আব্রু ও বে-আব্রুর মধ্যে সীমানা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোনও 'অভ্রান্ত নির্দ্দেশ' দেন নাই। আর একটি সিদ্ধান্ত তিনি ইঙ্গিতে প্রতিপন্ন করেছেন যে বাস্তবিক-পক্ষে আব্রু ও বে-আব্রুর মধ্যে কোনও সীমারেখা নাই, কারণ দেশভেদে, কালভেদে উহার ধারণা বিভিন্ন।

লেখকের প্রবন্ধের এই অংশ পুনরুক্তি দোষে বিশেষরূপে পুষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যে সীমারেখা সম্বন্ধে কোনও 'অভ্রান্ত-নির্দ্দেশ' দেন্‌নি এই কথাটা হরেক রকম ভঙ্গীতে জানিয়েছেন এবং সব শেষে 'সে-সীমারেখা কবি কোথায় টানিয়াছেন, তার বাহিরে কোন্ বই, ভিতরেই বা কোন্ বই' এ কথা কবি স্পষ্ট জানিয়ে দেন্‌-নি বলে অনুযোগ করেছেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ঐ সকল বই ও গ্রন্থকারদের নামের সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দাবী করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের শেষে ঐ-সব নাম-সম্বলিত 'ক'-'খ'-চিহ্নিত Schedule যদি দিতেন তাহলে বড় ভাল করতেন; অনেক লেখকের সন্দেহ দোলায়মান চিত্তকে সুস্থির করতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথ কোনও সীমানা নির্দ্দেশ করেছেন কিনা সে-কথা পরে আলোচনা করবো। অবান্তরভাবে দু'-একটা কথা বলা দরকার। 'লেখক যতক্ষণ কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করেন, ততক্ষণ শীলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়া দেহ লইয়া টানাটানি করেন তখনই তিনি বে-আব্রু' নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের কতক কথায়, এই মতটা কবির বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কথাগুলির উল্লেখ ক'রলে নরেশবাবুর ঐরূপ ভুলের কারণটা সহজে ধরা প'ড়ত। যা' হোক্, রবীন্দ্রনাথের ভুল মতগুলিও যে ওরূপ কিম্ভুত-কিমাকার হ'তে পারে না, রবীন্দ্র-সাহিত্যে অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই তা' বুঝতে পারবেন। যাকে নরেশবাবু 'মানসিক অভিসার' ব'লেছেন তাও একান্ত 'বে-আব্রু' হ'তে পারে যদি তা' নিরবচ্ছিন্ন লালসার রঙে অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠে।

তার পর "হৃদয়-যমুনা", "স্তন", "বিজয়িনী", "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন',

—নরেশবাবু এই কিম্বদন্তী বহন করে এনেছেন। উক্ত কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব রস উদ্বোধন করেছেন এ-কথা খুবই সত্য; ও-গুলিতে দেহের প্রসঙ্গও কিছু আছে এ-কথাও সত্য; কিন্তু 'দৈহিক ব্যাপার লইয়া' যে উক্ত 'অপূর্ব্ব রস' উদ্বোধন করেছেন এ-কথা একেবারেই যথার্থ নয়। বস্তুতঃ 'দৈহিক ব্যাপার লইয়া' যে-রস উদ্বোধন করা সম্ভবপর, তার সম্বন্ধে 'অপূর্ব্ব' বিশেষণটি কোনও সময়েই প্রয়োগ করা যায় না। নরেশবাবুর উল্লিখিত কবিতাগুলির সবিস্তার বিশ্লেষণের স্থান এখানে নেই; নইলে উক্ত কবিতাগুলিতে দৈহিক ব্যাপার যে নিতান্ত গৌণ একটা উপলক্ষ্য মাত্র, এ-কথা অতি সহজে যে কেউ বুঝ্‌তে পারতেন। যা' হোক্, কবিতা কয়টি থেকে কয়েক ছত্র করে উদ্ধৃত করে দিলেই আমার দাবীটা যে অমূলক নয় তা' প্রতিপন্ন হবে।

১। "হৃদয়-যমুনা"—শেষ কয়টি ছত্র এই :—

'নাহি রাত্রি দিনমান, আদি-অন্ত পরিমাণ
সে অতলে গীত গান কিছু না বাজে;
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।'

নরেশবাবুর ভুল হয়নি তো? তিনি আর কারো "হৃদয়-যমুনা" নামক কোনও কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির গোল ক'রে বসেন নি তো?

২। "স্তন"—"স্তন"-শীর্ষক দু'টি কবিতা আছে। দু'য়েরি কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি :—

(ক) 'হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর,
হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।'

(খ) 'উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্তভূমি ক'রেছে উজ্জ্বল;

*   *   *

ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
দেব-শিশু মানবের ওই মাতৃভূমি।'

৩। তার পর "বিজয়িনী"। তার শেষ কয় ছত্র এই :—

'ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদু-মন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব। সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে

চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে ! পরক্ষণে ভূমি'পরে
জানু পাতি বসি' নির্ব্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্প-ধনু পুষ্প-শর-ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি' । নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত-প্রসন্ন-বয়ানে ।'

"কড়ি ও কোমলের"—

'অতনু ঢাকিল মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত ।'

এই দুই ছত্রে যে ভাবের উন্মেষ, এই "বিজয়িনী" কবিতায় তার পূর্ণতম বিকাশ ।

৪ । তার পর "চিত্রাঙ্গদা" । এই কাব্য-গ্রন্থখানিকে নরেশবাবু যে একটি কবিতা বলে ভুল করেছেন, সেই ভুলের মধ্যেই তাঁর এই অদ্ভুত মতের নিদান-তত্ত্ব মিলতে পারে । খুব সম্ভব তিনি নিজে এ-সব কিছুই পড়েননি, কোনও বেওয়ারিশ কিম্বদন্তীর উপর তাঁর সমালোচনার ইমারত খাড়া করেছেন । অনেক লোক যেমন এমন সব বড়লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবী করে বসেন, যাঁদের সঙ্গে কোনও জন্মে তাঁদের কোনও পরিচয় নেই, নরেশবাবুও কি তেমনি এই সব কবিতা ও কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দাবী করেছেন—একই মনস্তত্ত্ব হতে ? "চিত্রাঙ্গদা"-র এক স্থানের একটু সামান্য অংশ উদ্ধৃত করলেই আমি যে কোনও অত্যুক্তির অপরাধে অপরাধী নই, পাঠকেরা তা' বুঝ্‌তে পারবেন ।

আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা অনন্ত মহৎ । কুসুমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
চাও ।' সেই জন্ম-জন্মান্তের সেবিকার পানে

পুনশ্চ :—

বুঝিতে পারিনে
আমি রহস্য তোমার । এতদিন আছি
তবু যেন পাইনি সন্ধান । তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা ;

তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বন-রত্ন, আলিঙ্গন-সুধা
নিজে কিছু চাহ না, লহ না।

*　　*　　*

তার কাছে এ সৌন্দর্য্যরাশি মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্ত্তি শুধু, নিপুণ চিত্রিত
শিল্প-যবনিকা।

কবি এই কাব্যে সৌন্দর্য্যের সুধা দেহ-পাত্রে আকণ্ঠ পূরিয়া পান করাইয়াছেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু সে কেবল দেহাতীতের অসীম আকাঙ্ক্ষাকে জীবন্তভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য। বিদ্যাপতির 'সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়' গানটি যে অসীমের রসে ভরপুর, "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যে তারই প্রবাহ বেয়ে চ'লেছে।

'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু—
তবু হিয়া জুড়ন না গেল'

এই ছত্রটিতে নরেশবাবু যদি কেবল বুকে বুকে সংস্পর্শ নামক 'দৈহিক ব্যাপার' মাত্রই অনুভব করেন, তাহলে যে তীর্থযাত্রী পুরীধামে জগবন্ধুর স্থানে আপনার বাড়ীর লাউমাচাখানি দেখেছিল, নরেশবাবুর চেয়ে সে যে বেশী অন্যায় করেছিল, এ-কথা কিছুতেই বলা যায় না। তিনি অনর্থক কষ্ট করে সাহিত্য-তীর্থযাত্রা না করে যদি আপনার বাড়ীতে বসে লাউমাচাখানির সেবা করতেন, তা'হলে মোক্ষফল না পেলেও যে বড় বড় লাউফলপ্রাপ্তি তাঁর ঘটত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যা' হোক্ উপরি উদ্ধৃত কবিতা-ছত্রগুলি পড়েও নরেশবাবু যদি মত পরিবর্তন ক'রতে না পারেন, তাহলে নিশ্চয় বুঝতে হবে, নরেশবাবুর মত নামক পদার্থটি বদলায় তাঁর নিজের কোনও গোপন খেয়ালে,—সত্য-মিথ্যার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রেখে নয়।

এইবার আসল বিষয়ে অবতরণ করা যাক—সেই বহুপূর্ব্বের 'আব্রু ও বে-আব্রু'-র মধ্যে সীমা নির্দেশের বিষয়। প্রথমেই দেখি, 'এ-বিষয়ে কবিবর আমাদিগকে কোনও অভ্রান্ত নির্দেশ দেন নাই' বলে নরেশবাবু আপশোষ করেছেন। আপশোষেরই তো কথা সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁর প্রবন্ধে নরেশ-বাবু এত সহজে এত 'অভ্রান্ত' নির্দেশ ছড়িয়ে গিয়েছেন যে, তাঁর পক্ষে বুঝাই

কঠিন যে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উক্ত সহজ কাজ এরূপ দুঃসাধ্য কেন। যা' হোক ভেবে দেখুন হয়তো বুঝলেও বুঝ্‌তে পারেন।

যা' হোক্, 'অভ্রান্ত' নির্দেশ দেওয়ার স্পর্দ্ধা না রাখ্‌লেও রবীন্দ্রনাথ একটা নির্দেশ দিয়েছেন এবং হয়তো সেটা 'অভ্রান্ত' হ'তেও পারে।

'যা'কে সীমায় বাঁধ্‌তে পারি তা'র সংজ্ঞানির্ণয় চলে; কিন্তু যা' সীমার বাহিরে, যাকে ধ'রে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাইনে, বোধের মধ্যে পাই।......আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে, কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপ-কলায়।'

* * *

'মানুষের আহারের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক সত্য নয়। পেট ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তার কলালোকের অমরাবতীতে স্থান দেয়নি।'

* * *

'প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর-বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে তোলে। বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটিতে সে দীপ্তি নাই।'

* * *

'আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের প্রবৃত্তিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মনুষ্যত্বের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না।'

উপরে যে কয়টি অংশ তোলা গেল তা'হতেই স্পষ্ট বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথ আব্রু ও বে-আব্রুতার মধ্যে কি লক্ষণ অনুসারে সীমারেখা নির্দ্দেশ ক'রতে চান। যে-জিনিষ সেরে-মণে ওজন করা যায় না, ফুটে-ইঞ্চিতে মাপা চলে না—ঘণ্টায়-মিনিটে যার হিসাব হয় না—তার সম্বন্ধে এর চেয়ে সুস্পষ্টতর নির্দেশ আর যে কি হতে পারে তা আমার ধারণায় আসে না। রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত লক্ষণ মিলিয়ে যে-কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তি বাংলা-সাহিত্যের কোন্ কোন্ বই বে-আব্রুর কোটায় পড়ে তা' অনায়াসে নির্ণয় ক'রতে পারেন। সেজন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তাদের নামের ফিরিস্তীর কোনই প্রয়োজন দেখি না।

কিন্তু গোড়াতেই যদি গলদ ঘটে,—যে বোধের উপর সাহিত্য ও রূপ-কলার প্রতিষ্ঠা যদি তারই অভাব থাকে,—তাহলে সে-ব্যক্তির পক্ষে সাহিত্য ও রূপ-কলার মায়া কাটানোই ভগবানের অমোঘ নির্দেশ। বিপুলা বসুন্ধরায় তাঁর মানস-প্রকৃতির যোগ্যস্থানও ভগবান স্থির করে রেখেছেন।

সব চেয়ে অদ্ভুত রহস্য এই যে, নরেশবাবু এতক্ষণ ধরে আব্রু ও বে-আব্রুর মধ্যে সীমানা-নির্দ্দেশের অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা ক'রে হঠাৎ পরম অমায়িকভাবে, নিশ্চিন্তচিত্তে প্রত্যাদেশ প্রচার ক'রে বস্‌লেন—

'বর্ত্তমান বাঙ্গলা-সাহিত্যে এমন কতকগুলি বই অবশ্যই জন্মিয়াছে যার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে বলা যায় যে, তাহা একটা শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির সেবা করিয়াছে মাত্র, তাহা লইয়া কোনও রস উদ্বোধন করে নাই।'

উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে 'অবশ্যই', 'অসঙ্কোচে' প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষ উপভোগ্য। নরেশবাবু যে-সব বইকে তালাক্ দিয়ে দিলেন তাদের নামের ফিরিস্তী দেন নাই। সুতরাং তাঁর নিজের নজীর অনুসারে 'বিষয়বস্তু-নির্দ্দেশ' নাই ব'লে তাঁর মাম্‌লাও ডিস্‌মিস্ হওয়ার যোগ্য। তবে যদি 'অভ্রান্ত' কোনও 'নির্দ্দেশ' দিয়ে থাকেন তা'হলে স্বতন্ত্র কথা। সুতরাং তাঁর 'অভ্রান্ত' নির্দ্দেশটা একবার দেখতে হয়।

তিনি যে-সব বই-এর ধোপা-নাপিত বন্ধ করতে চান তাদের একটু পরিচয় দিয়েছেন। 'তাহা একটা শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির সেবা করিয়াছে মাত্র, তাহা লইয়া কোনও রস উদ্বোধন করে নাই।'

উল্লিখিত বাক্যটিতে প্রথম 'তাহা' 'যার' এই সর্বনামের বদলে বসেছে এবং 'যার' বসেছে, পূর্ব ছত্রের 'বই'-এর বদলে। কিন্তু শেষের 'তাহা' কার বদলে ব'সেছে? ঠিক পূর্ববর্ত্তী 'নিকৃষ্ট বৃত্তি'-রই তো ব্যাকরণানুসারে হওয়া সঙ্গত। তা'হলে অর্থ হয় 'নিকৃষ্ট বৃত্তি লইয়া রস উদ্বোধন করে নাই'; যদি দূরবর্ত্তী 'শারীর ব্যাপারের' বদলে বসে থাকে তাহলে অর্থ হয় শারীর ব্যাপার নিয়ে 'ঘাঁটাঘাটি' করছে, কিন্তু 'রস উদ্বোধন' করে নাই। 'ঘাঁটাঘাটি' শব্দটি রুচি-পীড়াজনক এবং বীভৎস-রসদ্যোতক বলে অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে শিষ্ট-সাহিত্যে বর্জ্জনীয়। আর ঐ সকল 'বই'-এর যখন দু'খানি করে হাত নেই তখন উহার ব্যবহারও হ'য়েছে নরেশবাবুর বহুনিন্দিত রূপকভাবে। 'শারীর ব্যাপার লইয়া' আলোচনা কি প্রণালীতে কোন্ মাত্রায় করলে 'ঘাঁটাঘাটি' হয়ে উঠে নরেশবাবু তা'ও খোলসা বলেন নি। সুতরাং তাঁর নির্দ্দেশ 'অভ্রান্ত' হতে পারে কিন্তু তা' মোটেই নির্দ্দেশ নয়।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা দরকার। নরেশবাবু প্রজনন প্রবৃত্তিকে 'নিকৃষ্ট বৃত্তি' বলেছেন। 'সমাজনীতি'-র ভূত রোজার ঘাড়ে ভর করেছে

দেখছি। কিন্তু উহা কি যথার্থই নিকৃষ্ট? দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে উহা পরমধর্ম বলে গণ্য হতে পারে। যে-দেশে লোকসংখ্যা বাড়ান অত্যাবশ্যক, সেখানে ইহা শ্রেষ্ঠধর্ম। প্রাচীনকালে এ-দেশে কত রকমের পুত্র শাস্ত্র ও সমাজ-বিহিত ছিল নরেশবাবু তা অবশ্যই জানেন। রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে কত সতর্ক! 'যৌন-মিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা প্রজনার্থ নয়, কেননা সেখানে সে পশু', এই 'পশু' শব্দ সম্বন্ধে পাছে কেউ ভুল বুঝে সেই জন্য পরে লিখছেন—'উপরে যে পশু-শব্দটা ব্যবহার ক'রেছি ওটা নৈতিক ভালমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে।'

যাই হোক্, এটা সুস্পষ্ট যে, বাংলা-সাহিত্যে যে কলারসবিরোধী পঙ্কিলতা প্রবেশ ক'রেছে, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নরেশবাবু একমত। সুতরাং হঠাৎ নরেশবাবুর সমরাভিযান বিশেষ রহস্যপূর্ণ। ভয়ে মানুষ অনেক সময় উগ্র হ'য়ে উঠে। নরেশবাবুর মনে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যীভূত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কোনও অনির্দিষ্ট আশঙ্কা নেই তো? মতস্তত্ত্ববিদেরা স্থির করবেন।

বাল্যকাল হ'তে 'জগা-খিচুড়ী' নামক সুখাদ্যের নাম শুনে আসছি। জিনিষটি অপূর্ব্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-পর্যন্ত চেখে দেখার সৌভাগ্য ঘটেনি। কি কি উপাদানে সে চিজ প্রস্তুত হয়, চেষ্টা ক'রেও তার সন্ধান মেলেনি। খুব সম্ভব, উপাদানের কোনও বৈশিষ্ট্য নাই, কেবলমাত্র পাচকের হাতের গুণে উক্ত অপূর্ব্ব পদার্থ সৃষ্টিলাভ করে। এতদিন পরে নরেশবাবুর কল্যাণে আমার জিহ্বা-কর্ণের বিবাদ মিটেছে। নরেশবাবুর বোধ হয়, সেই প্রথিতযশা জগবন্ধু (বা জগন্নাথ) পাচকের নিকটই 'হাতে-হাতা' হয়েছে। এটা অবশ্য অনুমান মাত্র। যা' হোক্, নরেশবাবুর প্রস্তুত 'জগা-খিচুড়ী' পাঠকগণের সঙ্গেই ভোগ করা উচিত। তাঁরা যে, পাচকের হাতের তারিফ ক'রবেন, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডার হতে সংগৃহীত উপাদান :—

(১) 'যৌন-মিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা' 'প্রজনার্থং' নয় কেননা সেখানে সে পশু। সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ।'

(২) 'বংশরক্ষাঘটিত পশুধর্ম্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু সে হোলো বিজ্ঞানের কথা—মানুষের জ্ঞান ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা, সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।'

পাঠকের হাতের গুণের নমুনা :—

'দৈহিক সম্বন্ধের দিকটার বিষয়ে তাঁর মত এই যে রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা সেখানে এর (বিজ্ঞানের) সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।'

বলা বাহুল্য, প্রথম উদ্ধৃত অংশটিতেই রবীন্দ্রনাথ যৌন-মিলনের 'দৈহিক সম্বন্ধের দিকটার বিষয়ে তাঁর মত' উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়টিতে দৈহিক সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের কথাই বলেছেন, কিন্তু নরেশবাবুর হাতের গুণে দু'টিতে মিশে অপূর্ব 'জগাখিচুড়ী' প্রস্তুত হয়েছে।

এর পরই নরেশবাবু একটি অপূর্ব্ব অনুমানে উপস্থিত হয়েছেন। 'এই' কথাটা (কথাটা রবীন্দ্রনাথের নয়, নরেশবাবুর নিজের মনগড়া) পরবর্ত্তী কথার সঙ্গে সমন্বয় করিলে তাঁর সিদ্ধান্তটা এই বলিয়া মনে হয় যে, যৌন-মিলনের এই' দিকটা লইয়া যে-সাহিত্য আলোচনা করে সেইটাই 'বিদেশের আমদানী বে-আব্রুতা' এবং তার উপরই তিনি কষাঘাত করেছেন।' উদ্ধৃত অংশে 'এই দিকটা' শব্দ দু'টি নরেশবাবু যৌন-মিলনের 'দৈহিক সম্বন্ধের দিকটা' অর্থেই প্রয়োগ করছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিভাঁজ আদিরসাশ্রিত সাহিত্যটা যে এদেশের একটি সনাতন জিনিষ, রবীন্দ্রনাথের এ-বোধটুকুও নাই মনে করলে, নিশ্চয়ই তাঁর এদেশী সাহিত্যের জ্ঞানের পরিসর সম্বন্ধে একটু বেশী মাত্রায় অবিচার করা হয়। অন্তত 'বিদ্যাসুন্দর' বইখানি সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ একটু আধটু জ্ঞান আছে, নরেশবাবু তাঁ'র হাতের ন্যায়দণ্ডকে বিন্দুমাত্র না হেলিয়েও বোধ হয় এই ছোট দাবীটুকু মঞ্জুর করতে পারতেন।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ ঠিক কোন্ জিনিষটিকে হালের বিদেশী আমদানী বলেছেন সে-সম্বন্ধে নরেশবাবুর কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বোধ হয়, 'কাব্যের উপরে যুক্তির বাণ', প্রয়োগ ক'রে তিনি যে 'ধোঁয়া'র সৃষ্টি করেছিলেন সেই ধোঁয়াই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

রবীন্দ্রনাথ 'সাধারণ সত্য'-র পার্থক্য পদ্মফুল ও কাঁকরের উপমা দিয়ে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন তিনি ঐ উপমাটুকুর উপরই তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন নি। সার্থক উপমা সত্যোপলব্ধির যে কিরূপ সহায়তা করে সে-কথা সুবিদিত। কিন্তু নরেশবাবু এই উপমাটিকে নিয়ে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রত্যেক কথা আলোচনা করে দেখার স্থান, সময়, প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন এই চারেরই একান্ত অভাব। তবে পথ-চল্‌তিভাবে একটু ছুঁয়ে গেলে ক্ষতি নেই।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:—

'যে জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিষই সার্থক। এক টুক্‌রা কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত।'

নরেশবাবু এইটুকু উদ্ধৃত করার সময় 'সুনিশ্চিত' শব্দের পর বন্ধনীর হেপাজতে এবং অগ্র-পশ্চাৎ জিজ্ঞাসা চিহ্নের পাহারায় প্রশ্ন করেছেন—(? ইহা কি সার্থকের সঙ্গে একার্থবাচক ?)। এই বেতালের প্রশ্নের রাজার উত্তর এই যে,—'নিশ্চয়ই'। 'সুনিশ্চিত' শব্দের যদি কোনও অর্থ থাকে তা'হলে তা' সুনিশ্চিত এই যে, তার মধ্যে আমরা তার সম্পূর্ণটাকে দেখি। যে-জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে যত কম দেখি তা' সেই পরিমাণেই অনিশ্চিত হ'য়ে পড়ে। ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, যে-জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি, সেই জিনিষই সার্থক। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে সুনিশ্চিত ও সার্থক একার্থবাচক সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তার পর সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তকে বাতিল ক'রে নিজেই পদ্ম ও কাঁকরের পার্থক্যের কারণ প্রচার করেছেন যে, 'পদ্ম আমাদের আনন্দ দেয় আমাদের রূপবোধকে পরিতৃপ্ত করিয়া আর কাঁকর আমাদের পীড়া দেয়—সম্পূর্ণের প্রকাশ ও অপ্রকাশ এ-বিষয় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।' কাঁকর চোখে, ভাতে বা জুতার মধ্যে না ঢুক্‌লে পীড়া দেয় এ-কথা প্রমাণসাপেক্ষ। আর পদ্ম সুন্দর বলে আনন্দ দেয়, এ-কথা বল্‌লে বিশেষ কিছুই বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথের অপরাধের মধ্যে এই যে, তিনি পদ্ম কেন রূপবোধকে পরিতৃপ্ত করে আনন্দ দেয়, সে-কথাটা একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল হলেও হোতে পারে, কিন্তু তা' মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। তার পর হঠাৎ নরেশবাবুর বিশ্বতোব্যাপী দৃষ্টি খুলে গেছে। তিনি লিখ্‌ছেন—'যে-ব্যক্তি এই বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কাঁকরকে sub-specie—acternitatis দেখিতে পারিয়াছে, সে তার সার্থকতা লইয়া রসরচনা অনায়াসেই করিতে পারে—ইত্যাদি।' ছেলেদের বর্ণজ্ঞান শিখাবার জন্য বর্ণ পরিচয়াদি বই রচিত হ'য়ে থাকে; কিন্তু সে কেবল সাধারণ ছেলেদের জন্য। প্রহ্লাদ 'ক' দেখেই "কৃষ্ণ" স্মরণে কেঁদে আকুল হয়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ যদি শিশুরাজ্যে প্রহ্লাদের বন্যা আসে, তা'হলে পাঠশালা বল, স্কুল-কলেজ বল, বিশ্ববিদ্যালয় বল সকলেরই অচিরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে সন্দেহ নেই।

তার পর খানিকক্ষণ ধরে নরেশবাবু খামখা হাওয়ার সঙ্গে লড়াই ক'রে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'যা হোক্ এটা দেখা গেছে যে, যে-জিনিষটাকে কাজে খাটাই তাকে যথার্থ করে দেখিনে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত

য়।' সোজা কথায়, কোন জিনিষকে কাজে খাটালে নজরটা সেই কাজের উপর গিয়েই সম্পূর্ণ পড়ে; তার মাপেই জিনিষটার মূল্য নিরূপণ হয়। জিনিষটা তার আপনার স্বরূপে যে কি, সে-দিকে মোটেই দৃষ্টি পড়ে না। কথাটা একেবারেই নূতন নয়। ভক্তি ও রসশাস্ত্রের এটা একেবারে প্রথম স্বতঃসিদ্ধ—First axiom। যথার্থ প্রেম-ভক্তি একেবারে অহেতুক, রসিক বৈষ্ণব মাত্রেই তা' জানেন। আর সৌন্দর্য্য-তত্ত্বটা রস-তত্ত্বেরই সামিল। কিন্তু এমন তো হ'য়ে থাকে, সুন্দর অথচ আমাদের কাজে লাগে—রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'আর একদিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ।' যে আমার সংসারযাত্রার প্রধান সহায়, তা'কেই হয়তো মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। রবীন্দ্রনাথের মতে এরূপ হ'লেও ক্ষতি নেই। দুটো ভাবই পাশাপাশি থাকতে পারে। কাজে লাগে ব'লে সুন্দরের সৌন্দর্য্য কণামাত্র কমে না। সংসার-যাত্রার সহায় ব'লে প্রেমপাত্র বা প্রেমপাত্রী প্রেমের যোগ্যতা বিন্দুমাত্র হারায় না। কিন্তু এ নিয়ম খাটে কেবল সুস্থ-সবলাচিত্তের পক্ষে। চিত্তের সে সবলতা না থাকলে তাকে "শুচিবায়ু"তে পেয়ে বসে। সংক্ষেপে এই তত্ত্ব বুঝিয়ে ঐরূপ "শুচিবায়ু"র উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণ কটিতে যে একটু মৃদু ব্যঙ্গরস আছে, তা' প্রচ্ছন্ন হলেও সুস্পষ্ট—জুঁই ফুলের মৃদু বাসটুকুর মত। কিন্তু আমাদের সমালোচক-মশায় উদাহরণ কয়টি দেখেই, তাঁর সমস্ত দৃষ্টিশক্তি "নৈয়ায়িকের" দৃষ্টিশক্তিতে পরিণত করে সেগুলির ফাঁক ধরার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কাজেই "শুচিবায়ু" এই ছোট কথাটি তাঁর নজরে পড়েনি—ঠিক সেই বৈদ্যপ্রবরের মতো যিনি চক্ষুরোগীর 'কর্ণং ছিত্বা কটিং দহেৎ'-এর ব্যবস্থা করে বসেছিলেন,—রোগী পাওয়ার আনন্দে বই-এর পাতাটা উল্‌টিয়ে, সেটা যে গো-চিকিৎসা-প্রকরণ, সেটা দেখ্‌তে ঈষৎ একটু ভুল হওয়ায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে কোথায় কোথায় 'ফাঁক' আছে ছিদ্রান্বেষী নৈয়ায়িকমশায় তা' ফাঁস করে হঠাৎ আবার উজান বেয়ে গিয়ে, স্ত্রী-পুরুষের মিলনের যে দুটো দিক আছে, তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, কর্মসূত্রের বন্ধনে জীবকে বারংবার সংসারে গতায়াত করতে হয়। কুক্ষণে নরেশবাবুর প্রবন্ধ আলোচনা করার কর্ম্ম ঘাড়ে নিয়েছিলেম। এই দুষ্কর্মের বন্ধন যতক্ষণ না ভোগের দ্বারা সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে যায়, ততক্ষণ এইরূপই চল্‌বে। দুঃখ করা বৃথা!

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:—

'সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সামাজিক হিত-বুদ্ধির দিক থেকে

তার সমাধান হবে না—তার সমাধান কলা রসের দিক থেকে। অর্থাৎ যৌন-মিলনের মধ্যে যে দুটা মহল আছে মানুষ তার কোন্‌টিকে অলঙ্কৃত করে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায় এই হোলো বিচার্য্য।'

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নিত্যানিত্য বস্তু এবং প্রধানত যৌন-মিলনের দুটো দিকের কোনটা সাহিত্যের নিত্যরসের বিষয় হতে পারে, এই বিষয়ের একটু আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের গোড়ায়ও এ-বিষয়ে একটু ইঙ্গিত করে গেছেন। মোটের উপর তাঁর সিদ্ধান্তটী এইরূপ—যে জিনিষের আপনার মধ্যে তার চরম পরিণাম নাই, যা অন্য কোনও উদ্দেশ্যের সোপান মাত্র, তা' সার্থক সত্য নয়। কলারস কেবলমাত্র সার্থক সত্যকেই আশ্রয় ও অলঙ্কৃত করে। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে দৈহিক ব্যাপারের মধ্যে; তার চরম পরিণাম নেই—তার উদ্দেশ্য ও পরিণাম জীবসৃষ্টিতে। প্রেমের নিজের মধ্যে সেই চরম পরিণাম আছে। কাজেই - প্রেমই সার্থক সত্য, দৈহিক মিলন নয়। সুতরাং কলারস প্রেমকেই আশ্রয় করে। কিন্তু মানুষের অভিব্যক্তির বর্তমান অবস্থায় মানুষ দেহী জীব। কাজেই অন্তরের প্রেমের মিলন বাহিরের দেহের মিলনে আপনাকে প্রকাশ্য করতে চায় ও করে থাকে। তখন অন্তরের প্রেমের অপূর্ব্ব আলোকে দেহের মিলনও ভাস্বর হয়ে উঠে। ঐরূপ প্রেমালোকদীপ্ত দৈহিক মিলন কলারসের আশ্রয় হতে পারে তখন প্রেমের সাহচর্য্যে সেও কলালোকে নিত্যত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়। প্রেমবিচ্ছিন্ন দৈহিক মিলনের মধ্যে সেই কলারসের নিত্যত্ব নাই। সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ তা' কিছু দিনের জন্য বাহবা পেতে পারে বটে, কিন্তু তার মধ্যে নিত্য কালের মানবের উপভোগ-যোগ্য রস নেই। দু' কারণে প্রেম-বিচ্ছিন্ন দৈহিক মিলনের প্রসঙ্গ সাহিত্যে সমাদর লাভ করে—প্রথম লালসা উদ্দীপন হেতু, যেমন ইংলণ্ডে Restoration যুগে; দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক কৌতুহল তৃপ্তির সহায়তা হেতু, যেমন বর্তমান য়ুরোপীয় সাহিত্যে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা সাহিত্যেও সম্প্রতি ঐ বিকার প্রবেশ করেছে এবং বিস্তারলাভ করেছে। ওরূপ বিকার-গ্রস্ত সাহিত্য আপাততঃ যতই সমাদর লাভ করুক না কেন, ওর মধ্যে সাহিত্যিক নিত্যরস নেই।

এই তো গেল রবীন্দ্রনাথের কথা। এত অল্প পরিসরের মধ্যে এত বড় গভীর সত্য পরিস্ফুট করে তোলা সাধারণ ক্ষমতার কাজ নয়। সমালোচক মশায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে যত কিছু প্রশ্ন তুলেছেন, সুধী ও সুধীর পাঠক তার উত্তর ঐটুকুর মধ্যেই পাচ্ছেন। কিন্তু তা' বলে নিশ্চিন্ত হলে আমার ভোগ টুটে কৈ?

এইবার নরেশবাবুর আপত্তি শোনা যাক। গোড়াতেই একটা কথা জেনে রাখা ভাল। নরেশবাবু যে প্রতিপক্ষের মতখণ্ডনজনিত বিমল আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে প্রতিপক্ষ তিনি স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথের মত বলে তিনি যে-গুলিকে খাড়া করে তুলেছেন, তার কারখানা তাঁর নিজের মগজের মধ্যে। অনেক বালক যেমন সঙ্গীর অভাবে একাই দু'পক্ষের হয়ে তাস সাজিয়ে নিয়ে, প্রতিপক্ষকে খেলায় হারিয়ে দেওয়ার গর্ব অনুভব করে, এও কতকটা সেইরূপ।

নরেশবাবু প্রথমেই রায় প্রকাশ করেছেন—'এই যুক্তির ধারার মধ্যে অনেকগুলি ফাঁক আছে।' থাকার কথাই তো; কারণ তারা ফাঁক সমেতই তো নরেশবাবুর কারখানা হতে বেরিয়েছে। যা'হোক, নরেশবাবু কি বলেন শোনা উচিত। 'প্রথমতঃ প্রয়োজন অপ্রয়োজন দিয়া কাজ হিসাবে সার্থকতা অসার্থকতার নির্ণয় হয় না।' হয়, সে কথাতো কেউ বলেনি। অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মাত্রেই কাব্য হিসাবে সার্থক এবং প্রয়োজনীয় পদার্থ মাত্রেই কাব্য হিসাবে অসার্থক, রবীন্দ্রনাথ কোথাও তো একথা বলেন নি। তিনি তো বরং বলেছেন —'যে-কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাত বিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের এক শ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বু-বনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনা ভার নিল।'

তারপর নরেশবাবু বল্‌ছেন,—'দ্বিতীয়ত যৌন সম্বন্ধের যে-দিকটা তিনি পশুধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে চিরকালই রসের বিচারে অসার্থক একথা বলা ঠিক নয়।'

'চিরকাল' কথাটার তাৎপর্য্য বুঝতে পারলেম না। কোন্ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহা সার্থক ছিল এবং কবে হোতে অসার্থক হোতে সুরু হোলো, নরেশবাবু তা' জানান নি।

অথ নরেশবাবু—'কবির কাব্য চিরদিনই কেবল মানসিক প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দৈহিক ব্যাপারে আপনার সার্থকতা খুঁজিয়াছে; চুম্বন আলিঙ্গন ছাড়িয়া খুব কম কাব্যই প্রেমের চিত্র রচনায় সার্থকতা লাভ করিয়াছে।'

'মানসিক প্রেম' পদার্থটা কি বুঝিলাম না। 'শারীরিক প্রেম' নামে আর কোনরূপ প্রেম আছে নাকি? মাংসের প্রতি মাংসাশীর যে টান স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের রক্তমাংসের দেহের প্রতি সেইরূপ যে অন্ধ টান তাকেই কি তিনি

'শারীরিক' প্রেম মনে করেন? 'প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ' থাকা ব্যাপারটাই বা কি?

রবীন্দ্রনাথ কোনও দিন কোথাও ভুলক্রমে দেহটাকে বাতিল ক'রে দিয়েছেন এরূপ তো মনে পড়ে না। তাঁর নিজের কথা এই—'প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে।' বাহির অর্থে যে দেহ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্থানান্তরে তিনি লিখেছেন—

'প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে,
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।'

শুনেছি সেকালের কোনও ইংরাজী-অনভিজ্ঞ উকীল বড় বড় ইংরাজী আইনের বই নিয়ে আদালতে যেতেন। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিয়েছিলেন—'To frighten the Judge!' বোধ হয় ঠিক সেই কারণেই নরেশবাবু এই প্রসঙ্গে কালিদাসের 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার' ও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর নামোল্লেখ করেছেন। 'মেঘদূত' সম্বন্ধে নীরব থাকাই কর্তব্য ছিল, তবুও নরেশবাবুকে কেবল একটীমাত্র অনুরোধ করি—যেখানে বিরহে প্রেমিকের 'বলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ' অবস্থা ঘটে, সেখানে প্রেমের গভীরতা যে কতখানি, তিনি যেন একবার ভেবে দেখেন।

'ঋতু সংহারে' ঋতুর বর্ণনাটাই কাব্য হিসাবে সার্থক—সম্ভোগ মিলনের ছবিটা নয়। বড় কবির রচিত কাব্যের সকল অংশই যে কাব্য হিসাবে সার্থক, এ-কথা তিনি কি করে জানলেন? বিদ্যাপতির নামে কতকগুলি সম্ভোগমিলনের-পদ প্রচলিত আছে সন্দেহ নেই; তার সকলগুলিই যে বিদ্যাপতির রচিত সে-কথাও জোর করে বলা যায় না। আর বৈষ্ণব কবিদের রচিত সম্ভোগ মিলনের পদাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে একটু সন্তর্পণেই করা উচিত। কোনও প্রকৃত রসিক বৈষ্ণব সে সকল ব্যাপারকে প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধীয় লীলা বলে মনে করেন না। শ্রীযুক্ত রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বল নীলমণি'—নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সাবধান করে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং এই সব পদাবলী শুনে মহাভাব প্রাপ্ত হতেন। শ্রীজীব গোস্বামীর মতো নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও এই-সব রস গ্রন্থের বিস্তৃত টীকা ভাষ্য করেছেন। সে-কথা ছেড়ে দিয়ে লৌকিক ভাবে দেখলেও, বিদ্যাপতির যে-সব পদ রসলোকে অমরত্ব লাভ করেছে, তার একটিও সম্ভোগ মিলন বর্ণনাত্মক নয়। গোটা কয়েক নাম করলেই সকলেই সে-কথা স্বীকার করবেন। 'সজনি ভাল করি পেখন না ভেল'; 'মাধব! তব বিধুবদনা'; 'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি

মাধাই'; 'সজল নয়ন করি, পিয়াপথ হেরি হেরি, তিল এক হয় যুগ চারি'; 'এ-সখি হামারি দুখের নাহি ওর'; 'স্বজনি কো কহই আওব মাধাই, কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার'; 'আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু'; 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর'; 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়'। বিদ্যাপতির ভাণ্ডারে রস হিসাবে সার্থক আরো বহু পদাবলী আছে। নিছক সম্ভোগ-মিলনে যে নিত্যরস থাকতে পারে না, রসজ্ঞ সমালোচক স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী কথায় তা' সুন্দর ব্যক্ত করেছিলেন। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের আলোচনা উপলক্ষ্যে তিনি লিখেছিলেন —'গীতগোবিন্দ কাব্যে গীত থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু গোবিন্দ নাই।'

আর চণ্ডীদাসের নামের সহিত সম্ভোগ-মিলনের ভাব এক সঙ্গে মনে আসাই যাকে ইংরাজীতে বলে Sacrilege, বৈষ্ণবেরা যাকে বলে থাকেন 'সেবাপরাধ' তাই—এখানে অবশ্য সাহিত্য-সেবাপরাধ। এ অপরাধ জ্ঞানকৃত হলে তার প্রায়শ্চিত্ত নেই, অজ্ঞানকৃত হলে তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত রসিক গুরুর নিকট হতে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলি সম্বন্ধে উপদেশ নেওয়া। তবে ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন ফল লাভ সম্ভব নয়। চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব প্রেম-পদাবলীর একটীও আমি এখানে তুলব না। সত্য কথা বলতে গেলে যে-ব্যক্তি সম্ভোগ মিলন প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীর উল্লেখ করেন তাঁর নিকট ঐগুলির উল্লেখ ইচ্ছা করলেও আমার দ্বারা ঘটে উঠবে না! নরেশবাবু যদি পারেন আমাকে ক্ষমা করবেন। তবে চণ্ডীদাসের প্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে বহুপূর্বে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন সেটুকু তুলে দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে:—'সে-ভাব (প্রেম সাধনার ভাব) তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে, সে-ভাব এখনকার সময়েরও ভাব নহে, সে-ভাবের সময় ভবিষ্যতে আসিবে।' চণ্ডীদাসের প্রতিভার মর্ম-কথার পরিচয় তাঁর একটী পদে ফুটে উঠেছে:—

'রজনী দিবসে, হব পরবশে, স্বপনে রাখিব লেহা,
একত্র থাকিব নাহি পরশিব, ভাবিনী ভাবের দেহা।'

এই 'ভাবিনী ভাবের দেহা' কথাটির যা মর্ম্মগত সত্য তারই উপলব্ধি সম্বন্ধে অসাড়তার ফলেই বর্ত্তমানে সাহিত্যে যত কিছু বিড়ম্বনা। একি মানবজাতির মর্ম্ম-স্নায়ুর পক্ষাঘাতের লক্ষণ?

নরেশবাবু এরপর আবার রসকলায় দৈহিক ব্যাপারের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেছেন। তিনি এ-আলোচনা অনন্তকাল ধরে করুন—আমি কিন্তু 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' স্থির করেছি। নরেশবাবুর পাঠকবর্গের প্রতি তাঁর যদি অনুকম্পা না

থাকে সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই ; কিন্তু আমার নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি আমার তো একটু দরদ আছে। ক্রমাগত একই খাদ্য পুষ্টি-লাভের পক্ষে অনুকূল নয়, এ একটী পরীক্ষিত সত্য।

এই প্রসঙ্গে একটী সাধু সঙ্কল্প মনে উদিত হয়েছে—গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সন্ধি-স্থাপনের জন্য একবার বিধিমত চেষ্টা করে দেখব। আসলে যে কোনও বিবাদের কারণ নাই, নরেশবাবুর মোহ কেটে গেলে, তিনিও তা জলের মত বুঝতে পারবেন। নরেশবাবু ও রবীন্দ্রনাথের লেখা হতে একটু একটু তুলে দিলেই পাঠকেরা বুঝতে পারবেন যে, রবীন্দ্রনাথের যে-উক্তিতে নরেশবাবু সমরসজ্জা করেছেন, নরেশবাবু নিজেও সেই কথাই বলেছেন—অবশ্য তাঁর অভ্যস্ত ভাষা ও ভঙ্গীতে।

নরেশবাবুর উক্তি :—

'যৌন সম্বন্ধের শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিয়া পাঠকের চিত্তের রিরংসার উপর বাণিজ্য করা···নিত্য অনিত্য কোনও রূপ রসই নয়······'

রবীন্দ্রনাথের উক্তি :—

'······বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটীতে সেই দীপ্তি নাই।

(নরেশবাবুর উল্লিখিত যৌন সম্বন্ধের শারীর ব্যাপার)

'যৌন মিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে তা' "প্রজনার্থং" নয় কেননা সেখানে সে পশু।' (পুনরায় নরেশবাবুর উল্লিখিত শারীর ব্যাপার)

'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করেন নিত্য-পদার্থ ;'

নরেশবাবুর লেখাতে 'ঘাঁটাঘাটি' শব্দের যা অর্থ, 'বে-আব্রুতা'রও ঠিক সেই তাৎপর্য্য। খুব সম্ভব ঘাঁটাঘাটি শব্দটী সংস্কৃত উদ্‌ঘাটন শব্দ থেকে জাত। উদ্‌ঘাটন—আবরণ উন্মোচন—বে-আব্রুতা।

সুতরাং দেখা গেল আসল বিষয়ে উভয়ের মতের মিল আছে। কেবল একটী বিষয়ে অনৈক্য দেখা যায়—তাও সহজেই মিটে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই বে-আব্রুতার জন্ম—য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থতা চেষ্টার অন্ধ অনুকরণে। নরেশবাবু মনে করেন ওটি পাঠকদের মনে রিরংসা উদ্দীপনের ইচ্ছা থেকে সঞ্জাত। সেনাপতি মহাশয় তাঁর নিজের দলের সৈন্যগণকে প্রতিপক্ষের চেয়ে নিশ্চয়ই ঢের ভাল ক'রে চিনেন। সুতরাং, আশা করি, রবীন্দ্রনাথ নরেশবাবুর 'সংশোধন'টুকু বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবেন। অনর্থক ভদ্রসন্তানদের রিরংসা

উদ্দীপন চেষ্টার গৌরব হ'তে বঞ্চিত করা রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ লোকের পক্ষে উচিত হয় না।

এর পর নরেশবাবু পুনরায় সেই সীমানা নির্দ্দেশের মামলা তুলেছেন। 'যাহা রসরচনা ও যাহা কেবলমাত্র কদর্য্য ইন্দ্রিয়বিলাস তার মধ্যে প্রকৃত সীমা-নির্দ্দেশটাই আসল কথা। ....রবীন্দ্রনাথ যে কোথায় সীমারেখা টানিতে চান বুঝা গেল না।' কাজেই নরেশবাবুকে সে গুরুতর কাজের ভার নিজের হাতেই নিতে হোলো। নরেশবাবু রীতিমত পিলারবন্দী করে এরূপ সীমা নির্দ্দেশ করছেন :— 'যাহা আমাদের রসবোধে সাড়া জাগায় সেটা আবৃত হোক, অনাবৃত হোক, তাহা আর্ট—আর যাহা রসবোধে সাড়া দেয় না, কেবল মানুষের পাশুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে তাহা আর্ট নয়। .... এই যে প্রভেদ ইহা একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ যাহার স্বরূপ প্রত্যেক রসজ্ঞ স্বীকার করিবেন কিন্তু অরসিককে অন্য কোনও বাহ্যলক্ষণ দিয়া বুঝাইবার কোনও উপায় নাই।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নরেশবাবুর মতে রসরচনা ও কদর্য্য ইন্দ্রিয়-বিলাসের মধ্যে প্রভেদ একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ যার অস্তিত্ব রসজ্ঞের রসের উপলব্ধিতে,—যে তা বাহ্য লক্ষণ দিয়ে বুঝতে চায় সে লোক রসিক নয়। দেখা যাক্ রবীন্দ্রনাথ কিরূপ প্রভেদ করেছেন। তিনি বলেছেন—

'আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। যে প্রেমে, যে ধ্যানে, যে দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মিটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপকলায়।'

যদি আধ্যাত্মিক বলে জগতে কিছু থাকে—তাহলে উপরি উদ্ধৃত অংশের প্রতি অণু-পরমাণু আধ্যাত্মিক। এরূপ আধ্যাত্মিক প্রভেদ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করে দেওয়া সত্ত্বেও নরেশবাবুর মন ওঠেনি, তিনি অভিযোগ করেছেন—'রবীন্দ্রনাথ যে কোথায় সীমারেখা টানিতে চান বুঝা গেল না।' সুতরাং মনে হয় তিনি বোধ হয় একটা বাহ্য লক্ষণ দাবী করছেন। নতুবা তাঁর অভিযোগের কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। আর বাহ্য লক্ষণ যে দাবী করে, তার সংজ্ঞা নরেশবাবু নিজেই নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। সুতরাং—তাঁর নিজের প্রদত্ত ছাড়পত্রের (Passport) বলেই তিনি যে অরসিকের গোলকধামে উত্তীর্ণ হয়েছেন, একথা নরেশবাবুকে মানতেই হবে।

আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করার আছে। নরেশবাবু 'রসবোধে সাড়া জাগায়' এবং 'গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ' বলে যেখানে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তা ছাড়িয়েও আরও গভীরতর মর্ম্মে প্রবেশ করে 'রসবোধে সাড়া জাগাবার'

নিদানতত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এ-সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট প্রভেদটা যে 'বাহ্য' প্রভেদ মাত্র, নরেশবাবু এইরূপ 'রুল' জারি করেছেন। হয়তো বা 'চৈতন্য রামানন্দ সংবাদে' উল্লিখিত মহাপ্রভুর ভাবে ভাবিত হয়ে নরেশবাবু 'এহ বাহ্য' "এহ বাহ্য" শব্দের নির্দেশ দ্বারা রায় রামানন্দকে—শ্রীবিষ্ণু!—রবীন্দ্রনাথকে রসলোকের অন্তরতম বৈকুণ্ঠের পথ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এ-সব মহাপ্রভুজন-সুলভ ব্যাপারে মাদৃশ প্রাকৃত জনের নীরব থাকাই শ্রেয়।

তবে একটী ছোট কথা জানালে ক্ষতি নেই। রবীন্দ্রনাথ কেবল রসবোধের আব্রু ও আভিজাত্যের কথাই বলেছেন—সাড়ী জ্যাকেট ব্লাউস পেটিকোটের কথা তাঁর মনের ত্রিসীমানার ধার দিয়েও যায় নি। তাঁর কথাটা এই—'মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে, সেইটেই নিত্য—যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য।' সুতরাং নরেশবাবুর নগ্ন-নারীমূর্তি, Venus of Milo প্রভৃতির উল্লেখ নিতান্তই অসংবদ্ধ আলাপ মাত্র।*

আসলে আব্রু জিনিষটা অন্তরের—যাকে সংস্কৃত কবিরা 'হ্রী' বলেন এবং যা 'শ্রী'র কমলাসন। এই প্রসঙ্গে লর্ড বায়রণের উল্লিখিত তাঁর নিজের জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সকলেই জানেন মানব জাতির প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা বশতঃ তিনি ভাষায় ও আচরণে সংযম রক্ষা করে চলা আবশ্যক মনে করতেন না। বড় বড় নামজাদা সাধু পুরুষের সঙ্গে আচরণেও এর ব্যতিক্রম ঘটত না। অনেকে মুখে রাগ প্রকাশ করতেন বটে, কিন্তু কারো কাছে কোনও দিন বায়রণের এজন্য যথার্থ লজ্জা অনুভবের কারণ ঘটে নি। কেবল একবার মাত্র এর অন্যথা ঘটেছিল—শেলীর নিকটে। তাঁর একটী অসংযত বে-আব্রু কথায় শেলীর সমস্ত দেহে এমন একটি সকরুণ বেদনা ও কুণ্ঠার ভাবের বিকাশ হয়েছিল যে তাঁর মতো দুর্দ্ধর্ষ সিংহকেও মাথা নত করতে হয়েছিল। শেলীর অন্তরপ্রকৃতির রসবোধের চেতনা একান্ত সুকুমার ছিল বলেই তিনি এরূপ পীড়া অনুভব করে-ছিলেন। নতুবা শেলী যে সাধারণ সামাজিক যৌননীতির ধার ধারতেন না একথা সর্ব্বজনবিদিত।

তারপর দুইটী প্যারা ধ'রে ভিক্টোরিয়া যুগের শ্লীল সাহিত্য, অপাংক্তেয় বিষয়-সংশ্লিষ্ট-রসবিচিত্র য়ুরোপীয় সাহিত্য ও তস্য বিকৃত পদাঙ্কানুসারী য়ুরোপীয় সাহিত্যের আলোচনা ছলে, পুনঃ পুনঃ 'বাহ্য' এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র জপ করতে করতে

* মুদ্রাকর সাবধান হবেন—"আলাপ স্থানে যেন প্রলাপ ছাপা না হয়"।

নরেশবাবু 'অবশেষে উপনীত রাজপুতনায়'—অর্থাৎ বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে। প্রথমেই তিনি বলছেন '—বঙ্গ-সাহিত্যেও এই নূতন প্রেরণার একটা প্রতিঘাত দেখা দিয়াছে একথা সত্য।'

ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মানুসারে অন্বয় করলে 'এই' এই সর্বনামটী পূর্ব প্যারায় যে প্রেরণার উল্লেখ আছে তাকেই বুঝায়। অর্থাৎ 'তাঁদের বিকৃত পদাঙ্কের অনুসরণে ইউরোপে বর্তমান যুগে অনেক স্থলে একটা নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতা, সাহিত্যের নামে বীভৎস অশ্লীলতা ও ব্যভিচার গজাইয়া উঠিয়াছে—' এই অংশটাকেই লক্ষ্য করছে। বঙ্গ সাহিত্যেও এই নূতন প্রেরণার একটা প্রতিঘাত দেখা দিয়াছে—একথা সত্য।

ব্যাকরণের নিয়মের উপর একান্ত নির্ভর সব সময়ে নিরাপদ নয়। সুতরাং সুধী সমাজে—"আভ্যন্তরীণ প্রমাণ" বলে যে প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়, তার সাহায্যে ব্যাকরণানুযায়ী সিদ্ধান্তটী যাচাই করে দেখা ভাল। প্রবন্ধে স্থানাভাব, সুতরাং সে ভার আমি পাঠকদের উপরই দিচ্ছি। উক্ত প্রমাণ প্রয়োগের ফলে তাঁদের ধ্রুব প্রতীতি জন্মাবে যে, নরেশবাবু যা লিখেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

নরেশবাবু তাঁর সৈন্যদলের দিগ্বিজয়ের কাহিনী নিম্নলিখিতভাবে সদম্ভে প্রচার করেছেন :—'ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যে যে প্রদেশ শিষ্ট সাহিত্যের সীমা-বহির্ভূত বলিয়া বর্জ্জিত ছিল তার ভিতর প্রবেশ করিয়া একাধিক সাহিত্যিক নূতন রস সৃষ্টির আয়োজন করিয়াছেন।' 'বিষয় বস্তু নির্দ্দেশের' অভাব বশতঃ কথাটা সম্পূর্ণ বোধগম্য হলো না। প্রথম প্রশ্ন স্বভাবতঃ উঠে—'একই বা কে এবং অধিকই বা কোন্ ব্যক্তি?' এটার যথাযথ উত্তর পেলে নরেশবাবুর প্রবন্ধের মর্ম্মার্থ জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—'নূতন' শব্দটি রসের বিশেষণ না আয়োজনের? যদি 'রস' উহার লক্ষ্য হয়, তাহলে কারো বোধ হয় কোনও আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। কারণ, এ রস যে চিরন্তন কলারস হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা 'নূতন' রস, সে বিষয়ে কারো কোনও সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ থাকতে পারে না।

পুনশ্চ:—'তার মধ্যে কতকটা যৌন সম্বন্ধের পূর্ব্ব-নিষিদ্ধ দেশ হইতে সংগৃহীত।' এখানেও বিষয়-বস্তু নির্দ্দেশের সম্পূর্ণ অভাব। যৌন সম্বন্ধ দু'রকমের হতে পারে। প্রথম শাস্ত্র ও সমাজ-বিহিত; দ্বিতীয় শাস্ত্র ও সমাজ-নিষিদ্ধ। শাস্ত্র ও সমাজ-বিহিত যৌন সম্বন্ধের আর এক নাম বিবাহ। বিবাহের নিষিদ্ধ দেশ, দেশ ও ধর্ম্মানুসারে—অসবর্ণ বিবাহ, সগোত্র বিবাহ, শ্যালিকা বিবাহ ইত্যাদি।

আর দ্বিতীয় প্রকার যৌন সম্বন্ধের নিষিদ্ধ দেশ—পরস্ত্রীগমন, Incestuous relation প্রভৃতি। এই উভয়বিধ নিষিদ্ধ দেশের কোন্ দেশের তাল তরু হতে তাঁদের নূতন রস সংগৃহীত হয়েছে, বিষয় নির্দ্দেশের অভাবে সেটা ঠিক বুঝা গেল না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে নাকি অদৃশ্য অক্ষরে ভালমন্দ নির্বিচারে এই নব সাহিত্যিক-দলের সকলের সৃষ্ট সকলবিধ রসকেই 'অনিত্য' বলে 'ভাসিয়ে' দিয়েছেন। এই নূতন রসের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) জানলে তা ভাস্‌বে কি ডুব্‌বে এবং কিসে ভাস্‌বে, তা বৈজ্ঞানিক বলে দিতে পারবেন। এজন্য নরেশবাবুর বড় গোসা জন্মেছে। "সাহিত্যধর্ম্ম"-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তবিধ অপরাধের কোনও রূপ প্রমাণ না পাওয়ায়, এ-পক্ষ লেখককে বিনীতভাবে নিবেদন করতে হয় যে, নরেশবাবুর মানসিক উত্তাপের পরিমাণ ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশী জেনেও, আমি তাঁর সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশে একান্ত অসমর্থ। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের ডাক্তার জনসনের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করে নরেশবাবু যে-রসের সৃষ্টি করেছেন তার যথার্থ নিকাশের ক্ষেত্র মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা নয়, মানুষের মুখমণ্ডল।

সাময়িক উত্তেজনা মাঝে-মাঝে সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার করে তার প্রকৃতি অভিভূত করে ফেলে, এই সত্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর গুপ্তের "পাঁঠা" ও "তপসে মাছ" সম্বন্ধীয় কবিতা দুটির উল্লেখ করেছেন। নরেশবাবু অবশ্য তার প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদ খুব সম্ভব ভালই হয়েছে—ঠিক মতো বুঝ্‌তে পারি নি বলে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারলেম না। তবে আমি যদি নরেশবাবু হতেম, তা হলে এইরূপ লিখতেম ;—আজকাল কলিকাতার বাজারে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের মত নধর পুষ্ট কচি পাঁটার অভাব ঘটায় এবং ষ্টীমার প্রভৃতির উপদ্রবে ও Septic tank-এর ময়লার দৌরাত্ম্যে তপসে মাছের পূর্ব্বের স্বাদ না থাকায় উহারা রসসৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। কিন্তু ইংলণ্ডের "Roast pig"-এর স্বাদ বিন্দুমাত্র নূতন না হওয়ায়, উহা ইংরাজদের রসসৃষ্টির কাজ সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।" বোধ হয় এরূপ প্রতিবাদেও ফলের ইতর-বিশেষ বেশী কিছু হোতো না।

এই প্রসঙ্গে নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের যৌবন কালের রচিত এবং নরেশবাবুর যৌবনকালে বহুল প্রচলিত, কিন্তু অধুনা বিস্মৃতপ্রায়, কবিতা ও গানের উল্লেখ করে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—'তাহা হইতে এ-সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তার বিষয়-বস্তু রসহিসাবে অচল—ইহাও বলা যায় না যে, সে কবিতা ও গানগুলি সত্যসত্যই সার্থক রসরচনা নয়।' স্থায়ী বা নিত্য রসের আশ্রয়ীভূত বিষয়-বস্তুর

অভাবই যে কবিতা ও গান অচল হওয়ার একমাত্র কারণ, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ তো কোথাও বলেন নি। উহা অন্যতম কারণ মাত্র। আরও পাঁচটা কারণে ওরূপ ঘটা সম্ভব। নরেশবাবুর মতো নৈয়ায়িকের ওরূপ ভুল হওয়া একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই।

নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের 'বিদেশের আমদানী' বিশেষণটার জন্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন এবং সাভিমানে জানাচ্ছেন যে রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে ওরূপ কটাক্ষপাত কোনও মতেই প্রত্যাশা করেন নি। আলো যে জানালা দিয়েই আসুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, যদি তাতে অন্তরের মণিরত্ন উদ্ভাসিত হয়ে উঠে; আর পদ্ম সরোবরের নিজের দেওয়া আলোতে না ফুটে আকাশের আলোতে ফুটে উঠে বলে কেউ তাকে দোষ দেয় না। এই দুই উপমা দ্বারা নরেশবাবু নিজের কথাটা ফুটিয়ে তুলেছেন। কোনও দিকের কোনও বিশেষ জানালা বা কোনও বিশেষ স্থানের বিশেষ আলোর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনও পক্ষপাত আছে, এ-কথা তাঁর অতি বড় শত্রুও কোনও দিন বলে নি। বরঞ্চ, পশ্চিমের জানালাটার দিকেই ইদানীং তাঁর কিছু পক্ষপাত হয়েছে, সম্প্রতি সেইরূপ অপবাদই পেট্রিয়টদের মুখে শোনা যায়। যাহোক একথা বিশ্ববিদিত যে, তাঁর 'বিশ্বভারতীর' একমাত্র কাজ পৃথিবীর সব দেশের সব দিকের সকল জানালা দরোজা সম্পূর্ণ খোলা ও চিরদিন খুলে রাখা। তাঁর একমাত্র আপত্তি, সম্মোহন ক্রিয়াধীন (Hypnotised) ব্যক্তিরা যে-সে-জিনিষকে আলো, মণিরত্ন, পদ্মফুল প্রভৃতি বলে ভুল করেছে বলে। তিনি সেই সম্মোহনের নেশাটুকুই ছুটিয়ে দিতে চান।

তার পর নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় কটাক্ষের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন—'তাছাড়া এ-সাহিত্যের সম্বন্ধে তিনি এমন কথা বলিয়াছেন যাহা হইতে অনুমান হয় যে, এ-সাহিত্য কতকগুলি বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত সত্যকে আশ্রয় করিয়া—কোনও রূপরসের বিচার না করিয়া—বিজ্ঞানের সত্যকে সাহিত্যে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে!'

এদেশের লোকে বিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞানলব্ধ তথ্য সাহিত্যে চালিয়ে থাকে, এদেশের লোকের সম্বন্ধে এরূপ গুরুতর অপবাদের কথা রবীন্দ্রনাথ কোথায় করলেন? তাঁর নিজের কথাটা তো ঠিক অন্যরূপ :—

'যে দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসন মূর্তি ধরে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্র হরণের অধিকার দাবী করছে, সে দেশের সাহিত্য অন্ততঃ

বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে অন্তরে বাহিরে, বুদ্ধিতে ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনওখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে-দেশের সাহিত্যে ধার করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দিবে ?'

এই প্রসঙ্গে নরেশবাবু দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করেছেন যে, কোনও এক বক্তা (শ্রীমান অমলচন্দ্র হোম নাকি ?) তাঁর (নরেশবাবুর) বইগুলি সম্বন্ধে Criminology-র উপর প্রতিষ্ঠিত বলে অপবাদ দিয়াছেন, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁর একখানি মাত্র বই-এর একস্থলে মাত্র Criminology এই শব্দটী আছে এবং একটিমাত্র অবান্তর স্ত্রীচরিত্রে উক্ত বিজ্ঞানের কিছু আলোচনা আছে ; এ-ছাড়া তাঁর আর কোনও বই-এ এ-জিনিষের নাম গন্ধও নাই।* রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর লক্ষ্যভূত বইগুলির নামের ফিরিস্তী দিতেন তাহলে বোধ হয়, নরেশবাবু প্রমাণ করে দিতে পারতেন যে, উক্ত বক্তার মত রবীন্দ্রনাথের কথার ভিত্তিও অতি ক্ষীণ এবং অনিশ্চিত। ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে মানুষকে সাবধান করে দেয়—যাকে ইংরাজীতে বলে Presentiment ! বোধ হয় সেই জন্যই উক্ত নামের ফিরিস্তী তাঁর প্রবন্ধের একান্ত অপরিহার্য্য অঙ্গ এ-কথা জানা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তা' তাঁর প্রবন্ধের সঙ্গে জুড়ে দেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথার ভিত্তি 'অতি ক্ষীণ ও অনিশ্চিত' এ-প্রমাণ করে দিতে পারতেন মনে করেও নরেশবাবুর সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় নি। কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্পর্দ্ধাসহকারে সম্মুখ সমরে আহ্বান করেছেন, যাকে ইংরাজিতে Challenge করা বলে। সেই Challenge-এর একটু নমুনার রস পাঠকদের পক্ষে উপভোগ্য হবে মনে হয়। 'যে-সব লেখা সাহিত্য-পদবাচ্য তার সম্বন্ধে সাধারণভাবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, সেগুলি বিজ্ঞানের বই হইতে উপাদান কুড়াইয়া লেখা নয়—জীবনের প্রত্যক্ষ দর্শন ও আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা যিনি অস্বীকার করিতে চান, নির্দ্দিষ্ট বিষয় হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া যদি তিনি তাঁর কথা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন, তবে তার সম্যক উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত।' যত গোল 'সাহিত্য-পদবাচ্য' কথাটীর 'বাচ্য' শব্দটুকু নিয়ে। যাহা যথার্থই—

* কেবল মাত্র ইহার দ্বারাই প্রতিপক্ষের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ হয় না যে খবরে অভ্যস্ত জ্ঞান অজ্ঞাতসারে রচনায় প্রবেশ করতে পারে ও করে থাকে। তাহারা যদি বিদেশী বইএর অনুসরণ হয় তাহলে মূল গ্রন্থকার কি করেছেন না করেছেন সে কথা তাঁর জানা নাও থাকতে পারে।

'সাহিত্য-পদবাচ্য' নয় তাও সাময়িক উত্তেজনাহেতু সাহিত্য বলে সমাদর লাভ করে থাকে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি তো ঠিক ঐখানে। 'যা' যথার্থ ই জীবনের প্রত্যক্ষ-দর্শন ও আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা' সত্যই সাহিত্যের রসপূর্ণ, তাকে নরেশবাবুর কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বী খামখা কেন যে 'বিজ্ঞানের বই হইতে উপাদান কুড়াইয়া লেখা' বলে বস্‌বেন, সেটা ঠিক বুঝ্‌তে পারলেম না। অন্ততঃ চোখে ঠিক দেখতে পায় এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বী নরেশবাবুর খাড়া করা উচিত ছিল; নতুবা তাঁর বিজয়-গৌরব যে ম্লান হয়ে পড়বে।

আর 'প্রত্যক্ষ-দর্শন ও আলোচনার' উপর প্রতিষ্ঠিত হলেই যে তা' সাহিত্য হয়ে উঠ্‌বে এমন কোনও ধরাবাঁধা কথা নাই। সেই আলো ফেলে সব দেখা যায়, যাকে Wordsworth বলেছেন 'The light that never was on sea or land'—সেই কলালোকের আলো—আর যায় ভাবরসিকের অন্তরের রসে অভিষিক্ত হওয়া। নতুবা কলা-সৃষ্টি সম্ভব নয়। আজ এই কলা-সৃষ্টি সম্পর্কে নরেশবাবু যে, 'আলোচনা' শব্দটীর পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করেছেন তাহা হাস্যজনক-রূপে অপপ্রয়োগ। 'আলোচনা' 'পর্য্যবেক্ষণে'র ছোট ও 'গবেষণা'র যমজ বোন্ এবং 'সিদ্ধান্তে'র দিদি—সাহিত্য-কলার সহিত তার কোনওরূপ আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা নেই!

রবীন্দ্রনাথ 'হাট ও হট্টগোল' সম্বন্ধে যে-কথা ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলেছেন, সেটা যে তাঁর মতো দীর্ঘ-প্রবাসী ও নির্জ্জন নিবাসীর পক্ষে নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা তা' নরেশবাবু সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন! তবুও তো নরেশবাবু বোধ হয় খবর রাখেন না রবীন্দ্রনাথ একান্ত অবজ্ঞাভরেই হাটকে দূরে-দূরে রেখেই চলে থাকেন। তা' নইলে তিনি কদাচই লিখতেন না :—

'আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা
থাক্‌গে তোমার পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবু সা।'

উপসংহারে নরেশবাবু মহাশয় হট্টগোল যে হাটের পূর্ব্বগামী, ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস হতে সে-কথা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করে (এ-দেশের ইতিহাসেও উদাহরণ মিলতো যেমন রামরূপ হাটের ষাট হাজার বছর পূর্ব্বে রামায়ণরূপ হট্টগোলের সৃষ্টি) সর্ব্বশেষে জোর-গলায় ঘোষণা করেছেন :—

এ-দেশে যদি হাট নাও বসে থাকে, আমরা পশ্চিমের হাট হতে হট্টগোল সওদা করে গ্রামোফোনে ধরে এনে বীণাপানির বাণীকুঞ্জে ও মানস সরোবরের কূলে পাঁচ পাঁচ হাত অন্তর একটী করে বসিয়ে দিব। আজ বিশ্বব্যাপী ভাব-

বলিলেও এক দল রাগ করিবেন, আবার যদি বলি, ভাষার ঐন্দ্রজালিক কথ-কথায় উপমার এবং সুন্দর চিত্রের সমাবেশে আলোচনাটিকে দুর্ব্বোধ্য ও গৌণ করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা হইলেও অপর বন্ধুর দলটি মনে মনে রুষ্ট হইবেন। কিন্তু এ-কথা বলিলে বোধ করি কেহই রুষ্ট হইবেন না যে রবীন্দ্রনাথের সারগর্ভ উক্তিগুলি ভাল করিয়া ভাবিয়া বুঝিবার বিষয়; অল্প কথায়, সুত্রাকারে তিনি যে-সব কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহাকে বিস্তারিত করিয়া দেখা আবশ্যক।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম উক্তির মর্ম্ম কি তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্।

২

রবীন্দ্রনাথ ভূমিকাতেই জানাইয়াছেন যে, মানুষের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র রকমের বৃত্তি আছে। একটি দিয়া মানুষ বস্তুর সংজ্ঞা নির্ণয় করে, সীমা নির্ণয় করে। এই বৃত্তিটির নাম বুদ্ধি; ইহা কেবলি যা-কিছু সীমাবদ্ধ তাহার সম্বন্ধে পাইতে পারে। কিন্তু সীমার বাইরেও কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধি দিয়া মানুষ পায় না, পাইতে পারে না। তাহাকে মানুষ পায় বোধের দ্বারা। যাহা অসীম, যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহা মানুষের এই বোধের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই বোধ হইতেছে 'আত্মার ক্ষুধা'। 'যে প্রেমে যে ধ্যানে যে দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটায় তাই স্থান পায় সাহিত্যে, রূপকলায়।'

জ্ঞান-পিপাসাটাকে হৃদয়-বৃত্তি বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন না, আবার হৃদয়ের ব্যাকুল অনুভূতি-প্রেরণাকেও জ্ঞানের নামান্তর বলিয়া স্বীকার করেন না। অথচ এই উভয় দিক দিয়াই, জানার দুরন্ত পিপাসা এবং অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবার আকুলতা এই দুই ভাবের মধ্য দিয়াই মানুষ যা অসীম এবং অনির্ব্বচনীয় তাহার সন্ধান পাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই জ্ঞান ক্ষুধাকে শুধু বুদ্ধি বলিয়াই মনে করেন, না, ইহাকেও বোধ বলিয়া স্বীকার করেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার কথার ইঙ্গিতে মনে হয়, সত্যকার জ্ঞানকে তিনি বোধের স্তরেই স্থান দিয়াছেন—কারণ 'বোধ' হইতেছে অসীমের ক্ষুধা। জ্ঞান-পিপাসাকেও তাহা ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া কবি যে অনির্ব্বচনীয়কে অনুভব করিলেন বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তাহাকেই কি অন্য ভাবে সাক্ষাৎ করিলেন না?

সে তর্ক বাদ দিলেও আসল কথা দাঁড়ায় এই যে, সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়

সেই-প্রেম সেই-ধ্যান সেই-দর্শন—যাহার মধ্যে অসীমের অনির্ব্বচনীয়ের প্রকাশ। কারণ একমাত্র অসীমের প্রকাশেই আত্মার ক্ষুধার পরম নিবৃত্তি ঘটিতে পারে।

৩

সাহিত্যবিচারে দুইটি পদ্ধতি কল্পনা করা যাইতে পারে। যুগে যুগে সর্ব্বদেশেই সাহিত্য বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর লেখা লোক-সমাজের সমাদর পাইয়া আসিয়াছে। কোনো কোনো বিশেষ রচনা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে মতভেদ চিরকালই হইয়া আসিয়াছে, তাহা বাদ দিলেও যে-সব রচনাকে সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাদের সাধারণ ধর্ম্ম নির্ণয়ের পর সাহিত্যের একটা সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে পারা যায়। সাহিত্য-বিচারের এই প্রণালী বৈজ্ঞানিক মনের নিকট সমাদর পাইয়া আসিয়াছে। কবি-মনের নিকট তাহার বোধটিই চরম মানদণ্ড। বোধ করি, সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ আপনার বোধের দ্বারা সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও অনির্ব্বচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা অসীম, যাহাতে আত্মার ক্ষুধা নির্ব্বাণ ঘটে তাহাই সাহিত্য এমন কথা বলিলে প্রথমতঃ কিছুই বলা হয় না। অসীম বলিলে কোনো কথাই সুনির্দ্দিষ্ট হয় না; আত্মার ক্ষুধা বলিলেও তাহার অর্থবোধে যথেষ্ট গোলমাল থাকিয়া যাইতে পারে। আর সাধারণ ভাষায় মানুষ যাহাকে অসীম সত্য ও আত্মার ক্ষুধা বলিয়া বোঝে তাহাকেই যদি সাহিত্যের উপপাদ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সাহিত্যের চিত্রশালা হইতে প্রায় শতকরা নিরানব্বই অংশ বিলুপ্ত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়।

মানব-জীবনের সব প্রেরণা এবং প্রয়াসকেই যদি অসীমের দিকে তাহার আত্মপ্রকাশের ভঙ্গী বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইত, তাহা হইলেও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সংজ্ঞার একটা অর্থ নিরূপণ করা যাইত। কিন্তু তাঁহার আলোচনা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, মানব-জীবনকে তিনি সেরূপ মনে করেন না। এই জন্যই তাঁহার সংজ্ঞাটিকে সাহিত্যের সংজ্ঞা বলিয়া মানিতে চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠে। মানবজীবনে ছোট-খাটো সুখ-দুঃখ ভুল ত্রুটি আছে, ছোট-খাটো চাওয়া-পাওয়ার সংঘর্ষ আছে, বেদনা আছে। সাহিত্যে, রূপকলায় এই সব ছোট ছোট বস্তুকে লইয়া আলোচনা আছে। জীবনের বহু বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে শিল্পীর একটি অপরূপ আনন্দ আছে। কখনো বেদনায়, কখনো হর্ষে, কখনো কৌতুকে শিল্পী জীবনের এই বিচিত্র প্রকাশকে দেখাইয়াছেন, তাহাতে মানুষ

আনন্দ পাইয়াছে ; যদিচ সেখানে তাঁহার আত্মার কোনো বিপুল ক্ষুধা, তৃষ্ণার কোনো তৃষ্ণা তাহাতে নিবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কথা হইতেছে সাহিত্যের এই সব ভাব, এই সব ভাবনা এবং এই সব আবির্ভাবকে সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিব, না, আবর্জ্জনা বলিয়া বর্জ্জন করিব।

দৃষ্টান্ত তুলিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ তুলিয়া লইলেই তাঁহার উল্লিখিত সাহিত্য-সংজ্ঞার সম্বন্ধে মনে যথেষ্ট সংশয় জাগিয়া উঠে

৪

প্রবন্ধের আগাগোড়া যে রবীন্দ্রনাথের একটিমাত্র সংজ্ঞাই টিকিয়া আছে তাহাও মনে হয় না। কারণ, একটু অগ্রসর হইয়াই রবীন্দ্রনাথ সাধারণ সত্য আর সার্থক সত্যের কথা পাড়িয়াছেন। সুতরাং মুখ্যতঃ স্বীকার না করিলেও গৌণতঃ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আরেকটি সংজ্ঞা দিয়াছেন ; সাহিত্যের বিষয় সাধারণ সত্য নয়, সার্থক সত্য। 'সাধারণ সত্য হল এক, আর সার্থক সত্য হল আর।'...'যে জিনিসের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিসই সার্থক।'...'এক টুকরো কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত, অথচ কাঁকর পদে পদে ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে পড়লে তাকে তোলবার জন্য বৈদ্য ডাকতে হয়, ভাতে পড়লে দাঁতগুলো আঁৎকে ওঠে ; তবু তার সত্যের পূর্ণতা আমার কাছে নেই।'

প্রথম রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের রূপকলায় অসীমের প্রকাশ কামনা করিয়াছেন, তারপর সত্যের প্রকাশ প্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে ভাবগত ঐক্য রক্ষা করিতে হইলে বলিতে হয়, সত্য তাহাই, যাহা অসীম। অথচ সীমাকে যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে অসীম সত্যের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়, তবে সসীম সত্য সার্থক সত্য নহে এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারেন। সুতরাং সার্থক সত্য কি তাহা স্পষ্ট করিয়া জানা প্রয়োজন। যে জিনিসের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি তাহাই সার্থক এই একটি সংক্ষিপ্ত কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। এই কথাটিকে তিনি যদি আরো ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার মুখে রূপকলার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা জানিতে পারিতাম ; তাহা তিনি করেন নাই।

সুতরাং এখানে বুদ্ধিযোগেই তাঁহার কথাটিকে এক রকম করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ফটোগ্রাফ এবং চিত্রকলার মধ্যে একটা মস্ত পার্থক্য আছে, ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সেই আলোচনার মোটামুটি কথাটি এখানে অবতারণা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ফটোগ্রাফ এই বাস্তব জগতের কোনো একটা অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদের মনের এবং দৃষ্টির সমুখে তুলিয়া ধরে। আর চিত্রকর নির্দ্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে যে-ছবিটি ফুটাইয়া তোলেন তাহার মধ্যে একটি সমগ্রতা, সম্পূর্ণতা দিবার চেষ্টা করেন। কোনো বস্তু আপনার মধ্যেই পরিপূর্ণ নহে। সে তাহার পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনের মধ্য দিয়া অথবা দ্রষ্টার অন্তরের বহু অজ্ঞাত এবং অপরিস্ফুট ভাবরাশি পরিবেষ্টনের সাহায্যে আপনার অর্থটিকে ফুটাইয়া তোলে। ফটোগ্রাফ শুধু বস্তুটির সীমাবদ্ধ রূপ নির্দ্দেশ করিয়া দেখায়, কিন্তু তাহার যে পরিবেষ্টনের মধ্যে তাহার অর্থটি সুগোচর এবং সুস্পষ্ট, চিত্রকর তাঁহার কলা-কৌশলের দ্বারা সেই অল্প পরিসরের সীমার মধ্যেও সেই পরিবেষ্টনটিকে আঁকিয়া বস্তুটিকে সার্থক করেন, অর্থবান করিয়া তোলেন। এই জন্য ফটোগ্রাফ দেয় সাধারণ সত্যকে যাহা অর্থহীন, সুতরাং এক হিসাবে অসত্য, আর চিত্রকলা দিবার চেষ্টা করে সার্থক সত্যকে, যাহার প্রকৃত রূপটি সুস্পষ্ট ও সুগোচর।

একটি দৃষ্টান্ত দিই। শ্রীকান্তের অন্নদা দিদির কথা ধরা যাক্। একদা অন্নদা একটা সাপুড়ের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। লোকে তাহাকে কুলটা বলিতে কোনোই দ্বিধা করিল না। লোকের দৃষ্টিতে ঐ ব্যাপারটি আর বেশী কিছুই হইতে পারে না। শিল্পী দৃষ্টিগোচরকে যথার্থ করিবার উদ্দেশ্যে অগোচরকে টানিয়া আনিলেন ; যে পরিবেষ্টন সত্যই ছিল, যাহার দ্বারা অন্নদার গৃহত্যাগ পরম গৌরবে গৌরবান্বিত হইল, তাহা ছিল ফটো-শিল্পীর অগোচর। চিত্র-শিল্পী তাহাকে প্রকাশ করিয়া চিত্রকে যথার্থ অর্থবান্ করিয়া তুলিলেন।

যে জিনিসের মধ্যে তাহার নিজস্ব অর্থটি সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকেই সার্থক বলিতে পারা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথা বলিবেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ বস্তুর নিজস্ব পরিচয় সম্বন্ধে তাঁহার মত একটু ভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।

৫

কারণ, পরেই তিনি বলিয়া উঠিয়াছেন, 'কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়' 'একটি

পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত।' যদি কাঁটাগাছ এবং পদ্ম এই দুইটির সম্বন্ধে কথা উঠিত তাহা হইলেও রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, 'কাঁটাগাছটা আমার কাছে কিছুই নয়' 'পদ্মফুলটিই আমার কাছে সুনিশ্চিত।' অথচ রবীন্দ্রনাথ যাহাই বলুন, মানব-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকলেই কাঁটাগাছটিকেও সত্যের মর্য্যাদা দিতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের নিকট পদ্মেরই মধ্যে সত্যের পূর্ণতা প্রকাশ পাইল কেন, আর কাঁটাগাছে বা কাঁকরে পাইল না তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, আমরাও তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

তবে জীবনে, বিশেষতঃ রূপকলার ক্ষেত্রে যাঁহারা কাঁকর এবং কাঁটাগাছকে অস্বীকার করেন তাঁহাদের মনোভাব কতকটা বুঝিতে না পারা যায় এমন নহে।

জীবনের ক্ষেত্র ঠিক বৃন্দাবন নহে, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ ও করুণ সঙ্ঘর্ষ ও সংগ্রামই জীবনের সত্যকার পরিচয়। তা বলিয়া জীবনের এই সঙ্ঘর্ষ ও বিরোধই চরম হইয়া থাকুক এ কামনা আমরা কেহই করি না। যথার্থতার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে জীবনকে একটা নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ বলিয়াই হয়ত কথা শেষ করিতে হয়, কিন্তু মানব-অন্তরের সকরুণ কামনার দিক দিয়া এই বিপর্য্যয়কে কিছুতেই মানিয়া লইতে পারা যায় না। তাই মানুষ স্বপ্ন দেখে, কল্প-কুহক দিয়া একটি পরিপূর্ণতার জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মায়ায় আপনাকে মুগ্ধ ও আবিষ্ট করিয়া রাখিতে কত বিচিত্র চেষ্টা করে। সে-জগতে সে এমন গোলাপের চাষ করে, যাহাতে কাঁটা নাই। সেই জগতে বিমলা নিখিলেশকে ফিরিয়া পায় ('ঘরে-বাইরে'), বিজয়া নরেনের মিলন ঘটিয়া যায় ('দত্তা'), ললিতা শেখরের প্রেম অনিত্যতার গণ্ডী কাটাইয়া নিত্যতার মহিমায় মণ্ডিত হয় ('পরিণীতা'), হেমাঙ্গিনীর স্বামীর নিত্যদৃষ্টি খুলিয়া যায় ("দৃষ্টিদান")। সার্থক স্বপ্নে আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আত্মার ক্ষুধা ইহাতে কাহার কতটা প্রশমিত হয় জানি না, তবে আমাদের মধ্যে যে একটি শিশু-মন কোনো রকমে কাঠের ঘোড়াকে সত্যিকার ঘোড়া মনে করিয়া তাহাতে চড়িয়া পক্ষিরাজের পিঠে চাপিয়া তেপান্তরের মাঠ পার হইবার আনন্দ পায় তাহার আনন্দ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণেই বায়স্কোপের সিরীয়ালের নায়ক প্রতি মিনিটে দশবার নির্দ্ধারিত ও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়িয়াও হাসিতে হাসিতে শেষ অঙ্কে প্রণয়িনীর বাহুপাশে বদ্ধ হয়। লোক-প্রিয় উপন্যাসিকগণের গল্পের শেষ পাতাটি তাই চিরকালই মিলনের হাসি ও আনন্দে উজ্জ্বল।

কিন্তু মানুষের মন শৈশব পার হইয়া থাকে। তখন আর শিশুর মত স্বপ্ন

দেখিবার শক্তিও থাকে না, প্রবৃত্তিও থাকে না। এক দিক দিয়া শিশুমনের একটা অসাধারণ শক্তি আছে। বাস্তবের অভিজ্ঞতা তাহার কাল্পনিকতাকে কখনো শৃঙ্খলিত করিতে পারে না। বাস্তব তাহার নিকট নাই বলিলেও চলে; কল্পনা তাহার নিকট পরম সত্য। সমুখের ভাঙা চেয়ারখানি তাহার চোখে নাই বলিলেই হয়, কিন্তু ঐ ভাঙা-চেয়ারখানিকে সে আপনার কল্পনা দিয়া যে-ময়ুর-সিংহাসনে পরিণত করিয়াছে সেই ময়ুর-সিংহাসন তাহার নিকট এত বড় সত্য যে বোধ করি ব্রহ্মাণ্ডের নিকট তাহার ব্রহ্ম উহার চেয়ে বেশি সত্য হইতে পারে না। শিশুর এই কাল্পনিকতার উপর একটি সহজ অধিকার আছে সুতরাং তাহার কামনা-তৃপ্তির পথটিও সরল এবং সহজ।

শৈশব পার হইয়া মানুষ এই সরল ও সহজ পরিতৃপ্তির পথটি হারাইয়া ফেলে, কিন্তু এই কাল্পনিক-বৃত্তিটি হারাইয়া ফেলে না। সুতরাং এই বৃত্তির সহায়তায় সে আপনাকে ভুলাইবার ও সম্মোহিত করিবার নানা ফন্দী-ফিকির আবিষ্কার করিয়া থাকে। স্বপ্ন তখন জটিল হইয়া উঠে, রূপ-কথার রাজপুত্রকে তখন মনস্তত্ত্বের ও বস্তু-জগতের সমস্ত নিয়ম কড়াক্রান্তি মানিয়া তবে রাজকন্যার সন্ধান পাইতে হয়। অর্থাৎ বাস্তব-অভিজ্ঞতাগ্রস্ত কল্পনাকে নানা ফন্দীতে আপনার চরিতার্থতা সাধন করিতে হয়। ফন্দীটা যাহাই হোক, উদ্দেশ্যটা কিন্তু বদলায় না। আমাদের শিশুভাবাতুর মন কণ্টকহীন গোলাপটিই কামনা করে, কাঁকর তাহার নিকট অসত্য না হইয়াই পারে না। সে কেবলি আপনাকে বুঝাইতে চায় যে, আকাশটাই যথার্থ আর মাটিটা মিথ্যা, কাল্পনিক পরিপূর্ণতাটা নিত্যকালের, আর বাস্তবিক অপরিপূর্ণতা ও মলিনতাটা অনিত্যকালের অর্থাৎ 'অবস্থিতি সত্ত্বেও তার কোনো সার্থকতা নেই।'

রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের এই শৈশবিকতার দিক হইতে কাঁকরটা কিছুই নয় বলিয়া পদ্মফুলটির সার্থকতা কীর্তন করিয়া থাকেন, মন্দ নয়।

৬

কিন্তু যদি সত্যের দিক দিয়া, আত্মার ক্ষুধার দিক দিয়া, অসীম এবং অনির্ব্বচনীয়ের দিক দিয়া বলিতে চান যে যত অসীমতা এবং অনির্ব্বচনীয়তা ও সার্থকতা শুধু পদ্মফুলে, শুধুই জীবনের কোমল সুষম ও মাধুর্য্যে, কাঁটাগাছে ও কাঁকরে জীবনের যে ভীষণ রুদ্রতা ও প্রলয়চ্ছন্দ আছে তাহার মধ্যে কোনো অসীম অতল রহস্য নাই, কোনো বিপুলতা ও অর্থবত্তা নাই, তাহা হইলে বলিতে হইবে…কিন্তু

সে-কথা বলিতে হইবে কেন ? 'সাহিত্য-ধর্ম্ম'-প্রচারক আজ যাহাই বলুন, সাহিত্য-মর্ম্মের যিনি মরমী কবি-শিল্পী, তাঁহার কণ্ঠে, তাঁহার চিত্রে জীবনের ও সত্যের এই দিকটি যে না ফুটিয়াছে তাহা তো নয়। বরদাত্রী অলক্ষ্মীর যিনি বর প্রার্থনা করিয়াছেন ঝড়ের বিপর্য্যয়ে কাঁটার পথে যিনি জীবন-দেবতার অভিসার দেখিয়াছেন, তিনি কাঁকর কিছুই নয় বলিবেন কেমন করিয়া ? যেমন করিয়াই হোক, সাহিত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিতে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহাই বলিয়াছেন। ফাল্গুনীর কবি বলিয়াছেন 'আমরা ধ্রুবকে মানিনে', 'ধ্রুব সম্পদে আমাদের একটুও লোভ নেই।' 'আমরা অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী'; আজ তিনিই সুনিশ্চিত পদ্ম ফুলটির যাথার্থ প্রমাণ করিতে ও নিত্যকালের গৌরব দিয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে সমাকুল। হয়ত তাঁহার দুটি উক্তির কোনোটিই চরম নহে।

যাক সে কথা। কল্পনার শৈশবিকতা আলোচনা করিতে গিয়া কল্পনার স্বরূপটিকে অনেকখানি খর্ব্ব করা হইয়াছে। বলিতেছিলাম যে, আমাদের কামনারাশি শিশুকল্পনার সহায়তায় আংশিক অন্ধতার সৃষ্টি করিয়া আপনার একটা মনগড়া তৃপ্তির প্রয়াস পাইয়া থাকে কিন্তু ইহা হইতেই কল্পনার সত্যকার মর্য্যাদার পরিচয় পাওয়া যায় না। বয়স্ক মানবে আর শিশুতে যেমন একটা বিশাল ব্যবধান আছে, সুপরিণত কল্পনার সহিত তেমনি আমাদের শিশুকল্পনার একটি বিরাট পার্থক্য আছে।

অসীম অনির্ব্বচনীয়ের, জীবনের ও জগতের বিরাট ও জটিল রহস্যের এই যে প্রকাশ ইহাকে পরিপূর্ণ করিয়া সার্থক ও সত্য করিয়া দেখিতে হইলে বাস্তব জগতের সর্ব্ব বস্তুতে ও সর্ব্ব অবস্থায় তাহাকে দেখিতে হইবে। যদি কেহ বলেন, আনন্দময় ব্রহ্মের আবির্ভাব হইয়াছে শুধু আমার হাতের কাঁটা-বর্জ্জিত গোলাপের মধ্যে; ঐ মনসাকাঁটার গাছে তাহার আবির্ভাব ঘটে নাই, তাহা হইলে শুধু ইহাই বলিব তিনি ব্রহ্মের সত্যকার প্রকাশ দেখিতে পান নাই, তিনি আপনার আংশিক পরিতৃপ্তিকে পরিপূর্ণতার স্বরূপ বলিয়া মনে করিয়াছেন। রসস্বরূপে সাক্ষাৎ শুধু আকাশের সুদূর নীলিমার পানে চাহিয়া মাটির উপরকার শ্যামস্নিগ্ধতা ও পুষ্প-বৈচিত্র্যের দিকে চাহিয়া পাইলেই তাহা সত্য এবং যথার্থ, কিন্তু এ ধরণীর বুকের মধ্যে যে প্রলয়-দাবানল ফুঁসিয়া গর্জ্জন করিয়া মরিতেছে, যাহার জ্বালামুখী নিশ্বাস কখনো কখনো শ্যামলার সব হাসি ও সব তৃপ্তিকে দগ্ধ করিয়া শূন্যে বিলীন করিয়া দেয়, তাহার পানে চাহিয়া সেই অনির্ব্বচনীয়ের ও অসীমের কোনো পরিচয়ই যথার্থ-রূপে পাওয়া যাইবে না, শ্যামল প্রান্তরের আকুটাই নিত্য এবং যথার্থ আর

লেলিহান অগ্নির যে-আক্রতাটা একেবারে মিথ্যা, রসের ক্ষেত্রে তাহা একেবারে অবাস্তবিক, একথা যে মিথ্যা নয় তাহা বলি কেমন করিয়া ?

সত্যের এই যে হরি-হর-মূর্ত্তি তাহার ভয়াল ও প্রশান্ত এই যে বিচিত্র রূপ তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে চায় মানুষের পরিণত কল্পনা। এই কল্পনা তাই জীবনের ও জগতের বাস্তব ভিত্তির উপর সত্যের সমগ্রতাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে। সর্ব্বপ্রকার বিরোধ ও দ্বন্দ্বের মধ্যে এই কল্পনা যথার্থ সত্যের অনির্ব্বচনীয়তা ও অসীমতাকে প্রত্যক্ষ করিতে চায়।

কল্পনার এই বড় দিকটি ভুলিয়া গেলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।

৭

সাহিত্যের মধ্যে সত্যের পূর্ণতা ও যথার্থতা লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকা রচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্যের একটা নিবিড় যোগ খুঁজিয়া পাই না। একেবারে হঠাৎ তিনি শেষ দিকে সাহিত্যে জীব-ধর্ম্ম, পশু-ধর্ম্ম, যৌনমিলন ইত্যাদি লইয়া আলোচনা সুরু করিয়াছেন।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষ আপনাকে প্রচার করে না, সেখানে প্রয়োজনটিকেই প্রকাশ করে এবং সেই প্রয়োজনের দ্বারা সে যে বদ্ধ তাহাই জানায়। সেই কারণেই মানুষ আপনাকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সমগ্রভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষেত্রেই আমরা মানুষের বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকি। ভোজনের ক্ষেত্রে মানুষ আপনার প্রয়োজন সাধনেই ব্যস্ত ; কিন্তু যৌনমিলনের ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যৌনমিলনের ক্ষেত্রে মানুষ আপনার দ্বৈতরূপটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যৌনমিলনের মধ্যে একদিক দিয়া যেমন তাহার পশু-ধর্ম্ম অর্থাৎ দেহ-চৈতন্যের আবির্ভাব দেখিতে পাই, অপর দিক দিয়া তেমনি তাহার চিত্ত-ধর্ম্ম অর্থাৎ মনোময় চৈতন্যের প্রকাশ পাই। ভোজন-ব্যাপারে শুধু ঐ দেহ-চৈতন্যটাই ফুটিয়া উঠে বলিয়া সেখানে তাহার পরিচয়ের একটা সমগ্রতা পাই না, কিন্তু মানুষের মনোময় চৈতন্যের ক্ষেত্রে তাহার সমগ্র সত্তার একটি নিবিড় ও গভীর পরিচয় পাই। এই জন্যই মানুষের চিত্ত-ধর্ম্ম সাহিত্যের বস্তু হইতে পারিয়াছে। যদি ভুল না বুঝিয়া থাকি রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের নিজস্ব বিশিষ্টতাই সাহিত্যের আস্বাদনের বস্তু। মানুষের এই বিশিষ্টতা তাহার দেহ-ধর্ম্মের বা

পশু-ধর্ম্মের মধ্যে নহে; তাহার পরিচয় তাহার চিত্ত-ধর্ম্মে। চিত্ত-ধর্ম্মকে যখন রবীন্দ্রনাথ এত বড় করিয়া সাহিত্যে স্থান দিয়াছেন, তখন তাহার সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বেশী বলিলে সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে কোনো রূপ গোলমাল থাকিত না। চিত্ত-ধর্ম্ম বলিলে মানুষের সমগ্র মনোময় সত্তাটিকেই যদি বুঝিতে হয় তাহা হইলে যে চিত্ত-ধর্ম্মই সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু চিত্ত-ধর্ম্ম বলিতে যদি মনের মিলনের জন্য নিবিড় হৃদয়-বৃত্তিকেই শুধু বুঝিতে হয় তাহা হইলে শুধু উহাকেই একমাত্র সাহিত্যের বিষয়-বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা হইবেই। সাহিত্যের উক্তরূপ সংজ্ঞা কোন ব্যক্তি-বিশেষের ধারণা বলিয়া স্থান পাইলেও, সাহিত্যের ইতিহাস তাহাকে স্বীকার করিবে কি না সন্দেহ আছে।

৮

মানুষের এই সমগ্র মনোময় সত্তাটির বিচিত্র প্রকাশ যে কত ভাবে হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। নানা রকমের প্রেরণা মিলিয়া এই মনোময় সত্তার বিকাশটিকে জটিল ও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্ত প্রেরণার মধ্যে যৌনমিলনের প্রবৃত্তি মানব-জীবনের মাঝে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। যৌনমিলনের মধ্যে যে মানুষের দেহ-ধর্ম্মের প্রবল তাড়না ও মনোময় চৈতন্যের দীপ্তি রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে তা "প্রজনার্থং" নয়, কেননা সেখানে সে পশু; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ।' চিত্ত-ধর্ম্ম বলিতে রবীন্দ্রনাথ মানুষের সমগ্র মনোময় চৈতন্যের ধর্ম্মকে লক্ষ্য করেন নাই, তিনি এই প্রেমকেই চিত্ত-ধর্ম্ম বলিয়াছেন এবং এই চিত্ত-ধর্ম্মই সাহিত্যের বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তরুণ-তরুণীর প্রেম বলিয়া একটি বস্তু আছে। এই বস্তুটি আমাদের নিকট এত বড় আনন্দ এবং বিস্ময়ের বস্তু যে, ইহা আজ পর্য্যন্ত পুরানো হইয়া উঠিল না, ইহার মধ্যে যেন বিশ্ববিধাতা অনন্তনবীনতার উৎস-ধারাটিকে উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন। কপোত-কপোতীর ভালবাসা হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের তরুণ-তরুণী পর্য্যন্ত এই যে নর-নারীর পরস্পরের প্রতি অন্তহীন বিস্ময় ও আনন্দের আবেগময় প্রকাশ ইহা আমাদের ভাল লাগে। ইহার মধ্যে কোথাও দেহ-ধর্ম্ম ও চিত্ত-ধর্ম্ম একেবারে তেল-জলের মত বিভিন্ন হইয়া থাকিতে দেখি না। বরং যেন একটি অপরটিকে আশ্রয় করিয়াই পরিপূর্ণ হইতে পারিয়াছে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমকে আত্মার ক্ষুধা ও অনন্ত বোধের তৃপ্তি বলিয়া স্বীকার

করিবেন কি না জানি না। কারণ প্রেমের যাহা সর্ব্বোত্তম এবং সার্থক বিকাশ তাহা পাই খৃষ্টে-বুদ্ধে, যেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব পরিপূর্ণ ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। অথচ সাহিত্য শুধু বুদ্ধ-খৃষ্টের চরিত-চিত্রণেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক এ কামনা রবীন্দ্রনাথও করেন বলিয়া মনে করিবার কোনো হেতু নাই।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে মানুষের চিত্ত-ধর্ম্ম ও জীব-ধর্ম্ম ভাগ করিয়াছেন সেইভাবে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলিতে পারে না। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, মানুষকে তাহার দেহ-চৈতন্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিলে তাহার সমগ্রতা নষ্ট হইয়া যায়। মানুষ যেমন কেবল্ দেহ নহে, তেমনি সে বিদেহী মনও নহে। তবে তাহার মনোময় সত্তাটি দেহসত্তা হইতে ব্যাপক ও গভীর। এই কারণেই মানুষের মনোময় সত্তার পরিচয় দিলে মানুষকে সমগ্রতার দিক হইতে দেখান হয়। কিন্তু এই মনোময় সত্তাটিকে প্রেমময় করিয়া দেখাইতে হইলে মানবজাতিকে ও জীবনকে শিশু-মনের স্বপ্নলোকে লইয়া যাইতে হয়।

তার চেয়ে সত্য হইতেছে মানুষের এই বাস্তব সত্তাকে সত্য করিয়া দেখিবার চেষ্টা। সেখানে মানুষের মনোময় সত্তার বিচিত্র জটিলতা আছে, এবং তাহার মধ্যে আত্মপরিচয়ের প্রয়াস আছে।

৯

যৌনমিলনের জীব-ধর্ম্মটাকে রবীন্দ্রনাথ পশু-ধর্ম্ম বলিয়াছেন এবং পশু-ধর্ম্ম সাহিত্যের বস্তু হইতে পারে না তাহাই জানাইয়াছেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, আত্ম-প্রাধান্যের জন্য লোলুপতা ইত্যাদি কত রকমের বৃত্তি রহিয়াছে তাহাকেও পশু-ধর্ম্ম বলিতে হইবে কি না বলেন নাই। মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণ 'মনুষ্যত্ব' বিকাশের ইহারা পরিপন্থী এ কথা অস্বীকার্য্য নহে, অথচ মানব-জীবনে ইহারা কত বেশী স্থানই না অধিকার করিয়া আছে। আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে ও শিল্পে মানুষের জীবন যেখানে স্থান পাইয়াছে সেখানে মানুষের মনোময় প্রকৃতির এই সব বৃত্তিগুলিও স্থান পাইয়াছে। মানুষের জীবন যদি একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মফুল হইত তাহা হইলে হয়ত বেশ ভালই হইত, কিন্তু এই যে সুখে-দুঃখে, ভাল-মন্দে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জীবন বিচিত্ররূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে ইহা বেশ না হইলেও অনন্ত বিস্ময়ের বস্তু তাহাতে আর ভুল নাই। আর দেখা যাইতেছে, সাহিত্য-ধর্ম্ম ধর্ম্ম-সাহিত্যের মত শুধু প্রেমের বাণীকেই মুখ্য করিয়া তোলে নাই, বরং মানব-জীবনের

ও বিশ্বপ্রকৃতির উগ্র ও মধুর, ভীষণ ও সুন্দর বৈচিত্র্যকেই আপনার প্রচারের বস্তু করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং সেই দিক দিয়া যৌনমিলনও সাহিত্যে সব কালে ও সব দেশেই স্থান পাইয়া আসিয়াছে।

সমাজ-তত্ত্বের দিক দিয়া সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে-তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে।' এই উক্তিটির আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সামাজিক প্রভাব অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার মতে সাহিত্য সমাজকে ভালমন্দ করিবার দাবীও রাখে না এবং শক্তিও নাই। এইরূপ মনে না করিলে সামাজিক হিত-বুদ্ধির দিক দিয়া সাহিত্যে যৌনমিলনের কোনোরূপ সমাধান হইতে পারে না এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিতেন না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন, 'যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না' এবং এই নিত্যই যে সাহিত্যে বরণীয় তাহাও বলিতে ভুলেন নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় অলঙ্কার সাহিত্যের অতীতকে সম্পূর্ণই অস্বীকার করিয়াছেন। আমাদের আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যকে সমাজনীতির অধীন বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। সখীর মত সে আমাদিগকে মধুরভাবে সুবুদ্ধি দান করিয়া উন্নত করিবে, মানুষ করিবে এই তাহার মূল কথা। এই জন্য শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রেমকে বিবাহের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইয়াছে।

সাহিত্য যদি সত্য সত্যই মানুষের পশুধর্ম্মাতিরিক্ত উচ্চতর ধর্ম্মেরই বিকাশ হয় তাহা হইলে সেই সাহিত্যের মধ্যে যে-ভাব যে-ভাবনা প্রকাশ পাইবে তাহার সহিত সামাজিক হিত-বুদ্ধির সমূহগত কল্যাণ-বুদ্ধির কোনোরূপ নিবিড় যোগ থাকিবে না এমন কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারিলেও, বুঝিতে পারা যায় না।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যৌনমিলন লইয়া যে আলোচনা চলিতেছে, তাহাকে কলারসের দিক্ দিয়া বিচার করিবার কথা পাড়িয়াছেন। সুতরাং হিতবুদ্ধিকে বাহিরে রাখিয়া কলারসের কথাটি কি তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্।

১০

সাহিত্যের ভাব সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলঙ্কার আপনি

আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই সেই হ'ল সাহিত্যের।' সুতরাং যৌনমিলনের সেই ভাব এবং সেই ধর্ম্মই সাহিত্যের যেটিকে মানুষ 'অলঙ্কৃত ক'রে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায়।' যৌনমিলনকে কলারসের দিক দিয়া বিচার করিতে গিয়া অতি সংক্ষেপে এই অলঙ্কারের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সাহিত্যে যে-যৌন আলোচনাকে দণ্ডদান করিতে তাঁহার এত আয়োজন, সেই আলোচনার সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া তাহাকে কলারসের রাসায়নিক পরীক্ষাচ্ছলে তিনি শুধু এই একটি কথাই বলিলেন, অলঙ্কৃত বাণীতে যৌনমিলনের যে-দিকটিকে মানুষ প্রকাশ করিতে চায় তাহাই সত্য ও সাহিত্যের বস্তু। যে-অলঙ্কার কথাটিকে কলারস বিচারের কষ্টিপাথর করিয়া তোলা হইল তাহার সম্বন্ধে কোনো কিছুই না বলা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সমীচীন হয় নাই।

অলঙ্কৃত বাণী বলিতে হয়ত রবীন্দ্রনাথ শুধু সুন্দর প্রকাশই বুঝিয়াছেন ও বুঝাইতে চাহিয়াছেন। যে-কোনো বস্তুর বিশিষ্ট পরিচয়টিকে প্রকাশ করিতে পারিলেই সাহিত্যের বিচারে সেই প্রকাশকে সুন্দর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কুৎসিতের মুখে সেখানে কালো-রঙ-মাখানোটাই অলঙ্কার, তাহাকে সুন্দর করিয়া অর্থাৎ সুন্দর বর্ণের সুষমায় রঞ্জিত করিয়া তোলাটাই সেখানে অসুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভোজন-লোলুপতার একটা রূপ আছে, সে রূপটিকে মানুষ রসের দিক দিয়া মূল্যহীন বিবেচনা করে নাই, তাহাকে যখনই সে সার্থক রূপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে তখনই আমরা পেটুক-চূড়ামণির রূপ দেখিয়া তাহাকেও সুন্দর বলিতে বাধ্য হইয়াছি, সেখানে আমরা তাহার নিত্যকালের জন্য আত্মার ক্ষুধার দিক দিয়া তাহার কোন মূল্য আছে কি না বিচার করিতে বসি নাই, তেমনি মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা, পঙ্কিলতারও একটি রূপ আছে, সে-রূপও সাহিত্যিক প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার-বঞ্চিত নয়। জীবনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বস্তুর একটা যথাযথ স্থান ও পরিমাণ আছে; যিনি বস্তুর যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে তাহার যথার্থ সীমার মধ্যে সত্য করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ রূপকার। অবশ্য স্থানবিশেষে এই সামঞ্জস্য (proportion) কতটুকু রক্ষিত হইল বা না হইল ইহা লইয়া মত-মতান্তরের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং হইতে পারে। তবু দেখিতে পাইতেছি যে, রূপকলার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে সাহিত্যের বিষয়গত সীমানির্দ্দেশ চলিতে পারে না। অলঙ্কৃত বাণী কাহাকে বরণ করিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া চলে না। এরূপ নির্দ্দেশ কোনো কালেই টেকে নাই। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলিতে হয়, 'সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা।'

এই কারণেই যৌনমিলনের জীব-ধর্ম্ম ও চিত্ত-ধর্ম্ম এই দুইটি দিকই বাঙলা কাব্য সাহিত্যে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকাশ পাইতে দ্বিধাবোধ করে নাই। জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ভারতচন্দ্র হইতে যৌনমিলনকে অলঙ্কৃত বাণীতে প্রকাশ করিয়া আসা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই যে যৌনমিলনের নিবিড় চিত্ত-ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা হয় নাই। সুতরাং বাঙলা সাহিত্যে দৈহিকতার উপদ্রব আধুনিক কালের একটা ধার-করা উপদ্রব একথা না বলিলেও বলা যাইতে পারে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সাহিত্যে যৌনমিলন সম্বন্ধে যে বে-আব্রুতা আসিয়াছে তাহা বিদেশ হইতে সম্প্রতি আমদানী হইয়াছে ও বাঙলা সাহিত্যের যা-অতীত, যা-নিত্য তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিতেছে। বে-আব্রুতা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যে-দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাকে অতীতকাল হইতে দীনবন্ধু মিত্র পর্য্যন্ত টানিয়া আনা যাইতে পারে। তার পর বর্ত্তমান যুগেও শরৎচন্দ্র এবং নরেশচন্দ্র পর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ আছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ নরেশচন্দ্রকে তাঁহার সৎসাহসের জন্য পিঠ ঠুকিয়া বাহবা দিতে ত্রুটি করেন নাই দেখিয়াছি। একবারও কিন্তু চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্রের বে-আব্রুতায় রবীন্দ্রনাথ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন নাই। অথচ আজ অতি-আধুনিক সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন কি ভয়ানক বে-আব্রুতার বিষ-বায়ু ছড়াইয়া পড়িল যাহার জন্য রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন তাহা ঠিক ধারণা করিতে পারা যায় না।

রসবোধের ক্ষেত্রে সামাজিক হিতবুদ্ধির দোহাই রবীন্দ্রনাথ দিতে পারেন নাই; তিনি দিয়াছেন আব্রুর দোহাই। 'মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য। যে আভিজাত্য আছে, রসের ক্ষেত্রে সেইটিই নিত্য।' রবীন্দ্রনাথের এই কথার ঠিক অর্থ কি তাহা বলিতে পারি না। মনে হয়, রসবোধের মধ্যে আব্রুর কথা আসে না; আব্রু হইতেছে আমাদের রুচিবোধে, উহা আমাদের সামাজিক সত্তার একটি প্রমাণ। এই রুচিবোধ আমাদের রসবোধের উপর কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করেই। রসবোধ মানুষের অন্তর্নিহিত কতকগুলি মূল বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, আর রুচিবোধ প্রকাশ পায় মানুষের যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল সামাজিক সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া। এই কারণেই মানুষের রুচিবোধের দ্বারা তাহার রসবোধ প্রত্যেক যুগেই কিছু না কিছু প্রভাবিত হইয়াছে। তাই দেখিতে পাই কাজরীর মধ্যে হিন্দুস্থানীর রসবোধ একেবারে

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে; অথচ সেই কাজরী যে-বিষয়-বস্তুকে লইয়া উল্লসিত একজন বাঙ্গালীর রুচিবোধ তাহার দ্বারা এতখানি আহত যে, তাহাতে তাহার রসবোধই হইতে পারে না।

১২

অতঃপর 'ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধুলো-মাখা আধুনিকতা'র 'ধার করা নকল নির্লজ্জতা'র বর্ব্বরতাকে ভর্ৎসনা করিয়া এই হাট-বিহীন হট্টগোলকে অসহ্য বলিয়া কাহাদের পানে রুষ্ট-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি আলোচনা শেষ করিয়াছেন, বলিয়াছেন 'আধুনিক সাহিত্যের এইটেই বাহাদুরী'!

ধার-করা এবং বিদেশ হইতে আমদানী এই দুটি কথার উপর রবীন্দ্রনাথ বেশ একটু জোর দিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন নহে। এখনো সেদিনের স্মৃতি অস্তরাগের মত বাঙলা সাহিত্যাকাশের দিগন্তে হয়ত লাগিয়াই আছে, যেদিন এই কথাটি বলা হইত যে, রবীন্দ্র-সাহিত্য আমাদের দেশের সাহিত্যধারা হইতে বিচ্ছিন্ন এবং ইহার রসপায়ী শিকড়গুলি পাশ্চাত্য ভাব ও ভাবনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। নারায়ণের মুখ দিয়া সেদিন 'ধার-করা' 'বিদেশী ফেরঙ্গভাব' 'নকল অবাস্তবতা' ইত্যাদি আশীর্ব্বচনগুলি রবীন্দ্রনাথের উপরও বর্ষিত হইয়াছিল। এ-কথাও সেদিন উচ্চারিত হইতে শোনা গিয়াছিল যে, রবীন্দ্র-সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছুতেই স্থায়ী অর্থাৎ নিত্য-গৌরবের অধিকার পাইবে না। হয়ত সেই সব কথা সাময়িক উত্তেজনার মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল।

কিন্তু যদি সত্য করিয়া বলিতে হয়, তাহা হইলে একথা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, রবীন্দ্রনাথ বহুল পরিমাণে বিদেশ হইতে ভাব-বস্তু আমদানী করিয়াছেন, যাহার সহিত দেশের অতীত ধারার তেমন কোনো যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য জগতে বের্গসঁ (Bergson)-র দার্শনিক চিন্তার প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও দৃষ্টির অভিনব ভঙ্গী প্রকাশ পাইল 'বলাকা' ও 'ফাল্গুনীর' মধ্যে, তখন তাহাকে ধার না বলিয়া কি বলিতে হইবে? নীট্‌শের তত্ত্ববাদ ইউরোপে প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ঘরে-বাইরে'র [illegible]

যোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে। ইবসেনের Doll's House 'খেলার ঘর' প্রকাশিত হইবার পরেই তো 'স্ত্রীর পত্র'খানি বাঙলার ডাক-পিয়ন আসিয়া বিলি করিলেন। শত নির্য্যাতনেও স্বামীকেও পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াটা তো এ-দেশে কোনো দিক

দিয়াই সত্য হইতে পারে না। যে কবির কাব্যে সীতার ম্যালেরিয়া হওয়া উচিত নয়, সেই কবির কাব্যে স্ত্রীরও স্বামীকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তারপর রসবোধের আব্রুর কথা। 'ঘরে-বাইরে'তে সাহস করিয়া দৈহিকতার উপদ্রবটাকে খুব স্পষ্ট করিয়া না তুলিলেও তাহাতে সন্দীপ-বিমলার মধ্যে কি বে-আব্রুতা প্রকাশ পায় নাই? যে-প্রেমে যে-ধ্যানে কেবল মাত্র 'আত্মার ক্ষুধা' মেটে সন্দীপ-বিমলার মধ্যে কি কলাবিৎ তাহারই প্রকাশ দেখাইয়াছেন, না, শেষ অবধি একটা অত্যন্ত অপ্রিয় ব্যাপার ঘটিতে দেন নাই বলিয়াই পুস্তকখানি রসবোধের বে-আব্রুতা হইতে রক্ষা পাইয়াছে? 'চোখের বালি'তে যাহা ঘটিল তাহাই বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থান পাইল তাঁহার কোন্ মতবাদটিকে সমর্থন করিয়া? 'স্ত্রীর পত্র' যে গোলমাল সৃষ্টি করিল তাহাই বা ভারত সাগরের এ-পারের কোন্ হাটের মধ্যে? 'নষ্ট-নীড়ে'র যে ব্যাপারটি তাহাই বা কোন্ পদ্মফুলের সৃষ্টি করিল তাহাও তো বুঝিতে পারা যায় না! বিজ্ঞানের দোহাই বা সাধারণ সত্যের দোহাই তো রবীন্দ্রনাথ দিতে পারেন না। তবে দেবরের প্রতি চারুর এই তন্ময়তা সৃষ্টির দ্বারা রসবোধের কোন্ চরম উৎকর্ষ দেখানো হইল, রসের ক্ষেত্রের কোন্ আভিজাত্য ফুটিল তাহাও তো বুঝিবার উপায় রহিল না!

তাই বলিতেছিলাম যে, ধর্ম্মপ্রচারক যাহাই বলুন কলা-রসিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথই আধুনিক সাহিত্যের নূতন পথের দিকে নবীনকে তাহার পুচ্ছটিকে আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে রুচিবাধাগ্রস্ত হইয়া লেখনীকে নিরস্ত করিয়াছেন, অতি-আধুনিক সেখানে রুচির বাধাকে অবহেলা করিয়া সত্যের সমগ্রতাকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই লেখনীকে স্বাধীন এবং বহুস্থলে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দিয়াছেন। রুচি এবং রসবোধের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে সত্য; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যেকার সীমা-রেখাটি এতই সূক্ষ্ম ও অনিশ্চিত যে, তাহার সম্বন্ধে সুবিচার করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার তাহা রবীন্দ্রনাথও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। যদি তেমন ভ্রান্তি হইয়াই থাকে—হইয়াছেও নিশ্চয়—তাহা হইলে সেই ভুলের জন্য আধুনিক সাহিত্যকে একেবারে বর্ব্বর আখ্যা দেওয়া বোধ করি খুবই সমীচীন ও সঙ্গত হয় নাই।

'উত্তরা': আশ্বিন ১৩৩৪, পৃ ২৮-৩৭

সাহিত্যের নব-কলেবর

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

জীবনের ভাঙ্গা-গড়া

প্রায় পনেরো বৎসর হইল রুশ-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বর্ত্তমান উপন্যাস-সাহিত্যের কৃত্রিম আবহাওয়ার কথা তুলিয়াছিলাম। আমাদের গল্প ও উপন্যাসের মনুষগুলা যেন আপনার আভিজাত্য-গৌরবে মজগুল, ঘটনা-বস্তুগুলা যেন শুধু এক প্রেমেরই বিচিত্র ফরমাসে গড়া, সমস্ত জিনিষটা যেন বৈঠকখানার স্বল্প আমোদের মত কৃত্রিম ও পোষাকী। ইহাকে নব-নাগরিক সাহিত্য নাম দিয়া আমি রুশ-সাহিত্যরথিগণের ব্যাপকতর আলেখ্য, প্রত্যক্ষ ঘটনাবস্তু ও করুণ সহানুভূতির কথা বলিয়াছিলাম এবং এই দিকেই যে আমাদের সাহিত্য একটা বিপুল প্রসার ও নবীন জীবনের সহিত পরিচয় পাইবে তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছিলাম।

প্রায় এক যুগ অতীত হইল। যে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা অতি কঠোর হইতে চলিয়াছে। দুঃখের বিষয়, ধনীর হাতে আর সাহিত্য-ভাণ্ডারের চাবি-কাটী নাই। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীই এখন বাংলার সাহিত্য সৃষ্টির প্রজাপতি। কিন্তু প্রজাপতির মত তাহারা কল্পনার রঙীন পাখায় বাগানে বাগানে শুধু দল সঞ্চয় করিয়া বেড়ায় না। জীবনে আমাদের অতি নিদারুণ ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামে মর্ম্মন্তুদ ভাবে খসিয়া পড়িতেছে। মধ্যবিত্ত আমরা কাল ও ভাগ্যের উপরে হটিয়া যাইতেছি। বিলাস-সম্ভারে নিত্য-সেবিত এক পোষাকী পুতুল ছিলাম। পূর্ব্বে, না ছিল আমাদের অবলম্বন, না ছিল সৎসাহস, সুপ্ত চৈতন্যে লুক্কায়িত যত বিলাসের স্বপ্ন তাহারই লহর তুলিয়া একটা সাগরের তলায় সাহিত্যের মায়াপুরী আমরা সৃষ্টি করিয়াছিলাম। নিষ্ঠুর জীবনের ঝঞ্ঝাবাতে আজ সে মায়াপুরী কোথায় মিলাইয়া গেল। বিলাস ও সৌখীনতার রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া আমরা আজ রাস্তায় বসিয়াছি। চারিদিকে প্রখর আলোর সংঘাত ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে সবল দুর্ব্বলকে পদদলিত করিয়া জীবনের রাজপথে

অগ্রসর হইতেছে। দৈনন্দিন জীবনের আজ কি ভীষণ উত্তাপ, প্রতিযোগিতার কি অশোভন লীলা, হৃদয়হীনতার কি নিদারুণ অভিব্যক্তি! রাজপথে মজুর ও মধ্যবিত্ত কাঙ্গাল বেশে গা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া আজ দাঁড়াইল। শুধু দৈন্য, শুধু ক্লেশ, শুধু নির্য্যাতন সেখানে মানুষের সঙ্গী নহে, যদিও এই গুলিরই সহিত মানুষের এখন প্রত্যক্ষ নিবিড় পরিচয়। আছে তবুও সেখানে মায়া-মমতা ; স্নেহ-প্রীতি, মানুষের মহত্ব, আত্মার চরম অভিব্যক্তি।

এই গুলিকে লইয়া আজ আমাদের এক নূতন জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, একটা সাহিত্যও এই জীবনকে আশ্রয় করিয়া অতি সত্য, অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাবে সৃষ্ট হইল, —মানুষের আত্মার প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিতে, মানুষ দীন হইলেও হীন নহে, হীনতার মধ্যেও আত্মার পরিপূর্ণ মহিমারও প্রকাশ হয়, এই বাণী নব্য-সাহিত্যে।

এই নূতন সাহিত্য যেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল অমনি চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। প্রবীণ সম্পাদক বলিলেন, বকাটে ছেলের অপরিপক্ক জেঠামির সাহিত্যে অনধিকার প্রবেশ। এঁরা নূতন কাগজ করিলেন। সমালোচক বলিয়া উঠিল, এ সব বেকার লোক সাহিত্যকে অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া বসিয়াছে। আর্টিষ্ট বলিলেন, এ সাহিত্য একেবারে নগ্ন ও অসভ্য, ইহাতে শিল্পের সৌন্দর্য্য নাই।

এত সমালোচনার কারণ হইতেছে এই নূতন গল্প উপন্যাসের ভাষা ও ঘটনা-বস্তুর সহিত রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের একেবারে মিল নাই। রুশ-সাহিত্যে তুর্গনেভ ও গর্কি বুনিনের রচনায় যে প্রভেদ নব্য-সাহিত্যে ও পূর্ব্বেকার সাহিত্যে অনুরূপ পার্থক্যই লক্ষিত হয়।

হীনতার মহিমা

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যে সকল নূতন মানুষকে সাহিত্যের আসরে আনিয়াছেন তাহাদের দেহের ও মনের কদর্য্যতা, গ্লানি ও অপরিচ্ছন্নতা আমাদের কাহারও প্রীতিকর নহে। কিন্তু প্রীতি এক জিনিষ, অনুভূতি আরেক জিনিষ। এমন একটা সহানুভূতি তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, মানুষের হীনতা, বীভৎসতা, পঙ্গুতা, অন্ধতা আমাদের চোখে পড়ে না, উজ্জ্বল ভাবে উদয় হয় মানুষের একটা নিরাবিল মনুষ্যত্ব। নাই বা হল এ সাহিত্যের মানুষ, মহাভারতের চিরস্মরণীয়গণের মত সাধু ও ধার্ম্মিক, সে যে মানুষ—এই বলেই যে সে আমার প্রিয়, জীবনের পরম সান্ত্বনা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই উল্‌কী-কাটা সুরকীর কলের মজুরণী নেত্য আমাদের হিসাবে গৌরবময় জীবন অতিবাহিত করে না; কিন্তু তাহার জীবনের গোপন অনুচ্চারিত ব্যথা যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের হৃদয়ে মনুষ্যত্বের চিরন্তন প্রশ্ন জাগায়—এটা সুনিশ্চিত। ঠন্‌ঠনের মুচীর মেয়ে পাঁচি সংস্কারের বশে তাহার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা ও সমস্ত কামনাকে অস্বীকার করিয়া আপনাকে নির্ম্মম ভাবে বঞ্চনা করিয়াছে, এবং জীর্ণ কন্থিতে আপনার লজ্জা আবরণ করিতে না পারিয়াও ভ্রাতাকে দারিদ্র্যের নিদারুণ লজ্জা ও পাপের স্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সদা সচেষ্ট,—হলেই বা সে মুচিপাড়ার রণচণ্ডী কিন্তু সাহিত্যের আসরে সে ত একটি নিষ্ফলযৌবনা, মমতাময়ী ভগিনীরূপে দেখা দিল। যত দিন মনুষ্যত্ব আছে ততদিন ভগিনীর মর্য্যাদা, অন্ধকার অপরিসর গুণরাশিনাশী পঙ্কিল বস্তির মধ্যে অথবা বাধা বন্ধনহীন ধনি-পরিবারের স্বচ্ছন্দ জীবনের মধ্যে তাহার প্রকাশ হউক, ইহাতে কিছু আসে যায় না।

শুধু দেখিতে হইবে ঘটনা-সংস্থানটা সহজ, সরল, সত্য হইল কি না। শৈলজানন্দ অতসী ও অতসীর মার চিত্র আঁকিয়াছেন, কাঙ্গাল, উপায়হীন নারী যৌবনের ভাণ্ডারে ডাকাতি করিয়া রোগ ও অতিশ্রম তাহাকে পথে বসাইয়াছে, সে ও তাহার ম্লান-মুখী স্বামি-পরিত্যক্তা ভিখারিণী মাতা—দুই জনেই নর্দ্দমার ফেনের দ্বারা লালিত-পালিত। বাস্তবিক বস্তি-জীবন শৈলজানন্দ প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যের প্রত্যেকেরই লেখনীতে অতি স্পষ্ট সহজ ভাবে ফুটিয়াছে।

নূতন ভাষা

তাই ভাষাও হইয়াছে তাঁহাদের নূতন রকমের এক, ভাষার দিক হইতে ইঁহাদের দান বড় কম গৌরবের নহে। অচিন্ত্যবাবু বর্ণনা করিতেছেন—মাঠ ও বাজার, রেল-রাস্তা পেরলেই মাঠ,—সমস্ত হাওয়া একচেটে করে রেখেছে। এ দিকের ঘেঞ্জি সহরতলি ধোঁকে,—লজগড়ে পুঁয়ে-পাওয়া সহর। শৈলজানন্দের সৃষ্ট—যমুনা-গাঁয়ের অন্ধ কুঞ্জবিহারীর সহিত লখিন্দরের আলাপ অথবা ষোলআনার কথোপকথন, ভৈরবতলার আলাপ প্রেমেন্দ্র মিত্রের লক্ষ্মীকান্ত-শিবু অথবা পটলী-হুলোর কথাবার্ত্তা বাংলা সাহিত্যে নূতন জিনিষ। এ সকল ভাষা সতেজ, জীবন্ত, মর্ম্মস্পর্শী। তথাকথিত, কথিত ভাষার মত ইহা ন্যাকামিতে পূর্ণ নহে, খাঁড়ার মত ইহা কাটিতে কাটিতে চলে। মানুষগুলোর যেমনি শুক্‌নো খোসা-ওঠা মুখ, কোটরে ঢোকা চোখ, রোগে, অতিশ্রমে, অত্যাচারে ঠোঁটগুলি তাহাদের যেমন বাঁকা, তীক্ষ্ণ

ভাষাও তাহাদের তেমনি শক্ত ও জোরালো। আধুনিক ছোট গল্পের অভ্যস্ত চায়ের পেয়ালার উপর কথিত ভাষার মত হালকা ও ঠুনকো নহে।

রসের বৈচিত্র্য

সর্ব্বাপেক্ষা বড় গৌরব ইহাদের, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অপেক্ষা ইহারা জীবনের জটিলতা ও বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাইয়াছেন। সাহিত্য-গুরু-গণের অপেক্ষা ইহাদের চিত্রপট অনেক বড়, অনেক রহস্যময়, অনেক নূতন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দামিনী শচীশ, শ্রীবিলাস জ্যাঠামহাশয়, ভাই-ফোঁটা প্রভৃতি গল্পে ও নানা গল্প কবিতায়, ও শরৎচন্দ্র তাঁহার শ্রীকান্ত, মহেশ ও দেবদাসে বাংলার গল্প-সাহিত্যে যে নূতন ধারার সন্ধান করিয়াছিলেন, সেই ধারাই—এই নূতন লেখকগণের রচনায় পূর্ণ ও বিচিত্র-ভাবে বহিয়া চলিয়াছে, নিত্য নূতন জীবনরসের ঢেউ তুলিয়া।

সাহিত্য যখন রাজবেশ এবং উকীল ব্যারিষ্টার কেরাণীর ধড়াচূড়া ত্যাগ করিয়া একবারে কাঙ্গাল সাজিয়া দিন-মজুরের সহিত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল, ঘটনা ও রসের বৈচিত্র্য ত হইবেই। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গল্প-সাহিত্যের প্রধান বিড়ম্বনা বার বার এই হয় যে, শিল্পীর অনুযায়ী ঘটনার সমাবেশ করা যায় না। যাঁহাদের সহিত তাঁহারা আমাদের সচরাচর পরিচয় করাইয়া দেন তাঁহারা যে আমাদেরই মত আচার ও সংস্কারাবদ্ধ। একটা সমাজ-দ্রোহী ঘটনাবস্তু সৃষ্টি করিলে, জিনিষটা আবেষ্টন হিসাবে এমন বেমানান হইবে যে, রসসৃষ্টিরও হানি হইবে ইহাতে। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি' এবং শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' সংস্কারের সীমানা যাহাতে অতিক্রম না হয় এই সাবধানতা ও আড়ষ্টতায় কত না ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সমাজবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীর চরিত্রকে বাঁচাইতে যাওয়ার চেষ্টাটাই রস সৃষ্টির পক্ষে খুব মারাত্মক জিনিষ। আমাদের প্রধান উপন্যাস-রসিক-গণের গোড়াকার বাধা হইয়াছিল ইহাই।

আমাদের নব্য সাহিত্যিকগণ এই বাধা হইতে মুক্ত। যাহাদের জীবন তাঁহারা আঁকিতেছেন বা সমালোচনা করিতেছেন তাহারাই যে একবারে বে-পরোয়া সংসারের পরিত্যক্ত টুটা-ফুটার দল। সমাজ যে ইহাদেরকে ঘৃণ্য দূষিত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে, তাই ইহাদেরও সমাজের বিরুদ্ধে অভিযান। যদি বিদ্রোহী না হয় তবে পশুর মতন হীন, পঙ্গু হয় ইহারা।

অতিশ্রম, অনশন ও অত্যাচার ইহাদের মানসিক ও নৈতিক অবনতি আনে—

ইহা অনিবার্য্য। তাই পানওয়ালী রুক্মা, বামুনদিদি হোটেলওয়ালী, পাঁকের পটলী, মজুরনী দরদিয়া, গৃহহীনা দাসী, কলঙ্কিতা।

ঘটনা-বস্তুর বৈচিত্র্য

সমালোচকগণ বলেন—এই অতি-আধুনিক সাহিত্য মানবের আদিম প্রবৃত্তিকে নগ্ন করিয়া দেখাইয়াছে। নূতন সাহিত্যে যৌনপ্রেম সময়ে সময়ে কদর্য্য ভাবে অঙ্কিত আছে সত্য। তাহার প্রধান কারণ, যাহাদের জীবনে আলো ও আনন্দ নাই, প্রেম তাহাদের প্রাথমিক ক্ষুধা না হইয়া পারে না। কিন্তু প্রেম এ সাহিত্যের একমাত্র, এমনি প্রধান উপকরণও নহে। বরং সমাজের ভাঙ্গাগড়াকে আশ্রয় করিয়াই যৌনপ্রেম ফুটিয়াছে। মানুষের সঙ্গে মানুষ শতগ্রন্থিতে আবদ্ধ। যেখানে কোন একটি গ্রন্থি শিথিল হয়, বা কেহ উহাকে টানিয়া ছেঁড়ে সেইখানেই এক একটি Tragedyর সৃষ্টি; গৃহ বা সমাজের ভাঙ্গন এই নূতন সাহিত্যের প্রধান উপকরণ হইয়াছে। পূর্ব্বেকার সাহিত্যের ঘটনাবস্তু অধিকাংশই সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হইতে সংগৃহীত। তাই ঘটনার সমাবেশে একটা বৈচিত্র্যহীনতা এমন-কি সৌসাদৃশ্য দোষ অনেক সময়ে এড়াইতে পারা যায় না। আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবন-যাত্রাই যে এক-ঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন, নানা বিধি আচার ব্যবহারের দ্বারা তাহা সংহত ও আবদ্ধ। একটা ব্যাপকতর জীবন হইতে ঘটনা-বস্তু আহরণ করাতে সাহিত্য খুব নূতন ও বিচিত্র হইয়া উঠিল। প্রেমের এখানে একঘেয়ে অবাধ প্রভুত্ব নাই। কোথায় দেখিতেছি একটি নূতন রেল তৈয়ার হইল, দলে দলে শ্রমজীবিগণ মজুরীর খোঁজে আসিল, পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা গেল, সামাজিক বিন্যাস নষ্ট হইল, ধ্বংসের মধ্যে কত ব্যথা, কত ক্লেশ নূতন সাহিত্যের উপকরণ হইল। নূতন সহর বসিয়াছে। বাড়ীর পর বাড়ী তৈয়ারী আরম্ভ হইল। সম্পত্তির নেশায় মানুষ হৃদয়হীন হইয়া সবুজ পৃথিবীকে অবমাননা করে। বাড়ীগুলা যেন শ্রীহীন, কাঙ্গাল, প্রাণবর্জ্জিত। তাহারা যেন শুধু মানুষের মাথা গুঁজিবার আশ্রয়, হাত পা ছড়াইবার, প্রাণ মেলাইবার জন্য নহে। আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরে দেখা দেয় একটা জীর্ণ, নির্জীব ভব্যতা। ভব্যতা হইল সহরতলির দেবতা; সে নিজের মুখ নিজে সাহস করিয়া দেখে না; অন্তর বাহিরের দারিদ্র্যকে মিথ্যার আবরণে ঢাকিতে ঢাকিতে সে মানুষের জীবনকে ক্রমশঃ দুর্ব্বহ করিয়া তুলে। ইংরাজ কোম্পানী ছায়া-সুনিবিড় গ্রামের পাশে কয়লার কুঠি খুলিল, চারিদিক ইমারত অট্টালিকায় কিছু দিনের মধ্যেই ভরিয়া গেল।

দোকানী-বুদ্ধি গ্রামের সামাজিক শান্তি নষ্ট করিল। কিছুকাল পরেই কয়লা কাটা শেষ হইল। খনিতে আগুন লাগিল। বারবিলাসিনীর চাকচিক্যের মত নূতন সহরগুলির ঐশ্বর্য্য কোথায় অন্তর্হিত হইল। কিন্তু অদূরে গ্রামটি পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি রহিয়াছে—মাঠ ঘাট শস্যে সম্পদে বার মাস সবুজ। শুধু মাটির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়া গিয়াছে অসহায় কুলি-কামিনের, ক্ষুদ্র মুদী-দোকানদারের। বেলজিয়মের কবি ভেরহিয়াবেন যে বৃহৎ শিল্প-কারখানা প্রবর্ত্তিত সামাজিক বিপ্লবের অশান্তি ও ক্লেশের কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাই নূতন আকারে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল। হামসেন Growth of the Soil-এ যে খনির তৈয়ারী, ক্ষণিকের ঐশ্বর্য্য চিরন্তন কৃষি-সম্পদের সঙ্গে তুলনা করিয়া তুচ্ছ করিয়াছেন সেই সার্ব্বজনীন তত্ত্বটি আবার কেমন নূতন, কেমন সত্য ভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইল। নূতন সাহিত্যে বাস্তবিক ঘটনা-বস্তুর বৈচিত্র্যের সীমা নাই।

সাহিত্যের প্রেমধর্ম্ম

এইখানেই এ সাহিত্যের প্রধান গৌরব। জীবনের যে দিকটার সহিত আমরা এত দিন সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে পারি নাই, যেখানে শত মানুষ তাহাদের অশান্ত অশ্রুজল, উদাসীন, শুষ্ক কঠিন মাটির উপর ফেলিতেছে, সান্ত্বনা দিবার তাহাদের কেহ ছিল না, নবীন সাহিত্যিক আমাদেরকে সঙ্গী করিয়া সেই অভিশপ্ত ব্যর্থ জীবনের মধ্যে লইয়া যাইতেছেন, অসংখ্য মানবের সন্তপ্ত হাহাকার দূর দূরান্তের ব্যর্থ ক্রন্দন শুনাইবার জন্য। যে সাহিত্য যত বেশী মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের গ্রন্থি অটুট করে, নূতন করিয়া তৈয়ার করে, তাহার তত মূল্য। নূতন সাহিত্যের একটা আত্মভোলা, বিশ্বজয়ী অগাধ প্রেম আছে—সমাজ ও সাহিত্য উভয়ের পক্ষে এই প্রচণ্ড সহানুভূতি কম কল্যাণকর নহে।

শতবাধা বিঘ্ন দৈব দুর্ব্বিপাকে মানুষ সদাই হোঁচট খাইতেছে, ক্ষত বিক্ষত ও পঙ্গু হইতেছে। পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘন করাইবার ভার সাহিত্যকে লইতে হয়। কারণ, যে পঙ্গু, হউক না সে অসহায়, পদানত, ধূলায় মলিন, কিন্তু তাহার অন্তর-বাহির যে সেই এক বিরাট মহৎ পুরুষের উপাদানে তৈয়ারী।

নিদ্রিত নারায়ণ

বাস্তবিক দুর্নিবার কলঙ্ক, দুরপনেয় কদর্য্যতা ও জন্মপঙ্গুতার মধ্যেও মানুষ যদি

তাহার বৃহত্তর জীবনের ব্যাকুলতার পরিচয় দেয়, তাহার নিষ্পাপ মনুষত্বের আহ্বান যদি গভীর দুরাশার অন্ধকার হইতেও শুনা যায়, তাহা হইলে ইহাই কি সর্ব্বাপেক্ষা মহিমার কথা হয় না? ইহার মূল্য যে দ্বিধাবিরোধহীন অনেক পুরুষ ও নারীর অপরীক্ষিত, সৌখীন ধর্ম্ম ও সতীত্বের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। আবার যদি পতনের অতল সীমাহীন অন্ধকারে তাহারা একেবারে ডুবিয়া যায়, আর না মাথা তুলিতে পারে, আমরা কি সেই আশাহীন অতলের অগৌরবের মাঝে দাঁড়াইতে ব্যাকুল হই না। তাহারা ত মানুষ এবং তাহাদেরকে মানুষ বলিয়া না বুঝিলে, না ভালবাসিলে আমরা যে অ-মানুষ থাকিয়া যাইব। দুঃখ, অতৃপ্তি, বিফলতা তাহা হইলে আমাদেরও হইবে। নূতন সাহিত্য দেশকে এই পাপ ও অকল্যাণ হইতে বাঁচাইয়া রাখুক।

মজুর শ্রমজীবীদিগের অতিশ্রম ও অনশন, সহরতলীর বস্তির ভীষণ অস্বাস্থ্য ও পাপাচার লইয়া দেশে আমি বহুকাল ধরিয়া আলোচনা করিয়াছি। ইহাদের নিত্য জীবনের কদর্য্যতা ও দৈন্য প্রত্যেক মানুষকেই পীড়া দেয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পীড়া দেয় এই চিন্তা সে, ইহারা এই দৈন্য ও কদর্য্যতাকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লয়, জল আকাশ বাতাসের মতো এ গুলি যেন ভগবানেরই দান। নিষ্ফল আক্রোশে আমি 'নিদ্রিত নারায়ণ' বলিয়া একটি ক্ষুদ্র নাটক লিখিয়া বসিয়াছিলাম, সে বহু বৎসরের কথা, – বস্তির পাপ, অনাচার, অত্যাচারের মধ্যে নারায়ণ যেন দীনহীন রোগী, পাপী হইয়া সমাজের নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন।

'আলোক লভিয়া হইছ অন্ধ
মুক্তি তেয়াগি হইছ বন্ধ
ত্যজিয়া সুখ, দুঃখানন্দ
তুমি দুখ-লোক-চারী হে।'

এ নির্য্যাতনের পরিণাম কোথায়? বিপ্লবে নহে। কারণ, বিপ্লবে জাগে শক্তি, জয় হয় হিংসার। পদদলিত মনুষ্যত্বের ইহাতে পরিপূর্ণ জাগরণ হয় না। সত্যকার জাগরণ হয় সদ্ভাব ও সহানুভূতির উন্মেষে। উন্নত ও অবনত মানুষের মৈত্রী ও প্রীতির উদ্বোধনে। রুশ-সাহিত্য এই নূতন জাগরণের সহায় হইয়াছিল। আমাদেরও নবীন সাহিত্য নির্য্যাতিত নারায়ণের মুক্তির বাণী প্রচার করুক।

লেখকগণ

এই নবীন সাহিত্যের পুরোহিতদিগের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র হইয়াছেন দার্শনিক,

বহুদর্শী। তিনি এই আন্দোলনকে আধ্যাত্মিকতার ছাপ দিয়াছেন। মহনীয় ভাবুকতা তাঁহার, অথচ বাস্তবতার উপর ঝোঁক ও আয়ত্ত তাঁহার কম নহে। বেনামী বন্দর হইয়াছে এই দুনিয়া, সব অথর্ব্ব ভাঙ্গা জাহাজের ভিড় এইখানে।

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙ্গা জাহাজের ভিড়।
শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল, আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কজ্জা ও কল বেগ্‌ড়াল অবশেষে,
জৌলষ গেল ধুয়ে যার, আর পতাকাও পড়ে নুয়ে
জোড় গেল খুলে, ফুটো খোলে আর বইতে যে নারে ভেসে,
তাদের নোঙর নাবাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়
যত হতভাগা অসমর্থের নির্ব্বাসিতের নীড়।

আবার ভগবানকে ডাকিয়া কহিয়াছেন,—

কাঁদিবার সাধ
তাই তুমি মোর সাথে ছোট হবে, লুটাবে ধুলায়,
আঘাত করিবে আপনারে,—মূঢ় অবিশ্বাসে
আবার ভাসিবে আঁখি-নীরে!
তোমার কান্নার খেলা অপরূপ, অদ্ভুত, ভীষণ, বুদ্ধির অতীত,
যত কান্না ধরণীতে; তার মাঝে তুমি কাঁদ
এই শুধু জানি—
আর ধন্য আপনারে মানি।

শ্রীশৈলজানন্দ হইয়াছেন এই আন্দোলনের কথক ও প্রচারক। কথকের মতন তাঁহার বলিবার কমনীয় ভঙ্গী। মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধে অসাধারণ পারদর্শিতা তাঁহার। অবনত মানব-সমাজের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তালে তালে তাঁহার নিপুণ লেখনী দ্রুত চলিতে থাকে। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (খুনী আসামীর লেখক), শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সান্যাল ও শ্রীজগদীশ গুপ্ত গল্প-সাহিত্যে এই নূতন পথেরই পথিক। সমাজের কুটিলতা, নির্ম্মমতা নৃশংসতার মাঝে ইহারা কাঁদিয়াছেন এবং মানুষকে ধন্য মানিয়া সাহিত্যকে নূতন মহিমায় গৌরবান্বিত করিতেছেন।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্রভাবে এই আন্দোলনকে এখন পুষ্ট

করিতেছেন। গীতিকবিতায়, গল্পে উপন্যাসে সব দিকেই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার বেদের বাতাসীর চিত্র বাংলা সাহিত্যের একটি অপরূপ নূতন সম্পদ। সবজীওয়ালীর নিষ্ফল যৌবনের অপরিতৃপ্ত মমতা গুলো দিন-মজুরের অসহায়তা ও ক্লেশ, একটা নূতন প্রকার ঘটনাবস্তু ও আবেষ্টনের মধ্যে অতি মনোরম হইয়াছে। ভাষা তাঁহার অতি সতেজ ও সর্ব্বতোমুখী, চিন্তা তাঁহার নূতন, শিল্পও তাঁহার অনবদ্য।

শিল্প-পদ্ধতি

নূতন সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখা দিয়াছে। চৈতন্য যখন অতি-জাগ্রত হয়, আবেগ যখন দুরন্ত হয়, তখন নক্সাই বেশী তৈয়ারী হয়। উপন্যাসে যেন ইহা গীতিকবিতার মত। প্রচণ্ড বেগ অন্তরে তাহার, তাই যে সহিষ্ণুতা উপন্যাস-সৃষ্টির উপকরণ তাহার অভাব বলিয়া যেন উপন্যাস ঠিক একটা গড়িয়া উঠে না। হমসনের Wanderers-এর মত অচিন্ত্য সেনগুপ্তের বেদে ধারা-বাহিক রূপে ঘটনার স্রোতে গা ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে। গর্কীর গল্প-সমুদয়ের মতন প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক ও আগামী কাল, শৈলজানন্দের ষোল-আনা বা বাণভাসি নক্সা হিসাবে অতি রমণীয়। উপন্যাসের শিল্পপদ্ধতি বিচিত্রভাবে রুশিয়া, ফ্রান্স ও নরওয়েতে এখন প্রকাশ পাইতেছে। উপন্যাস এক কাঠামে গড়া কোন দেশে হয় নাই, হইতে পারে না। বাংলার গল্প-উপন্যাসে নানা শিল্পপদ্ধতি অনুধাবন করাই বাঞ্ছনীয়। নূতন সাহিত্যিকগণের মধ্যে কেহ না কেহ ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে করিতে এমন একটি প্রণালী খুঁজিয়া পাইবেন যে সত্যি সত্যি নূতন মানবের একটা epic মহাকাব্য তৈয়ারি হইয়া যাইবে। বঙ্গ-সরস্বতী কোন্ অজানা ভাবুকের গলায় বরমাল্য প্রদান করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। এ মাল্যের কুসুম-সুরভি নন্দন কানন হইতে চয়ন করা নহে; জগতের যত ব্যথিত, দলিত হৃদয় শোণিত রাঙ্গা হইয়া মাল্যের বিচিত্র কুসুম সাজাইয়াছে; মন্থর মানবের অনাদি ক্রন্দনাশ্রুতে অভিষিক্ত মাল্যের ডোরাখানি; স্পর্শ তাহার বিশ্ব-সৃষ্টির নিগূঢ় ব্যথার মত সুতীক্ষ্ণ। এ মাল্য গ্রহণ করিবার জন্য কে প্রথম হইতেছেন? কাহার এ মহাভাগ্য হইবে? আমরা তাঁহাকে অনতিদূর অতীত হইতে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতেছি।

'উত্তরা': আশ্বিন ১৩৩৪, পৃ ৬৫-৭০

সাহিত্যের রীতি ও নীতি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উক্ত ধর্ম্মের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাভরে কবির উদাহরণগুলিকে রূপক এবং যুক্তিগুলিকে সবিনয়ে রসরচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উভয়ের মত-দ্বৈধ ঘটিয়াছে প্রধানতঃ আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া।

ইতিমধ্যে বিনা দোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধ দলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে আমার মতামত এম্‌নি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, ঢোক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছ্‌লাইয়া পলাইবার আর পথ রাখেন নাই। একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

এদিকে বিপদ হইয়াছে এই যে, কালক্রমে আমারও দুই চারিজন ভক্ত জুটিয়াছে; তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন্ কম? দাওনা তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।

আমি বলি, সে যেন দিলাম কিন্তু তার পরে? নিজে যে ঠিক কোন্ দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তাছাড়া ওদিকে নরেশবাবু আছেন যে! তিনি শুধু মস্ত পণ্ডিত নহেন, মস্ত উকিল। তাঁর যে-জেরার পরাক্রমে কবির যুক্তি-তর্ক রস-রচনা হইয়া গেল, সে-জেরার প্যাঁচে পড়িলে আমি ত একদণ্ডও বাঁচিব না। কবি তবুও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তির কোঠায় পৌঁছিয়াছেন, আমি হয়ত ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি কোনটারই নাগাল পাইব না, ত্রিশঙ্কুর ন্যায় শূন্যে ঝুলিয়া থাকিব! তখন?

ভক্তরা বলে, আপনি ভীরু।

আমি বলি, না।

তাহারা বলে, তবে প্রমাণ করুন।

আমি বলি, প্রমাণ করা কি সহজ ব্যাপার! 'রস-সৃষ্টি' 'রসোবোধন' প্রভৃতির

রস-বস্তুটির মত ধোঁয়াটে বস্তু সংসারে আর আছে না কি? এ কেবল রস-রচনার দ্বারাই প্রমাণিত করা যায়,—কিন্তু সে সময় আপাততঃ আমার হাতে নাই।

এ তো গেল আমার দিকের কথা। ও-দিকের কথাটা ঠিক জানিনা কিন্তু অনুমান করিতে পারি।

প্রিয়-পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই, আমরা ত আর পারিয়া উঠিনা, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না না, ধনুর্বাণ নয়, ধনুর্বাণ নয়,—গদা। ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক-পল্লীর দিকে। লক্ষ্য? কোন প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে।

কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে ঈপ্সিত লাভ না হোক শব্দ এবং ধুলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন এবং বিনীত-ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বারম্বার প্রশ্ন করিতেছেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন! হাঁ কি না বলুন?

কিন্তু এ প্রশ্নই অবৈধ। কারণ, কবি ত থাকেন বারোমাসের মধ্যে তেরোমাস বিলাতে। কি জানেন তিনি, কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচি-ধর্ম্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশী-ধারী অশুচি-ধর্ম্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালিকলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি, কবে কোন্ মহীয়সী জননী অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকাগৃহেই সন্তান বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময়, ধৈর্য্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই। তাঁহার অনেক কাজ, দৈবাৎ এক-আধটা টুক্‌রো টাক্‌রা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুইই গিয়াছে। সুরু হইয়াছে শুধু চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত গর্জন। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।

ভক্ত-বাক্যের মত প্রামাণ্য সাক্ষ্য আর কি আছে? অতএব, তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়াছে আধুনিক সাহিত্যে কেবল সত্যের নাম দিয়া নর-নারীর যৌন মিলনের শারীর-ব্যাপারটাকেই অলঙ্কৃত করা চলিয়াছে। তাহাতে লজ্জা নাই, সরম নাই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য্য নাই, রস-বোধের বাষ্প নাই,—আছে শুধু ফ্রয়েডের

সাইকো-এনালিসিস্। অথচ, যে-কোন সাহিত্যিককেই যদি তিনি ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ত শুনিতে পাইতেন তাহারা প্রত্যেকেই জানে যে সত্য মাত্রই সাহিত্য হয় না। জগতে এমন অনেক নোঙ্‌রা সত্য-ঘটনা আছে যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোনমতেই সাহিত্য রচনা করা চলে না।

কবির হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে, সজিনা, বক, কুমড়া প্রভৃতি কয়েকটা ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই। গোলাপ-জাম-ফুলও না, যদিচ সে, শিরীষ ফুলের সর্ব্ব-বিষয়েই সমতুল্য। কারণ? না, সেগুলা মানুষে খায়। রান্নাঘর তাহাদের জাত মারিয়াছে। তাই উদাহরণের জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন গঙ্গাদেবীর মকরের কাছে। অথচ, হাতের কাছে বাগ্‌দেবীর বাহন হাঁস খাইয়া যে মানুষে উজাড় করিয়া দিল সে তাঁহার চোখে পড়িল না। কুমুদ ফুলের বীজ হইতে ভেটের খৈ হয়, এমন যে পদ্ম তাহারও বীজ লোকে ভাজিয়া খাইতে ছাড়ে না। তিল ফুলের সহিত নাসিকার, কদলী বৃক্ষের সহিত সুন্দরীর জানুর উপমা কাব্যে বিরল নহে। অথচ সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভার প্রতি বিতৃষ্ণার অপবাদ কোন কবির বিরুদ্ধেই শুনি নাই। আজ নরেশচন্দ্র বৃথাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়াছেন যে, বিম্বফল অনেকে তরকারি রাঁধিয়া খায়। উত্তরে কবি কি বলিবেন জানি না, কিন্তু তাঁহার ভক্তরা হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিবেন, খাওয়া অন্যায়। যে খায় সে সৎ-সাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি বশতই এরূপ করে।

কিন্তু এই লইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিরর্থক। এগুলা যুক্তিও নয়, তর্কও নয়, কোন কাজেও লাগে না। অথচ, এই ধরণের গোটা কয়েক এলো-মেলো দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া কবি চিরদিনই জোর করিয়া বলেন, এর পরে আর সন্দেহই থাক্‌তে পারে না যে আমি যা বল্‌চি তাই ঠিক এবং তুমি যা বল্‌চ সেটা ভুল।

কিন্তু এ কথাও আমি বলি না যে, আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে দুঃখ করিবার আদৌ কারণ ঘটে নাই, কিম্বা রবীন্দ্রনাথের এবম্বিধ মনোভাব একেবারেই আকস্মিক। তাঁহার হয়ত মনে নাই, কিন্তু বছর কয়েক পূর্ব্বে আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, সেদিন তাঁহার বিদ্যালয়ের একটি বারো তেরো বছরের ছাত্র পতিতার সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিয়াছে।

আমার ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের ছোড়দা হঠাৎ কবি-যশোলুব্ধ হইয়া কাব্য-কলায় মনোনিবেশ করিলেন। এবং বাঙ্‌লা ভাষায় গভীর ভাব প্রকাশের যথেষ্ট সুবিধা হয় না বলিয়া ইংরাজি ভাষাতেই কবিতা

রচনা করিলেন। রচনা করিলেন কি চুরি করিলেন জানি না, কিন্তু কবিতাটি আমার মনে আছে।

A lion killed a mouse
And arrived into his house ;
Then cried his mother,
And therefore cried his sister.

ছন্দ ও ভাবের দিক দিয়া কবিতাটি অনবদ্য। কিন্তু তুমুল তর্ক উঠিল, মদার কার? সিঙ্গীর না ইঁদুরের? বড় বৌ ঠাকরুণ ক্ষণকাল কান পাতিয়া শুনিয়া বলিলেন, না না ওদের নয়। ও কবির মদার। 'পতিতা' গল্প রচনার বিবরণ শুনিলে বৌ ঠাকরুণ হয়ত বলিবেন, এ ক্ষেত্রে কাঁদা উচিত ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের। আর কাহারও নয়। এ তো গেল অসাধু-সাহিত্যের দিক। আবার সাধু-সাহিত্যের দিকেও তরুণ কবির অভাব নাই। এদিকে যিনিই কবিতা বা গান লেখেন তিনিই লেখেন, তোমার বীণা আমার তারে বাজিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে তোমার ঝিলিক-মারা অরূপ মূর্তিটি দেখিতে পাইতেছি, বুকের মাঝে তোমার নিঃশব্দ পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, খেয়ার ঘাটে বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কাণ্ডারি! এখন পার কর। ইত্যাদি।

একটা উদাহরণ দিই। ভাদ্র মাসের 'কেতকী' পত্রিকায় গান ছাপা হইয়াছে—

তোমার ভাঙার গানে তোমায় নেব চিনি
পরাণ পাতি শুন্‌বো পায়ের রিনি ঝিনি!
তোমার কাল-বোশেখির ঝড়ে তোমায় নেব দেখে
তোমার শ্রাবণ-ধারা অঙ্গে আমার নেব মেখে।
আমার বুকের মাঝে তোমার আঘাত-চিহ্নখানি—
আমার রোদনের মাঝে তোমার দৈববাণী!
ভুল ক'রে যে ভুলবো তোমায় হবে না তা
(তোমার) আঘাত এলে কোথায় বা তার লুকাবো ব্যথা?
আমার ছড়িয়ে প'ল সকল খানে—
সারা বুকে
আমার জড়িয়ে গেল সকল হিয়া
দুঃখে সুখে!

সেথায় আমি তোমায় খুঁজে নেব চিনি।—

(আমার) পরাণ পাতি শুন্‌বো নূপুর রিনি ঝিনি।

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী কবিতাটির ন্যায় এ গানখানিও অনবদ্য। কি ঝঙ্কারে, কি ভাবের গভীরতায়, কি বৈরাগ্যের বেদনায়! 'কেতকী'র তরুণ সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিলাম, রচয়িতার বয়স কত? সে বন্ধু-গৌরবে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, আজ্ঞে, পোনর ষোলর বেশি নয়!

মনে মনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, দেশশুদ্ধ সাহিত্যিক-বালক-বালিকার দল যখন প্রহ্লাদ হইয়াই উঠিল, এবং 'ক' লিখিতে কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল, তখন ওরে অতিবৃদ্ধ! এক মাথা পাকা চুল লইয়া আর বাঁচিয়া আছিস্ কিসের জন্য?

সাহিত্য-সৃষ্টি অনুকরণের মধ্যে নাই। ভালর-ও না, মন্দের-ও না। হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্য-পদবাচ্য হয় না। বৃদ্ধ কবির গীতাঞ্জলিও যত বড় কাব্যগ্রন্থ তাঁহার যৌবনের চিত্রাঙ্গদাও ঠিক তত বড়ই কাব্য-সৃষ্টি। লাঞ্ছনার আঘাত ও গৌরবের মালা যেমন করিয়াই তাঁহার শিরে বর্ষিত হোক না। অথচ অনুভূতিহীন বাক্য যত অলঙ্কৃতই হোক ব্যর্থ। পতিতার অনুকরণও ব্যর্থ, গীতাঞ্জলির অনুকরণও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। দেশের সাহিত্য-সম্পদ ইহাতে কণামাত্রও বর্দ্ধিত হয় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রস-বস্তু লইয়া আমি আলোচনা করিতে পারিব না। কারণ, ও আমি জানি না। রসিক অরসিকের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেও আমি অপারক। কবির বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধা ঠিক যে কি এবং কিসে মেটে সে আমার অনধিগম্য। কিন্তু একটা কথা জানি যে কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্য ত নয়ই। 'সোনার তরী'র যা লইয়া চলে 'চোখের বালি'র তাহাতে কুলায় না। সজিনা ফুলে বক ফুলে সোনার তরীর প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলা না হইলেই নয়। তেপান্তর মাঠ এবং পক্ষীরাজ ঘোড়া লইয়া কাব্যের চলে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের চলে না। এখানে ঘোড়ার চার পায়ে ছুটিতে হয়, পক্ষবিস্তার করিয়া উড়ার সুবিধা হয় না।

কবি "সাহিত্য-ধর্ম" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 'মধ্য যুগে এক সময়ে য়ুরোপে শাস্ত্র-শাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেচে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে একথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল—ভুলেছিল

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য—তার সিংহাসন ধর্ম্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হ'ল। বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায়না। তার প্রভাব মানব-মনের সকল বিভাগেই আপন পিয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তকমা পরে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তি-স্বভাব-বর্জ্জিত—তার ধর্ম্মই হচ্চে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরেচে।'

কবির এই উক্তির মধ্যে বহু অভিযোগ নিহিত আছে, সুতরাং কথাগুলিকে একটুখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। বিজ্ঞানের প্রতি কবির হয়ত একটা স্বাভাবিক বিমুখতা আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বলিতে যে কি বুঝায় আমি বুঝিলাম না। বিজ্ঞান বলিতে যদি শুধু Sex-Psychology, Anatomy অথবা Gynaecology বুঝাইত তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যে ইহার অবারিত প্রবেশে আমিও বাধা দিতাম। কেবল অবাঞ্ছিত বলিয়া নয়, অহেতুক ও অসঙ্গত বলিয়া আপত্তি করিতাম। পৃথিবী সূর্য্যের চারিপাশে ঘোরে ইহা যত বড় কথাই হোক সাহিত্যের মন্দিরে ইহার প্রয়োজন গৌণ, কিন্তু যে সুবিন্যস্ত, সংযত চিন্তাধারার ফল এই জিনিষটি, সে চিন্তা নহিলে কাব্যের চলে চলুক উপন্যাসের চলে না। বিজ্ঞান ত কেবল অপক্ষপাত কৌতূহল মাত্রই নয়, কার্য্য-কারণের সত্যকার সম্বন্ধ-বিচার। চার এবং চারে আট হয়, এবং আট হইতে চার বাদ দিলে চার থাকে ইহাই বিজ্ঞান। এ মনোভাবকে ভয় কিসের? কিন্তু তাই বলিয়া নোঙরা যে সাহিত্যের অন্তর্গত নয় একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিজ্ঞান হইলেও নয়, অবিজ্ঞান হইলেও নয়, সত্য হইলেও নয়, মিথ্যা হইলেও নয়। গল্পের ছলে ধাত্রী-বিদ্যা শিখানোকেও আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলি না। বোধ হয় বাঙ্‌লা দেশের একজনও অতি-আধুনিক সাহিত্য-সেবী একথা বলে না।

বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ধর্ম্ম পুস্তক রচনা করা যায়, আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করা যায়, রূপকথা-সাহিত্যও রচনা করা না যায় তাহা নহে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে। রাজার পুত্র গেলেন চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তর মাঠের দুর্গম পথ পার হইয়া রাজকন্যার সন্ধানে। কোটাল পুত্রের ডিটেক্‌টিভ বুদ্ধি তাঁহার নাই, সওদাগর পুত্রের বেনেবুদ্ধি তাহার নাই, আছে শুধু রস। গিয়া বলিলেন, তুমি যে তুমি এই আমার যথেষ্ট। এই রস উপভোগ করিবার

মত রসজ্ঞ ব্যক্তির সংসারে অভাব নাই তাহা মানি, কিন্তু ভিন্ন রুচির লোকও ত সংসারে আছে? তাহারা গিয়া যদি বলে রাজপুত্র তোমার মনের মধ্যে রাজকন্যার রূপ-যৌবন স্থান পায় নাই, যৌতুক স্বরূপ অর্দ্ধেক রাজত্বের প্রতিও তোমার কিছুমাত্র খেয়াল নাই, তুমি মহৎ। কন্যাটি যে ঘুঁটে-কুড়োনির কন্যা নয় রাজার কন্যা ইহা তোমার যথেষ্ট। মনস্তত্ত্বের অবতারণায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু রাজপুত্র—তোমার মনের কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া না বলিলে ত এই উচ্চাঙ্গের রস-সাহিত্যের সমস্ত রসটুকু উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, ত ইহাদের মুখেই বা হাত-চাপা দিবে কে?

এই ধরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সাহিত্য-রচনায়। পরলোকগত সাহিত্যিকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য উহার উল্লেখ করিতেছি না, করিতেছি হাতের কাছে একটা অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অসম্ভব কল্পনার উদাহরণ পাইতেছি বলিয়া। বাঙ্‌লা দেশে তাঁহার পাঠক-সংখ্যা বিরল নয়। আমি নিজে দেখিয়াছি মুদির দোকানে একজন গ্রন্থ পাঠ করিতেছে এবং বহুলোকে গলদশ্রুলোচনে সেই সাহিত্য-সুধা পান করিতেছে। নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র দরিদ্র নায়ক মা কালীর কাছে স্বপ্নে আদেশ পাইয়া সাত ঘড়া সোনার মোহর গাছতলা হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিয়া বড়লোক হইল। ছেলে মরিল কিন্তু ভয় নাই। শ্মশানে জটা-জুট-ধারী তেজঃ-পুঞ্জ-কলেবর এক সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাবে ছেলে চিতার উপরে 'বাবা' বলিয়া উঠিয়া বসিল। রসজ্ঞ শ্রোতার দল কাঁদিয়া আকুল। তাহাদের আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। সেখানে কেহই ঠেলা দিয়া প্রশ্ন করে না, কেন? কিসের জন্য? তাহারা বলে, দরিদ্র নায়ক বড়লোক হইয়াছে ইহাই ঢের। মরা-ছেলে প্রাণ পাইয়াছে ইহাই আমাদের যথেষ্ট,—ইহাতেই আমাদের বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা মেটে। ইহা অনির্ব্বচনীয়—এই প্রকার সাহিত্য-রসেই আমাদের হৃদয়ের বসন্তলোকে কল্পলতার ফুল ফুটে।

কলহ করিবার কি আছে? কিন্তু আমি যদি এ কাজ না পারি, নিজের গ্রন্থের দরিদ্র নায়ককে মা কালীর অনুগ্রহ জোগাড় করিয়া দিতে সক্ষম না হই, জটা-জট-ধারী সন্ন্যাসীকে খুঁজিয়া না পাইয়া মরা-ছেলেকে দাহ করিতে বাধ্য হই, ত নিশ্চয় জানি আমার বই তাহারা পুড়াইয়া ছাই করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু উপায় কি? বরঞ্চ, হাত জোড় করিয়া চতুরাননের কাছে গিয়া বলিব, তাহারা আরও খান কয়েক বই আমার পুড়াক, সে আমার সহিবে, কিন্তু এই রসজ্ঞ ব্যক্তিদের আত্মার ক্ষুধা বোধের ক্ষুধা মিটাইবার সৌভাগ্য 'শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।'

কিন্তু কেন? কেন এইজন্য যে, কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। ইহাদের ধর্মও এক নয়, ধর্মের সীমানাও এক নয়। এবং মানুষের বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধার জাতি-ভেদ এতই গভীর ও বিস্তৃত যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব-নিয়ন্ত্রিত কল্পনাকে বিসর্জ্জন দিলে ইহাদের অর্থই প্রায় থাকে না।

কবির কাঁকর-পদ্মের উদাহরণে নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহা যুক্তিও নয়, নৈয়ায়িকের দৃষ্টান্তও নয়। অতএব, ইহা রস-রচনা। আমার বোধ হয় উপাখ্যান হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অতিশয় দুরূহ। আমি ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই। বস্তুতঃ কাঁকর বরণীয় কি পদ্ম বরণীয়, চড়াই পাখী ভালো, কি মোটর গাড়ী ভাড়া বলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কবি তাঁহার সাহিত্য-ধর্ম্মে নর-নারীর যৌন-মিলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার মনে হয় উপন্যাস-সাহিত্যেও তাহা খাঁটি কথা। তাঁহার বক্তব্য বোধ হয় ইহাই যে, ও-ব্যাপারটা ত আছেই। কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দুটি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে এইটিই আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক, ইহাই হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন। নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমারেখা কি ইহার আছে না কি যে, ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। এক জনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর, অপরের হাতে তাহাই কদর্য্যতার কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু এ সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আসল উপদেশটি সকল সাহিত্য-সেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত। নর-নারীর যৌন-মিলন যে সকল রস-সাহিত্যের ভিত্তি এ সত্য কবি অস্বীকার করেন নাই। তথাপি মোট কথাটি বোধ হয় তাঁহার এই যে, ভিত্তির মত ও-বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক্। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়। ততই শিল্পীর ইচ্ছামত তাহাতে কারুকার্য্য রচনা করা চলে। গাছের শিকড়, গাছের জীবন ও ফুল-ফলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হোক তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্য্যও যায়, প্রাণও শুকায়। এ সত্য যে অভ্রান্ত তাহা ত না বলা চলে না। অবশ্য, ঠিক এ জিনিষটিই আধুনিক সাহিত্যে ঘটিতেছে কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে অনেকগুলি নজির তুলিয়া দিয়া বলিতেছেন, 'শারীর-ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা, চুম্বনের স্থান

সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্য-সম্রাট্। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে।' আমি নিজেও একজন ছোট সম্রাট্ কিন্তু আলিঙ্গন ত দূরের কথা, চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে কোথাও দিতে পারিলাম না। নর-নারীর মধ্যে ইহা আছেও জানি, চলেও জানি, দোষেরও বলিতেছি না। আমাদের সমাজে এ বস্তুটিকে লোকে গোপন করিতে চাহে বলিয়াই বোধ হয় সুদীর্ঘ সংস্কারে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় ইহার প্রকাশ্য demonstration লজ্জা করে। খুব সম্ভব আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু ভাবি, এই দুর্ব্বলতা লইয়াই তো অনেক প্রণয়-চিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি, মুস্কিলে তো পড়ি নাই। কাব্যসাহিত্য এক, কথাসাহিত্য আর। 'হৃদয়-যমুনা' 'স্তন' 'বিজয়িনী' 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে যাহাই ঘটুক কথা-সাহিত্যে মনে হয় আমারই মত কবি এ দৌর্ব্বল্য কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বোধ করি এই সকল এবং এমনি আরও দুই একটা ছোটখাটো ত্রুটির কথা লোকের মুখে শুনিয়া কবি অতিশয় ক্ষুন্ন হইয়াছেন। 'বিদেশের আমদানি' কথাটা তাঁহার ক্ষোভেরই কথা। দেশভেদে সাহিত্যের ভাষা আলাদা হয় কিন্তু সত্যকার সাহিত্যের যে দেশ-বিদেশ নাই এ সত্য কবি জানেন। এবং সকলের চেয়ে বেশি করিয়াই জানেন। তা না হইলে আজ বিশ্বশুদ্ধ লোকে তাঁহাকে বিশ্বের কবি বলিয়া মর্য্যাদা দিত না। কবির সৃষ্টি সমুদ্রের ন্যায় অপরিসীম। নজির আছে জানি, তথাপি সেই সমুদ্র হইতেই স্বমতের অনুকূলে নজির তুলিয়া তাঁহাকে খোঁটা দেওয়া শুধু অবিনয় নয়, অন্যায়।

কবি বলিয়াছেন, 'ভারতসাগরের ওপারে (অর্থাৎ য়ুরোপে) যদি প্রশ্ন করা যায় তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন? উত্তর পাই, হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেচে। ভারত-সাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই হাট ত্রিসীমানায় নাই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী।'

এ জবাব কবিকে কে দিয়াছে জানি না, কিন্তু যে-ই দিয়া থাক্ আমি তাঁহার প্রশংসা করিতে পারি না।

নরেশচন্দ্র বলিতেছেন '...হাট জমিবার একটু চেষ্টা না হইতেছে এমন নয়। তা ছাড়া হাট জমিবার আগে হট্টগোল সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকবার শোনা গিয়াছে। রুশো ও ভল্টেয়ার লিখিয়াছিলেন বলিয়াই ফরাসী বিপ্লবের হাট জমিয়াছিল। এবং আজ বিশ্বব্যাপী ভাব বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি কি? যে-হাট আজ পশ্চিমে

বসিয়াছে তাতে আমার সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচ্যবাসীর চেয়ে কম নহে।'

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট কথা এম্‌নি নির্ভয়ে আর কেহ বলিয়াছেন কি না জানি না।

সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা। Idea পশ্চিমের কি উত্তরের ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণের কি না। 'বিদেশের আমদানী' কথাটা মুর্গী খাওয়ার অপবাদ নয় যে শুনিবামাত্রই লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হইবে। অতএব, সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধি যদি কল্যাণের নিমিত্তই ইহার আমদানী প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন এমন কেহই নাই যে তাঁহার কণ্ঠরোধ করিতে পারে। যত মত-ভেদই থাক্ গায়ের জোরে রুদ্ধ করিবার চেষ্টায় মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই অধিক হয়। কিন্তু এই সকল অত্যন্ত মামুলি কথা কবিকে স্মরণ করাইয়া দিতে আমার নিজেরই লজ্জা করিতেছে। ইহা যে প্রায় অনধিকার-চর্চ্চার কোঠায় গিয়া পড়িতেছে তাহাও সম্পূর্ণ বুঝিতেছি, কিন্তু না বলিয়াও কোন উপায় পাইতেছি না।

এ প্রবন্ধের কলেবর আর অযথা বাড়াইব না। কিন্তু উপসংহারে আরও দুই একটা সত্য কথা সোজা করিয়াই কবিকে জানাইব। তাঁহার সাহিত্য-ধর্ম্ম প্রবন্ধের শেষ দিকটার ভাষাও যেমন তীক্ষ্ণ, শ্লেষও তেমনি নিষ্ঠুর। তিরস্কার করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে একথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু সত্যই কি আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য রাস্তার ধূলা পাঁক করিয়া তুলিয়া পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করাটাকেই সাহিত্য-সাধনা জ্ঞান করিতেছে? হয়ত, কখনো কোথাও কাহারও ভুল হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের প্রতি এত বড় দণ্ডই কি সুবিচার হইয়াছে?

কবি বলিয়াছেন, 'সে দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি—'এই যদি সত্য হইয়া থাকে ত ভারতে দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা। হয়ত প্রবেশাধিকার পায় নাই, হয়ত এ বস্তু সত্যই ভারতে ছিল না, কিন্তু কোন একটা জিনিষ শুধু কেবল ছিল না বলিয়াই কি চিরদিন বঞ্চিত হইয়া থাকিবে? ইহাই কি তাঁহার আদেশ? পরের লাইনে

কবি বলিয়াছেন—'সে দেশের (অর্থাৎ বাঙ্‌লা দেশের) সাহিত্য ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে?'

দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন নাই, চাপা দেওয়াও অন্যায়, কিন্তু ভক্তের মুখের ধার-করা অভিমতটাকেই অসংশয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাতেই কি ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না?

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধর্ম্মের জবাব দিয়াছেন নরেশচন্দ্র। হয়ত তাঁহার ধারণা অনেকের মত তিনিও একজন কবির লক্ষ্য। এ ধারণার হেতু কি আছে আমি জানি না। তাঁহার সকল বই আমি পড়ি নাই, মাসিকের পৃষ্ঠায় যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই শুধু দেখিয়াছি; মতের একতা অনেক জায়গায় অনুভব করি নাই। কখনো মনে হইয়াছে নরনারীর প্রেমের ব্যাপারে তিনি প্রচলিত সুনির্দ্দিষ্ট রাস্তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনও নিজের মতকেই অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করি নাই। নরেশচন্দ্রের প্রতি অনেকেই প্রসন্ন নহেন জানি। কিন্তু, মত্তবার আত্মবিস্মৃতিতে মাধুর্য্যহীন রূঢ়তাকেই শক্তির লক্ষণ মনে করিয়া পালোয়ানির মাতামাতি করিতে তাঁহাকে কোন বইয়েই দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তাঁহার সহিত পরিচয় আমার নাই, কখনো তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয় না, কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্ব্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার সমতুল্য লেখক কেহ আছেন বলিয়াও ত স্মরণ হয় না। বাঙ্‌লা সাহিত্যের অবিসম্বাদী বিচারক হিসাবে কবির কর্ত্তব্য ইহার সমগ্র পুস্তক পাঠ করা। কোথায় বা শ্লীলতার অভাব, কোথায় বা কাব্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণে ইনি নিযুক্ত, স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া। তবে এমনও হইতে পারে কবির লক্ষ্য নরেশচন্দ্র নহেন আর কেহ। কিন্তু সেই আর-কেহরও সব বই তাঁহার পড়িয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে করি। নিজের সাহিত্যিক জীবনের কথা মনে পড়ে। এই তো সেদিনের কথা। গালিগালাজের আর অন্ত ছিল না। অনেক লিখিয়াছি, সকলকে খুসি করিতে পারি নাই, ভুল করিয়াছিও বিস্তর। কিন্তু একটা ভুল করি নাই। স্বভাবতঃ নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোক বলিয়াই হোক, বা অক্ষমতা বশতই হোক, আক্রমণের উত্তরও দিই নাই, কাহাকেও আক্রমণও করি নাই। বহুকাল হইয়া গেলেও কবির নিজের কথাও হয়ত মনে পড়িবে। সংসারে চিরদিনই কিছু কিছু লোক থাকে যাহারা সাহিত্যের এই দিকটাই পছন্দ করে। এখন বুড়া হইয়াছি, মরিবার দিন আসন্ন হইয়া উঠিল, গাল-মন্দ আর বড় খাই না। শুধু 'পথের দাবী' লিখিয়া সেদিন 'মানসী' পত্রিকার মারফতে এক

রায়সাহেব সব্-ডেপুটির ধমক খাইয়াছি। বইয়ের মধ্যে কোথায় সোনাগাছির ইয়ার্কি ছিল অভিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষে তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। যে যাই হোক, আমাদের দিন গত হইতে বসিয়াছে। এখন একদল নবীন সাহিত্য-ব্রতী সাহিত্য-সেবার ভার গ্রহণ করিতেছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করি। এবং যে কয়টা দিন বাঁচিব শুধু এই কাজটুকুই নিজের হাতে রাখিবে।

কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখিতেছি ইহাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড অভিযান সুরু হইয়াছে। ক্ষমা নাই, ধৈর্য্য নাই, বন্ধুভাবে ভ্রম-সংশোধনের বাসনা নাই, আছে শুধু কটূক্তি, আছে শুধু সুতীব্র বাক্যশেলে ইহাদের বিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প। আছে শুধু দেশের ও দশের কাছে ইহাদের হেয় প্রতিপন্ন করিবার নির্দ্দয় বাসনা। মতের অনৈক্য মাত্রই বাণীর মন্দিরে সেবকদিগের এই আত্মঘাতী কলহে না আছে গৌরব, না আছে কল্যাণ।

বিশ্বকবির এই সাহিত্য-ধর্ম্মের শেষের দিকটা আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি বিরূপ, আমার কথা হয়ত তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সত্যই নিবেদন করিতেছি যে, বাঙ্লা-সাহিত্য-সেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাহারা তাঁহার কাছে 'গুরুদেব' বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।

'বঙ্গবাণী' : আশ্বিন ১৩৩৪, পৃ ২৩৭-২৪৬

সাহিত্য ও রস

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সাহিত্য একদিকে যেমন জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব অন্যদিকে তেমনি এই জীবন গড়িয়া তুলিবার একটি প্রধান উপকরণ। মানুষের চরিত্র দেশের সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য আবার উচ্চ আদর্শের সৃষ্টি করিয়া এই চরিত্রকে উচ্চতর স্তরে টানিয়া তোলে। যাহা সম্যক্ উন্নতি সাধন করে তাহাই সাহিত্য—ইহাই শব্দটীর যৌগিক অর্থ। সাহিত্যের সহিত দেশের উন্নতি ও অবনতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ইহার গতি কোন্ দিকে এবং ইহা দেশের ভাবী উন্নতির কতটা অনুকূল তাহা নিশ্চয়ই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের প্রকৃতিও চিরকাল ইহার দেশীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া আসিয়াছে। ভারতের গৌরব ইহার আধ্যাত্মিক চিন্তায়—ইহার সাহিত্য বেদান্ত, উপনিষদ ও দর্শন। জগতের আদি গ্রন্থ বেদ আর্য্যজাতির শৈশবকালীন ধর্ম্মচিন্তার সাহিত্য। রামায়ণ ও মহাভারত ঐতিহাসিক মহাকাব্য হইলেও ধর্ম্মভাব হইতেই জীবনীরস সংগ্রহ করিয়াছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণ সেকালকার ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত জড়িত। কালিদাসের ন্যায় কবি পৃথিবীর যে কোন দেশের গৌরব, কিন্তু ভারতের বেদ বেদান্তের নিকট, উপনিষদ ও গীতার নিকট, তাঁহার প্রতিভাও মলিন। আবার তিনিও তাঁহার কাব্যগ্রন্থে দেবতাদিগের স্তবস্তুতি বাদ দেন নাই। ভারতীয় লিপির পুষ্টি অশোকের ধর্ম্মানুশাসন হইতে!

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য দেশের ধর্ম্মের নিকট যতদূর ঋণী এত আর কিছুর নিকটই নহে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের গান গাহিয়া আপনাদিগকে ও সমকালীন সাহিত্যকে অমর করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রেরণা আসিয়াছে ভগবদ্ভক্তি হইতে। ভারতীয় বিধবার চিরবৈধব্য, দ্বিজাতির পক্ষে বিহিত প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রম দেশের প্রকৃতিরই পরিচায়ক। সে প্রকৃতি ত্যাগকেই চিরকাল উচ্চ আসন দিয়াছে, ভোগকে নহে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা লইয়া মাতোয়ারা হইলেও চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্শ্বচরগণ আপন জীবনে কঠোর সংযমী ছিলেন। ভগবল্লীলা ইঁহারা যে ভাবেই অনুভব করিয়া থাকুন

ইহাদের নিজ জীবনের আদর্শ ছিল সন্ন্যাস। চৈতন্যদেবের সংযমী ভক্তগণের লেখনী বাঙ্গলাভাষার পুষ্টিসাধনে যতটা সহায়তা করিয়াছে এতটা বোধ হয় আর কিছুতেই করে নাই—সেকালে ত' নয়ই।

প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যে আসলের সহিত মেকী যে চলিত না একথা বলিতেছি না। সকলেই যে ধর্ম্মের কথা লিখিতেন তাহাও নহে। নানা বিষয়ের নানা শ্রেণীর লেখকই ছিলেন—আদিরসের কবিও ছিলেন যথেষ্ট; কিন্তু তাঁহাদের লেখায় নানা প্রকার নগ্নতার মধ্যেও সাধারণতঃ একটা নৈতিক বাঁধাবাঁধি ছিল। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের ও গোপীগণের লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন, প্রাকৃত প্রেমের বর্ণনা করিতে গেলে অতটা খোলাখুলি ভাবে লিখিতেন না। ভারতচন্দ্রও যে ঢলাঢলি করিয়াছেন তাহা 'কালিকার কিঙ্কর' ও কিঙ্করীর প্রেমের বর্ণনায়।

ধর্ম্মবিশ্বাস এখন দেশে শিথিল—আচার-ব্যবহার অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধাক্কা দোষে গুণে জড়িত দেশীয় সভ্যতাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির গুণ আমরা কমই গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। দোষগ্রহণ সহজ, উচ্ছৃঙ্খলতাও বেশ রোচক; আমরা—বাঙ্গালীরা সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি। চিঠিপত্র লিখিবার প্রারম্ভে ভগবানের নাম এখন নিতান্ত সেকেলে হইয়া পড়িয়াছে। ভাল কি মন্দ কোন পুস্তকের প্রারম্ভেই আর 'মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং' প্রণিপাত কেহ আবশ্যক মনে করে না। আহার-বিহার, চলাফেরা, বসন-ভূষণে যেমন একটা স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়াছে সাহিত্যেও দেখা দিয়াছে তাহাই। সমাজ ত মুমূর্ষু, স্থলবিশেষে অন্যায় উৎপীড়ন ভিন্ন তাহার যে কোন কর্ত্তব্য আছে এরূপ লক্ষ্য করাই কঠিন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটা জাগরণের সাড়া আসিয়াছে কিন্তু সেখানে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় নৈতিক বল ভিন্ন এই জাগরণ কতটা সুফল প্রসব করিতে পারে? সাহিত্যকে সেই নৈতিক বলের বাহন হইতে হইবে কিন্তু তাহা হইতেছে কোথায়? বিশৃঙ্খলার ফল বিশৃঙ্খলাই।

নিরবচ্ছিন্ন উচ্ছৃঙ্খলতা অপেক্ষা ধর্ম্মবিশ্বাসের একটা ভাণও ভাল—'মরা', 'মরা' বলিতে বলিতে একদিন রাম নাম মুখে আসিতে পারে। কিন্তু এখন পশ্চিম হইতে যে তরল জিনিষের আমদানী হইতেছে এবং আমাদের অনেক নকলনবীশ ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক বিনা ওজরে গলাধঃকরণ করিয়া সাহিত্যের বাজারে উদ্গিরণ করিতেছেন তাহাতে না আছে ধর্ম্ম, না আছে তাহার ভাণ। আছে স্বাধীনতার নামে খানিকটা হলাহল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে স্বাধীন ভাবের

আহ্বান দেশের যুবকগণের প্রাণে সাড়া দিয়াছে এবং অনেক স্থলে মস্তকে একটা গোলযোগ বাধাইয়া দিতেছে সেই স্বাধীন ভাবেরই বিকৃতি নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে চিরকালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া একটা প্লাবন আনিতেছে। ইহার প্রধান বাহন হইয়াছে সাহিত্য। ধর্ম্মে যে জীবনীশক্তির অভাব, সমাজে যে বিশৃঙ্খলা, সাহিত্য তাহারই আশ্রয়ে একটী হট্টগোল বাধাইতেছে। পাশ্চাত্য আদর্শের আঘাতে বিপর্য্যস্ত সমাজের দুরবস্থাকে সাহিত্য আরও কঠোর করিয়া তুলিতেছে। ভারতের গৌরবময় নৈতিক আদর্শের আর আদর নাই। গভীর চিন্তা বা আলোচনা এখন সুদূরপরাহত। বাজে গল্প বা উপন্যাস অধিকাংশ স্থলেই মাসিক সাহিত্যের সম্বল, বাজারে কাটতির প্রধান সহায়। গৃহলক্ষ্মীরা সাধারণতঃ ইহাই বোঝেন এবং ইহাই পড়েন। কোন সাধারণ পুস্তকাগারের কর্ম্মাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যায় লোকের রুচি কোন্ শ্রেণীর পুস্তকের দিকে। অধিকাংশ লেখক সেই রুচিরই খাদ্য যোগাইতে ব্যস্ত।

সমাজ ওলট পালট হইয়া গেলেও কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সমাজ হইতে পারে নাই। বিদেশী নভেলে যে সকল স্ত্রীপুরুষের উদ্দাম ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা দেশেরই প্রকৃতি হইতে গৃহীত। এখানে যাহা পাওয়া যায় তাহা বিশৃঙ্খল সমাজে বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ, হয়ত পরে এই সাহিত্যের প্রভাবে দেশেও উহার বাস্তব মূর্ত্তি দেখা দিবে। সাহিত্যের এই প্রকৃতি লইয়া কিছুদিন হইতে আলোচনা চলিতেছে এবং এবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অস্ত্রধারণ করায় কথাটা একটু বেশী রকম মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন 'হাট ত্রিসীমায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী'।*

রবীন্দ্রনাথের শেল, শূল, গদা ধরার অভ্যাস নাই কিন্তু তাঁহার ছুরিকাঘাতেই অনেকের গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। ডাঃ নরেশচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিবাদ ক্ষেত্রে নামিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও যে এই অবস্থার জন্য একেবারে দায়ী নহেন এমন বলা যায় না, কিন্তু নরেশচন্দ্র প্রভৃতি যাহাই বলুন তাঁহার এই আক্ষেপও ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার নহে। সকলের কথা বলিতেছি না কিন্তু বর্ত্তমান তরল সাহিত্যের অনেক লেখককেই অল্পাধিক পরিমাণে এই রোগে ধরিয়াছে। কেহ এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে আর্টের ভিতর সাজাইয়া মোহন বেশে উপস্থিত করিতেছেন, কেহ বা আর্টের অভাবে যাহা উপস্থিত করিতেছেন তাহা নিতান্তই নোংরা।

* 'বিচিত্রা', শ্রাবণ ১৩৩৪

কবিসম্রাট্ বা উপন্যাসসম্রাট্—ছোট খাট'ই হউন আর বড়ই হউন—কাহারও কথাই মাথা নোয়াইয়া নেওয়া এখনকার যুগধর্ম্ম নহে। রবীন্দ্রনাথও এ ক্ষেত্রে যতগুলি কথা বলিয়াছেন তাহার সবগুলি মাথা নোয়াইয়া গ্রহণ করা যায় না। তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানে একটা মস্ত পার্থক্য দেখাইতে চাহেন—বিজ্ঞান যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সাহিত্য পক্ষপাতধর্ম্মবিশিষ্ট। এই পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বোধ হয় একটু রসিক ও ভাবুক হইতে হয়. 'স্বয়ম্বরা' 'বাণীর' অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। সাহিত্যকে যে বিজ্ঞান ছাড়িয়া বিপথগামী হইতে হইবে তাহা বেরসিক লোকের পক্ষে বোঝা বাস্তবিক একটু কঠিন। রবীন্দ্রনাথ রসাত্মক সাহিত্যের স্রষ্টা। নরেশচন্দ্রও রসিক লেখক, তিনি রসবোধের মাহাত্ম্য বজায় রাখিয়া সাহিত্য-সম্রাটের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারেন কিন্তু অরসিকের পক্ষে সেরূপ স্পর্দ্ধা মোটেই শোভনীয় নহে। তবে কথাটা কেবল রসেরই নহে, একটা জাতীয় সমস্যার কথা। তাই এ ক্ষেত্রে অরসিকেরও কিছু নিবেদন অপ্রাসঙ্গিক নহে।

বাস্তবিক সাহিত্য কেবল রসসৃষ্টির—রস অর্থে বোধ হয় ইঁহারা সুকুমার রসই ধরেন—উপাদান নহে। রসসৃষ্টি নিশ্চয়ই সাহিত্যের কর্ত্তব্যের মধ্যে কিন্তু তাহাকেই আমরা সাহিত্যের এক মাত্র বা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। বিলাতে Restoration যুগে রসসৃষ্টির অভাব ছিল না। উচ্ছৃঙ্খল সমাজ যে কদর্য্য রসে ভরপুর হইয়া গিয়াছিল সাহিত্যে সেই রস ভালরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এখনও ইউরোপের নানা দেশের সাহিত্যে রসের রকমারি দেখিতে পাওয়া যায়। সে রস 'নিত্য' না হইতে পারে কিন্তু সমসাময়িক সমাজ তাহাকে সুরস বলিয়াই গ্রহণ করে। আমাদের মনে হয় সাহিত্যের স্থান কেবল রসসৃষ্টির—'পক্ষপাতধর্ম্মেরও' —অনেক উপরে। আজকাল যে বিকৃত মনোবৃত্তির খাদ্য সংগ্রহের জন্য ইউরোপ হইতে সস্তা মাল আমদানি করিয়া দেশময় ছড়ান হইতেছে তাহাতে সাহিত্যের যে অবমাননা ঘটিতেছে রসসৃষ্টিমাত্র প্রধানতঃ লক্ষ্য থাকিলে সে অবমাননা হইতে কোন কালেই মুক্ত হইতে পারিবে না। সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে পশুকে মানুষ করা, মানুষকে দেবতা করা। ধর্ম্মের মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে (সে মনো-বিজ্ঞানই হউক আর জড়বিজ্ঞানই হউক), ইতিহাসের মধ্যে যে সত্য, তাহাকে সুন্দর ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ, সকল প্রকার মানসিক ক্লীবত্বের দূরীকরণ, সকল প্রকার জ্ঞানের বিস্তার নিশ্চয়ই সাহিত্যের কার্য্যক্ষেত্রের বহির্ভূত নহে। সাহিত্য মানব-জীবনকে কেবল সরস করিবে না, দৃঢ়ও করিবে, কেবল গোলাপ মল্লিকার

সৃষ্টি করিবে না, শাল সেগুণও জন্মাইবে। সাহিত্যের ক্রিয়া কেবল হৃদয়ে নহে; মস্তিষ্ক ও মনেও আবশ্যক, আসল কেবল রসের উপর নহে, জ্ঞানেরও উপর। যাহা বাস্তব তাহাকে সুন্দর করিয়া দেখান সাহিত্যের কার্য্য। তাহাকে ঠেলিয়া দূরে রাখিলে 'বাণী' দেবী স্বয়ম্বরে কাহাকে বরণ করিবেন? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অনেক সময়ে আকাশপথে উড্ডীন হইলেও বাস্তব জগতের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

আমাদের মনে হয় বিজ্ঞানের সহিত সাহিত্যের বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। বিজ্ঞান বা ইতিহাসও নীরস জিনিষ নহে। রসসৃষ্টি সাহিত্যের একাংশ মাত্র—; নীতি ও জ্ঞানের সহিত রস মিশ্রিত করিয়া মানুষকে উচ্চতর স্তরে লইয়া যাওয়াতেই সাহিত্যের সার্থকতা। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিজ্ঞান সাহিত্যের সহায়, বিরোধী নহে।

সাহিত্যের শক্তি সর্ব্ববাদিসম্মত। সে শক্তির অপব্যবহার মার্জ্জনীয় নহে। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কত পরাধীন জাতি সাহিত্যের কৃপায় স্বাধীন জাতিতে পরিণত হইয়াছে, কত শ্লেষাত্মক লেখনী সমাজকে দুর্নীতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে, কত গুরুগম্ভীর সাহিত্যিক প্রতিভা দেশকে বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া সাম্যের স্বর্ণ সিংহাসনের দিকে টানিয়া তুলিয়াছে, কত পুরুষপরম্পরাগত কুসংস্কার সুকোমল সাহিত্যের তীব্র কশাঘাতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। লক্ষ্যহীন রসসৃষ্টিতে এ সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই।

আজ যে যৌনসম্বন্ধের শিথিলতা বাঙ্গলা দেশের কথা-সাহিত্যে এতটা প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে তাহাতে রসসৃষ্টি যতটাই হউক, চরিত্রসৃষ্টি মোটেই হইতেছে না। রসসৃষ্টি উপেক্ষণীয় নহে কিন্তু আমাদের মনে হয় অনেক উচ্চ অঙ্গের প্রতিভা দেশের প্রকৃত কার্য্যে লাগিতেছে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে মেয়েলী সাহিত্যের উপর দেশবিদেশে বাঙ্গালীর গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, শরৎচন্দ্রের প্রতিভা যে সাহিত্যে এখন প্রধান হোত্রী, বহু লেখকের হস্তে সেই সাহিত্যের বহুল প্রচার দেশটাকে কতদূর বড় করিতেছে তাহা ভাবিবার বিষয়। পুরুষোচিত দৃঢ়তা ও ওজস্বিতা এখনকার সাহিত্যে কতটুকু আছে? মাইকেল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের আসন ত এখন শূন্য।

যে দেশ সাড়ে সাত শত বৎসর মস্তক অবনত রাখিয়া, কুসংস্কার ও ধর্ম্মের নির্ম্মোককে জীবনের সম্বল করিয়া আবার বিদেশী সভ্যতার সাহায্যে মস্তক উত্তোলন করিতে চায় তাহার উত্থানের ভিত্তিতে কোমল রসের স্থান খুব বেশী

আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু মেয়েলী সাহিত্য তাহাকে বড় করিতে পারিবে না, বিদেশী ক্ষমতাবান্ জাতির উপর গালিবর্ষণও নহে। তাহার সাহিত্যকে কতকটা ধর্ম্মের দৃঢ়তা, কতকটা নৈতিক কঠোরতা প্রচার করিতেই হইবে। ধর্ম্মের বাহ্য আবরণ থাকুক বা নাই থাকুক সমাজে নীতি, চরিত্রে দৃঢ়তা ব্যতীত কোন জাতি বড় হইতে পারেনা। রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, সমাজনীতি সকল নীতির সহিতই ধর্ম্মনীতি গ্রথিত না থাকিলে পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগ অনিবার্য্য। সাহিত্যের কর্ম্মক্ষেত্র এখানেও আছে। যদি এ কার্য্য কোমল রসসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হয় ভালই, না হইলে সাহিত্যকে কঠোর রসের সৃষ্টি করিতে হইবে, রস মরিয়া যে পদার্থ জন্মে আবশ্যক হইলে তাহারও সৃষ্টি চাই। চরিত্রগঠন সাহিত্যের একটী প্রধান কার্য্য—চরিত্রনাশ একটী অকার্য্য। যৌথ কারবারে দশ জনের ধন নষ্ট হইতেছে—সাহিত্য, উন্নত নীতিজ্ঞান দাও। সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে—সাহিত্য, সশস্ত্র অগ্রসর হও, কিছু কোমল রস ঢালিতে পার ভালই, না পারিলেও অগ্রসর হও, লক্ষ্য যেন স্থির থাকে। জাতির জড়তা দুর করিতে হইবে—সাহিত্য, লাগিয়া পড়। কেবল গালিবর্ষণ ইতরের কার্য্য, গৃহ সংস্কারই বিজ্ঞের কাজ।

যে দেশে এত বিষয় ভাঙ্গিবার ও গড়িবার আছে, সে দেশে সাহিত্যের কার্য্যক্ষেত্র যে কত বিস্তীর্ণ ও কত পবিত্র তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। বিকৃত মনোবৃত্তিকে ইন্ধন যোগান ক্ষমতার অপব্যবহার মাত্র। যে দেশের চিরন্তন ধর্ম্ম-চিন্তার স্থান প্রবল অন্নচিন্তা অধিকার করিয়া বসিয়াছে সে দেশের সাহিত্য বেশী তরল না হইয়া একটু কঠিন হইলে দোষ আসিতে পারে না। যে দেশ জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, আচারভেদ, ব্যবহারভেদ ও কর্ম্মভেদের জ্বালায় অস্থিমজ্জায় জর্জ্জরিত সে দেশের চৌদ্দ আনা লেখাপড়া জানা লোক কি কেবল যৌন সম্বন্ধের কল্পিত গল্পে স্বাধীনতার মত্ততা উপভোগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে? দেশের কৃষি, দেশের শিল্প, দেশের শিক্ষা, দেশের ব্যবস্থা প্রণালী, দেশের বাণিজ্য সকলই সাহিত্যের নিকট উদ্বোধন আকাজ্ঞা করে কিন্তু সাহিত্য এই গুরু কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া বিকৃত রসের সৃষ্টির জন্য লালায়িত!

ইউরোপে বহুকাল হইতে স্বাধীনতার তরঙ্গ খেলা করিতেছে। আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ খুঁজিয়া পাতিয়া ভারতের কোন কোণে কোন কালে কোনরকমের গণতন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেও প্রকৃত গণতন্ত্রের পীঠস্থান ইউরোপ। কত সামাজিক, কত রাজনৈতিক, কত যাজনিক অত্যাচারের সহিত সংগ্রাম করিয়া ইউরোপ বড় হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আমেরিকার

স্বাধীনতা ইউরোপেরই সন্ততি। তবে পাশ্চাত্য জগতে আধ্যাত্মিক চিন্তা অপেক্ষাকৃত কম, বাস্তব জগতের চিন্তাই বেশী। এই চিন্তা নানা আকারে মানুষের ভোগের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। যে দিকে লোকের মতিগতি সে দিকে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইলে সহজে তাহার গতিরোধ হয় না, স্রোত নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইউরোপেও হইয়াছে তাহাই। কলকারখানা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে—মানুষের ভোগের জন্য। পৃথিবীর নানাস্থানে বাণিজ্যতরী ক্রীড়া করিতেছে—মানুষের ভোগের জন্য। স্ত্রী পুরুষের অবাধ ভ্রমণ—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিস্তার—জন্মিয়াছে মানুষের ভোগের জন্য। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা একটী খুব সংক্রামক জিনিষ। পুরুষেরা ইহার উদ্বোধনে প্রধান পৌরোহিত্য করিয়া থাকিলেও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও ইহা বিলক্ষণ সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। বিগত মহাসমরে পুরুষক্ষয় ইত্যাদি কারণে স্ত্রীলোকের কর্ম্মক্ষেত্র ও অধিকার ইউরোপে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের অধিকার স্ত্রীলোক কোন্দল করিয়া আদায় করিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা পুরুষের একচেটিয়া ছিল এমন অনেক ব্যাপারে এখন স্ত্রীলোকের রাজত্ব। গণতন্ত্র প্রণালী কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সমাজেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। স্ত্রীলোক পুরুষের চিরন্তন শাসন আর মানিতেছে না, পুরুষের প্রতিষ্ঠিত নৈতিক বন্ধন নিতান্ত সেকেলে মনে করিতেছে। এর পরিবর্ত্তনের ফলে—এই পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভে—অনেকটা স্বেচ্ছাচারিতা, অনেকটা উচ্ছৃঙ্খলতা আসিবেই। মানুষের পারিবারিক জীবনে যত প্রকার সম্বন্ধ ও বিধিব্যবস্থা আছে, যৌনসম্বন্ধ ও তাহার বিধিব্যবস্থাই তাহার মধ্যে প্রধান। পাশ্চাত্য জগতের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এই সম্বন্ধ ও বিধিব্যবস্থার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, এগুলি নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টায় আছে। এই পরিবর্ত্তিত মনোভাব, এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও উচ্ছৃঙ্খলতা আজ পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রতিফলিত।

আমাদের দেশের অবস্থা ঠিক তেমন দাঁড়ায় নাই। যুদ্ধে তেমন লোকক্ষয় হয় নাই। সমাজে যে পরিবর্ত্তন তাহা শিক্ষার ও অনুকরণের প্রভাবে। বিশ্বাসে যে শিথিলতা তাহাও ঐ কারণে। কিন্তু বহুকালের ধর্ম্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা উপেক্ষার বস্তু নহে। যাঁহারা গল্প ও উপন্যাসে অসংযমের ধারা প্রবাহিত করিতেছেন তাঁহারা যে নিজেরা অসংযমী বা আমাদের সমাজে যে অসংযম দেখা দিয়াছে তাহারই সত্যরূপ প্রতিফলিত করিতেছেন এমন কথা বলা যায় না। তাঁহারা সময়ের ভাব দেখিয়া যাহা মুখরোচক মনে করিতেছেন তাহারই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি চলিতেছে। উপার্জ্জনের জন্য সাহিত্যে কদর্য্যতা অমার্জ্জনীয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

হয়ত আমাদের দেশে কোন কোন স্থলে অসংযম আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার তরঙ্গ সমাজের বক্ষে কিছু আঘাতও হয়ত করিতেছে কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা অনেক স্থলেই প্রাণহীন বলিয়া তাহাতে সমাজের উপর বিশেষ কিছু রেখাপাত হয় নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেতিহাসের বিশ্লেষণরীতি প্রাচীন সমাজের অনেক বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া দিলেও হিন্দুর বৈবাহিক বন্ধন বা যৌন সম্বন্ধের ক্ষেত্রে যে এ পর্য্যন্ত বহুবিবাহাদি দুই একটী কুপ্রথার নিরাকৃত ভিন্ন বিশেষ কোন পরিবর্ত্তিত মত আনিতে পারিয়াছে এমন মনে হয় না। পাশ্চাত্য দেশের জঞ্জাল কুড়াইয়া লইয়াই অনেক নব্য লেখক তাহা খাপছাড়াভাবে দেশে পরিবেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কথাসাহিত্য ছাড়া আরও অনেক প্রকার সাহিত্য পাশ্চাত্য ভূমিতে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। আমরা সেদিকে তেমন অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, ধরিতেছি জঞ্জাল গুলিকে। পাপের প্রতিকৃতি যে গল্প উপন্যাসে স্থান পাইবে না একথা আমরা বলি না। জীবনের ঘটনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, লইয়াই গল্প ও উপন্যাস। তাহা বাদ দিলে ভাল উপন্যাসই বা জমিবে কেন? কিন্তু পাপের চিত্র অঙ্কিত করতে গেলেই যে পাপের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। চিত্রটী ফুটিয়া উঠিবে অথচ এমন ভাবে ফুটিবে যে পাঠকের ঘৃণার উদ্রেক হয়, সহানুভূতি স্থান না পায়। বর্ত্তমান লেখকগণের অনেকের দোষ তরল সাহিত্যে চিত্রগুলি এমন করিয়া ফুটাইয়া তোলেন যে সামাজিক জঞ্জালের সহিত—সে জঞ্জাল হয়ত বিদেশ হইতে আমদানি—পাঠকের সহানুভূতি জন্মিয়া যায়। ইহাতে নৈতিক ব্যাধির প্রতীকারের চেষ্টা থাকে না—আশঙ্কা থাকে উহার সংক্রমণের।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটা সীমা আছে। নৈতিক আদর্শেরও একটা মূল্য আছে। যে দেশে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে শয়নকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্য স্মৃতির কঠোর শাসনে এক সময়ে নিয়মিত করার চেষ্টা হইয়াছিল, সে দেশে পাশ্চাত্য সমাজের সংঘর্ষে কতকটা বিশৃঙ্খলা হয়ত একটী স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কিন্তু সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আনিতে গেলে অতীতকে একেবারে পদাঘাত করিলে চলিবে না। বিশৃঙ্খলা সমাজে যথেষ্টই আসিয়াছে এবং অনেক বিষয় ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবারও সময় হইয়াছে। এই গঠন কার্য্যে সাহিত্য ঠিক ভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগুক।

কথা এই যে তরল সাহিত্য সে পথে অগ্রসর না হইয়া বৈদেশিক অনুকরণে আরও বিশৃঙ্খলা আনিতেছে। সংযম ও নৈতিক কঠোরতার যে একটী মূল্য আছে

বর্ত্তমান যুগের অনেক গল্প ও উপন্যাস তাহা উড়াইয়া দিতে চায়। বেশ্যা বা ব্যাভিচারিণীর মধ্যেও মহত্ব থাকিতে পারে কিন্তু সে মহত্ব তাহার ইন্দ্রিয় লালসার জন্য নহে, সেই লালসার দমনে অথবা তাহার অন্যান্য মনোবৃত্তির জন্য। নবীন লেখকগণ অনেক স্থলে সে কথা ভুলিয়া যান। যাঁহারা পাকা ওস্তাদ তাঁহারা কতক পরিমাণে লেখনীকে সংযত রাখেন, ব্যাভিচারকে অনেক সময়ে দেহের মধ্যে স্থান না দিয়া মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখেন। অনেক লেখকই যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা অঙ্কিত করিয়া আসল চিত্রে রং ফলাইতে চান তাহা যে বাস্তব জগতে অস্বাভাবিক ইহা বুঝিয়াও বোঝেন না এবং সুকুমারমতি পাঠক পাঠিকাদের মাথায় নানা প্রকার অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ভাব ফুটাইয়া তোলেন। যাঁহারা পাকা নহেন, এই সংযমটুকুও রাখিতে জানেন না, তাঁহাদের লেখার ফল আরও বিষময়।

যাহা কুৎসিৎ তাহাকে সুন্দর করিয়া লোকের সম্মুখে ধরা, যাহা বিষময় তাহাকে অমৃতময় ভাবে তরুণ-তরুণীগণের নিকট উপস্থিত করা—ইহাতে ভগ্নস্বাস্থ্য সমাজের যে কি অপকার হইতেছে তাহা বলা যায় না। গণিকার মহত্ব বা দ্বিচারিণীর সতীত্ব প্রচারে এতটা ব্যস্ত না হইলেও বোধ হয় প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকগণের লেখনী ব্যর্থ হইত না। দেশের অভাব অনেক, অভিযোগ অসংখ্য। যেখানে লাইকার্গাসের প্রয়োজন সেখানে এপিকিউরাস্‌কে সম্মুখে দাঁড় করাইলে সে অভাব-অভিযোগের মীমাংসা হইবে কেমন করিয়া?

বাঙ্গালী জাতি যে বিষম দুরবস্থায় পড়িয়াছে—নৈতিক, দৈহিক, আর্থিক যে-সকল ঘোর অসুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহাতে তাহার কঠোর নিয়মের অধীনে স্বাস্থ্যলাভ আবশ্যক। রোগীকে আরও রুগ্ন করার যে চেষ্টা হইতেছে, ইহাতে কি বস্তুতঃ প্রত্যবায় নাই?

একথা বলা যাইতে পারে যে দুই এক জন পাকা ওস্তাদের লেখার অদৃষ্টে যাহাই হউক, এই শ্রেণীর অধিকাংশ লেখাই দীর্ঘজীবী হইবে না। বৈদেশিক আক্রমণে তরল সাহিত্য বিপর্য্যস্ত এবং বিপথগামী হইয়া পড়িলেও প্রতিক্রিয়া একদিন আসবেই। দেশের প্রকৃতি—হয়ত বর্ত্তমানযুগের উপযোগী রূপান্তরিত ভাবে—আবার দেখা দিবে। অশন বসনে যথেচ্ছাচারী অনেক বাঙ্গালীকে হঠাৎ কঠোর সংযমী হইতে দেখা যায়, ধর্ম্মজগতে উপহাসকারী অনেককে পরিণত বয়সে বারাণসী ও বেদান্তের বিষম ভক্ত হইতে দেখা যায়—তাঁতিকুল ছাড়িয়া অনেকে শেষ বয়সে বৈষ্ণবকুলে একেবারে গা ঢালিয়া দেন। এই যে দেশের প্রকৃতি

সাহিত্যও তাহা এড়াইতে পারিবে না। তবে এই প্রতিক্রিয়া কবে আসিবে কে বলিতে পারে ?

যখনই দেশে প্রকৃত উন্নতির স্রোত দেখা দিবে, সাহিত্যেরও ধারা বদ্‌লাইয়া যাইবে। যাহাতে সে দিন শীঘ্র আসে সে দিকে দেশের কৃতবিদ্য, নীতিপরায়ণ, স্বদেশহিতৈষী লেখকগণের আন্তরিক চেষ্টা বাঞ্ছনীয়।

'বঙ্গবাণী' : অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ ৪৪৮-৪৫৬

সাহিত্যে অশ্লীল

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা লইয়া নানা দেশের ও সমাজের নানা মাপকাঠি। যত কিছু প্রশ্ন উঠে সাহিত্যে যৌন-সম্পর্কের বিচার লইয়া। যৌন-সম্বন্ধ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আদর্শকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মালাবারে এক পত্নীর বহু স্বামী, কিন্তু সেখানেও বিবাহের বন্ধনের পবিত্রতা আছে, স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারে একটা সুষ্ঠুতা ও আব্‌রুতা আছে। অন্য দেশের স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে তাহা কল্পনা করা কষ্টসাধ্য। বর্ব্বর মানুষেরও যৌন-সম্বন্ধে বে-আব্‌রুতা ও স্বেচ্ছাচারিতা লক্ষিত হয় না, তাহারও সভ্যজাতির মত যৌন-আচার ও বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া অনেক নিয়ম-কানুন আছে। মনোবৃত্তির ক্রমবিকাশে স্ত্রীজাতির লজ্জা ও পুরুষের শুচিতা যৌন-সম্বন্ধকে সুদৃঢ় করিয়াছে, যাহা কেবল পশুজীবনের নেশা ও উত্তেজনা ছিল, তাহাকে সংযম ও অভ্যাসের দাস করিয়াছে। যৌন-নির্ব্বাচন মানুষের ক্রমোন্নতির একটি প্রধান আশ্রয় এবং শ্লীলতা মানুষের যৌন-সংযম ও অভ্যাসের সহায় হইয়া যৌন-সঙ্গমকে ক্লেশ ও অবসাদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহার ফলেই বিবাহ-পদ্ধতি ও পরিবার-পালনের সুপ্রতিষ্ঠা। ভিন্ন আবেষ্টনে, জাতিতে ও সমাজে বিবাহ-ধর্ম্ম বিভিন্ন এবং শ্লীলতা, অশ্লীলতা সম্বন্ধেও বিভিন্ন মাপকাঠি। সাহিত্যে শ্লীলতার এক রায় হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, সাহিত্য অনেক সময় নূতন প্রকার যৌন-সম্পর্ক কল্পনা করে, সমাজের অভ্যস্ত ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া একটা নূতন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, তখন সমাজ-পতিগণ সেই সাহিত্যকে গালাগালি দেয়, 'এ সাহিত্য সমাজ-দ্রোহী, এ সাহিত্য অশ্লীল'।

পৃথিবীতে যত কিছু ব্যথা, বেদনা আছে, তাহা লইয়াই সাহিত্যের কারবার। কোথায় সমাজ-ধর্ম্ম শ্লীলতার দোহাই দিয়া ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন করিল, সুষ্ঠুতা রক্ষাকল্পে গভীর হৃদয়-বেদনা আনিয়া দিল, সাহিত্যের পক্ষে ইহা শুধু উপকরণ নহে, একটা নূতন আদর্শ ফুটাইবার আশ্রয় ও অবলম্বন।

সব ক্ষেত্রেই নানা আদর্শ মানুষ গড়িয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধেও মানুষ যে কেন বিভিন্ন আদর্শ একই সমাজে না গড়িবে, তাহার উত্তর কোন সমাজ-পতিই

ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির উন্মেষ, দুই-য়ে চির-যুদ্ধ লাগিয়া রহিয়াছে। কোথায় নিয়মের জয় হইল, প্রেম হাহাকার করিতে লাগিল, কোথায় প্রবৃত্তির জয় হইল, উচ্ছৃঙ্খলতার বালুরাশিতে প্রেম শুকাইয়া গেল। সাহিত্য কখনও নিয়মের জয় ঘোষণা করে, কখনও বা প্রবৃত্তির জয় কামনা করে। মানুষের অন্তরের দ্বন্দ্ব সাহিত্যের প্রাণ।

কিন্তু নিয়ম বজায় করিতে যাইয়া সাহিত্য অনেক সময় প্রেমকে এমন নাকে খত দেওয়াইল যে, অসত্যের অবতারণা হইল, সুন্দর কোথায় পালাইল! আবার প্রবৃত্তির উন্মাদনা প্রকাশ করিতে যাইয়া সাহিত্য প্রেমকে একেবারে নিছক রক্ত-মাংসের তৈয়ারী করিয়া ফেলিল। তাহাতেও অসুন্দর ও অসত্যেরই প্রকাশ।

যেখানে দেহের পশ্চাতে মন আছে, রূপের পশ্চাতে ভাব আছে, সেখানেই সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। প্রেম সেখানে দেহ-পিণ্ডের নহে, আত্মার রচনা, তাই আত্মার মতও সে অবিনশ্বর।

কালিদাসের শিব-সতীর কামসম্ভোগ বর্ণনা অশ্লীল নহে, কারণ, তাহার পশ্চাতে আছে একটা অসীম সংযম ও নিয়মের যৌন-বন্ধন। কামক্রীড়া যেন হিম-গিরিশৃঙ্গে তুষার-হ্রদের রক্ত-কমলের মত ফুটিয়াছে। বৈষ্ণব, সাহিত্যের যৌন-ভাব-বর্ণনার পশ্চাতে আছে সেই চির-চঞ্চলের—নিতুই নবের প্রেম-অভিসার। জয়দেবের 'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-বেশম্' সেরূপ রতিকে সহচর করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ প্রেমে মনকে ডুবাইয়া দেয়। পারস্য গীতি-কবিতায় তেমনি লায়লার বিম্বাধর, মজনুর সুরাপাত্র, অতীন্দ্রিয় জগতের কত না নিবিড় মায়া রচনা করিয়াছে। সহজিয়া সাহিত্যের মত এমন নিছক কামকলা সাহিত্য খুব কমই আছে, কিন্তু যখন প্রেমের বত্রিশবিধ প্রকারভেদ কেবলমাত্র আত্মার চরম প্রকাশের সহায় হয়, রক্ত-মাংস তখন শুষ্ক কাষ্ঠের মতন অসাড় হয় এবং সেই শুষ্ক কাষ্ঠ হইতে জ্বলিয়া উঠে একটা স্নিগ্ধ অনির্ব্বাণ শিখা, সেখানে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বালাই পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। জাগে শুধু সেই বাণী—

চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী,
পীরিতি না কহে কথা,
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা।

ভারতবর্ষ যৌনসম্বন্ধ লইয়া কোন রুচিবাগীশতার প্রশ্রয় দেয় নাই। আমাদের তন্ত্র যৌন-লীলার নগ্নতাকে বিশ্বসৃষ্টির অনাদি রহস্যের গূঢ়তায় পবিত্র ও আবৃত করিয়াছে। ইন্দ্রিয়-ভোগ অশ্লীল হয় না, যখন তাহাতে আমরা ভোগ করিতে

পারি বিশ্ব-লীলার এককণা আনন্দ, প্রকৃচন্দন বনিতার তখন অশুচিতা থাকে না। তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতির মূল তত্ত্বই এই—ইন্দ্রিয়-ভোগ অশ্লীল ও অসুন্দর নহে, যদি সমগ্রের সহিত, বিশ্বের সহিত, ইন্দ্রিয়গুলির যোগস্থাপন হয়। মানুষ পশু-আচার অবলম্বন করে, যখন ভোগ করে ইন্দ্রিয়েরা। বীর আচারে, ইন্দ্রিয় ভোক্তা নহে, ভোগ করেন জগদম্বা, যিনি 'ইন্দ্রিয়াণাম্ অধিষ্ঠাত্রী।' তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে সকল ভোগ্যবস্তুই জগদম্বাকে নিবেদন করিতে হয়, না করিলে মানুষ পশ্বাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

সাহিত্য যখন ইন্দ্রিয়-ভোগের পশ্চাতে পরোক্ষকে, মনোময় বস্তুকে অন্বেষণ করে তখন তাহা কিছুতেই অশ্লীল, অসুন্দর হয় না। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদিগের বস্ত্রহরণ করিলেন, তখন নগ্নতা প্রকাশ হইল না, প্রেমের পূর্ণ-নিবেদন গোপীগণের লজ্জা নিবারণ করিল। সুফী কবিতায় যখন প্রেমিক প্রিয়ার মুখ-মদিরা পান করিল, লালসা ফুটিল না, ফুটিল বিশ্ব-রহস্যের একটি গূঢ় রহস্য। জয়দেব যখন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা শ্রীরাধার চরণ ভিক্ষা করাইলেন, 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' তখন স্ত্রৈণতা নহে, ভগবানের অসীম করুণাই প্রকাশিত হইল।

চণ্ডীদাস যখন রামীর নিকট আপনাকে সমর্পণ করিল, ইন্দ্রিয়-লালসার পরিবর্ত্তে দেখা দিল একটা সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম—যাহা চন্দ্র-সূর্য্যের মতনই মানুষের গ্রাহ্য এবং যাহাকে পরিত্যাগ করাই কৃত্রিমতা ও কুটিলতা।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে বইগুলিকে অশ্লীল বলা হয়, তাহাদিগের মধ্যে দেখা যায় রক্তমাংসের পশ্চাতে দেহের একটা জৈব-আনন্দ, যাহা Growth of the Soil অথবা Sanine-এ অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। Growth of the Soil-এ মানুষ প্রকৃতির বরপুত্র। তাহার কাম যেন আকাশের বা গাছ-পালার রংয়ের পরিবর্ত্তনের মত নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। Sanine-এ সম্ভোগ সরল ও অকৃত্রিম। এখানেও মনোময় বস্তুটি দেহের উপাদানে গঠিত, তবুও দেহের অতীত। তাই সাহিত্য অশ্লীল হয় নাই।

আব্রুতা রক্ষা করিতে যাইয়া আমরা পদে পদে প্রেমকে লাঞ্ছনা করি। নিয়ম-কানুনের দাস হইয়া প্রেমকে পদদলিত করি। ইহাতে কত অসত্য, কত অসুন্দর আমাদের প্রাণে প্রাণে জাগে। শিল্পী বলেন, প্রেমই একমাত্র সত্য ও সুন্দর। শুচি ও রুচি, অসত্য ও অসুন্দর। প্রেমের রূপ হইতেছে দেহ, প্রাণ হইতেছে আনন্দ। প্রেমের বাহিরের রূপ মনসিজ মদনের; অন্তরের রূপ শিব-সুন্দরের। যাহা নিত্য আনন্দের প্রস্রবণ তাহাই সুন্দর। হইলেই বা তাহা

বাহিরে কুৎসিত। মনোময় রূপ যাহার উপকরণ নহে, তাহাকে যখন সত্য বলিয়া আমরা জোর করিয়া ঘোষণা করি, তখন আমরা অসুন্দরের সৃষ্টি করি, তাহা শ্লীলই হউক, অশ্লীলই হউক। রুচিবাগীশ দক্ষপ্রজাপতির চক্ষে শিব অশ্লীল, অসুন্দর, কিন্তু তাঁহার অসুন্দর দেহের পশ্চাতে আছে চিন্ময় আনন্দ—আনন্দময়ী তাঁহার দেহে গাঁথা রহিয়াছেন, আর তিনিই বিশ্বের সুন্দরী। সব সুন্দর তাঁহার ছায়ামাত্র। সাহিত্য তাঁহার হস্তের দর্পণ, মুহুর্মুহু তাহাতে আপনার মুখশ্রী দেখিয়া তিনি নিজেই মোহিত হইতেছেন।

'উত্তরা' : ফাল্গুন ১৩৩৪, পৃ ৪৫৬—৪৫৭

“সাহিত্য-ধর্ম্ম” প্রসঙ্গে

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সাহিত্য-ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন তাহা সার্ব্বজনীন, সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের পক্ষে সত্য—পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, অথবা পৃথিবী গোলাকার এগুলি যেরূপ নিত্য সত্য। অথচ আমরা দেখি এই দুইটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশিক্ষিত জনসাধারণ নিজক মিথ্যা ছাড়া কিছু ভাবিতেই পারে না, কারণ, তাহাদের যুক্তি প্রত্যক্ষ বস্তুর বাহিরে আশ্রয় পায় না ; তাহারা প্রতিদিন সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখে, তাহাদের দৃষ্টি যতদূর যায় পৃথিবী ততখানিই সমতল। ‘বিচিত্রা’য় সাহিত্য-ধর্ম্ম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে সত্যের অবতারণা করিয়াছেন তাহাও এই ধরনের চিরন্তন সত্য।

‘রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন—অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি—তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, বোধ করি চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েছেন জ্ঞানের জন্যে না, ধনের জন্যে না, রাজকন্যারই জন্যে। এই রাজকন্যার স্থান ল্যাবরটরিতে নয়, হাট বাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে, যেখানে কাব্যের কল্পলতায় ফুল ধরে ; যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যাহার মূল্য নেই যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়—তারি প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ, কোনো সমজদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, ‘তুমি কেন ?’ সে বলে, ‘তুমি যে তুমিই, এই আমার যথেষ্ট !’ রাজপুত্রও রাজকন্যার কানে কানে এই কথাই বলেছিলেন।—

‘রূপকথার রাজপুত্রের (ভুলক্রমে ‘রাজকন্যা’ ছাপা হয়েছে—লেখক) মন তাজা। তাই নক্ষত্রের নিত্যদীপ-বিভাসিত মহাকাশের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয়তা তাই সে দেখেছিল ঐ রাজকন্যায়। রাজকন্যার সঙ্গে তার ব্যবহারটা এই বোধেরই অনুসারে।’

সাহিত্যের মূল সূত্র এমন সহজ সুন্দর ভাবে আর কেহ ধরাইয়া দিয়াছেন বলিয়া ত জানি না। এই মহাসত্য সাধারণে উপলব্ধি না করিতে পারিলে দুঃখ

নাই, কিন্তু নরেশচন্দ্রের মত পণ্ডিত, শরৎচন্দ্রের মত রসিক, মহেন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ ও রাধাকমল বাবুর মত দরদীও যে গড্ডলিকার দলে পড়িবেন ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

সম্ভবত উপরের কথা লিখিতে গিয়া অন্তত শরৎবাবু ও নরেশবাবু সম্বন্ধে ভুল করিলাম। নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উত্তরে বিচিত্রাতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, (সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা) ও শরৎবাবু বঙ্গবাণীতে 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বাহ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও একটু তলাইয়া দেখিলে অন্তত সাহিত্যের মূলতত্ত্ব বিষয়ে ইঁহারাও যে রবীন্দ্রনাথের সহিত একমত এরূপ একটা আভাস পাওয়া যায়। আমার ভুল হইতেও পারে। নরেশবাবুর প্রবন্ধে নরেশ বাবুর ভাষায় স্পষ্টত তাহা ধরাইয়া দেওয়া শক্ত। দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বাগ্‌চী মহাশয় আশ্বিনের 'বিচিত্রা'তে 'সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা বিচার' প্রবন্ধে তাহার চেষ্টা করিয়াছেন ও কৃতকার্য্যও হইয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি। শরৎবাবুর মত তাঁহার ভাষাতেই ব্যক্ত করিতেছি—

'...কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দু'টি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে এইটেই হইল আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক, ইহাই হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন। নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার আছে নাকি যে ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর—অপরের হাতে তাহাই কদর্য্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু এ সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) আসল উপদেশটি সকল সাহিত্য-সেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত।'

এই ক্ষমতা ও রুচিভেদেরই কথা রবীন্দ্রনাথ রাজপুত্র কোটালপুত্রের উপাখ্যানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজপুত্র শুধু রাজকন্যার মন জয় করেন নাই, দেহও জয় করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অপরাধ তিনি সেটা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। এবং বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, রাজকন্যা স্নানাহার ইত্যাদি করিতে

বাধ্য ছিলেন, সপ্তাহান্তে তাঁহার গাত্রবস্ত্রাদি রজকের গৃহে পাঠাইতেন ; এবং নিদ্রাভঙ্গের পর বিশেষ কারণে মুখচোখ ইত্যাদি প্রক্ষালন করিতেন।

কিন্তু গোল বাধিয়াছে আনুসঙ্গিক ব্যাপারগুলা লইয়া, ডালপালা লইয়া। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কয়েকটি উক্তিকে নরেশবাবু ও শরৎবাবু অলক্ষ্য-লোষ্ট্রাঘাত কল্পনা করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। কেন চঞ্চল হইয়াছেন তাহার বিচার করিতে সাহস হয় না। নরেশবাবু সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রবাবু এসম্বন্ধে নির্ভীক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইলেও সকলকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তিনি যে অপূর্ব্ব বিচার শক্তি ও রসজ্ঞানের (পাণ্ডিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলাম, কারণ, পাণ্ডিত্য রসিকের ব্যঙ্গের বিষয় হইতে পারে !) পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া শরৎবাবুর মত প্রবীণ ও রসজ্ঞ ব্যক্তি যে বিদ্রূপবাণী প্রয়োগ করিয়াছেন (আত্মশক্তি পঞ্চবিংশ সংখ্যা, 'রস-সেবায়েৎ' প্রবন্ধে) তাহা নিতান্ত অশোভন হইয়াছে। শরৎবাবুর কথায় ব্যঙ্গটি এইরূপ—

'ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাপার। কত কথা কত ভাব। যেমন গভীরতা, তেমনি বিস্তৃতি, তেমনি পাণ্ডিত্য। বেদবেদান্ত, ন্যায়, গীতা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কালিদাসের ছড়া, উজ্জ্বল নীলমণি মায় ব্যাকরণের অধিকরণ কারক পর্য্যন্ত। বাপরে বাপ ! মানুষে এত পড়েই বা কখন, আর মনে রাখেই বা কি করিয়া !'

ইহার উত্তর কি শরৎবাবুকে বলিয়া দিতে হইবে ? আমাদের সন্দেহ হয়, ইনি বুঝি 'চরিত্রহীন'-রচয়িতা শরৎচন্দ্র নহেন, নহিলে চরিত্রহীনের কিরণময়ী, শাশুড়ী ও স্বামী-সেবা, অনঙ্গ ডাক্তারের অভিনব চিকিৎসা—এ সকল সত্ত্বেও বেদ বেদান্ত-কঠোপনিষৎ, রোমিও-জুলিয়েট, শকুন্তলা, মেঘদূত, হাতের লেখা মূল সংস্কৃত রামায়ণ, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদিতে এমন অধিকার লাভ করিল কি করিয়া—যাহাতে উপেন্দ্রের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা (দিবাকরের কথা ছাড়িয়া দিলাম) ছাত্রেরও তাক্ লাগিয়া যায়। আর যে-নরেশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে গিয়া শরৎবাবু দ্বিজেন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্যের প্রতি পরিহাস করিয়াছেন তিনিও ত সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা প্রবন্ধেই ভগবদ্‌গীতা, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথের বিরাট গ্রন্থাবলী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, লজিক, ল্যাটিন কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, Theophile Gautier, Maxim Gorky, 'ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্য', 'ফরাসী ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্য' Ibsen, Maeterlinck পড়িবার সময় পাইয়াছেন দেখিতেছি। তবে এ

একদেশদর্শিতা কেন ? দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রতি কোন ব্যক্তিক বিরাগ নয় ত ? শরৎবাবু নিজেও ত 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে যে বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভক্তবৃন্দের সহিত আলাপ-সুখের অবসরে তিনিও যে কিছু পড়ার সময় পান তাহারও পরিচয় পাইতেছি। 'শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালিকলম' তিনি পড়েন ও 'সব কথা পড়িয়াও বুঝেন না'। ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস, কেতকী পত্রিকা, Sex Psychology, Anatomy, Gynaecology, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যসম্রাট, মাসিকের পৃষ্ঠায় নরেশচন্দ্রের উপন্যাস গল্প এবং যাঁহারা বাঙ্গালার নবীন সাহিত্য-সেবীদের বিরুদ্ধে সুতীব্র বাক্যশেল হানিতেছেন তাঁহাদের লেখা এমন কি ব্রজদুর্ল্লভ হাজরার 'রস ও রুচি' প্রবন্ধও তিনি পড়িবার সময় পান। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহার এমনই ঘনিষ্ঠ পরিচয় যে তিনি নিঃসঙ্কোচে এমন কথাও লিখিতে পারেন—

'পাণ্ডিত্যে জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্ব্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার (নরেশচন্দ্রের) সমতুল্য লেখক কেহ আছেন বলিয়া ত স্মরণ হয় না।'

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎবাবুর নালিশ এই যে 'কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি……' ইত্যাদি। এবং আত্মশক্তিতে ইহা লইয়াই উপহাস করিয়াছেন…'না পড়িয়াও বুঝি, এ দাবী আমি করি না।' অথচ দেখিতেছি তিনি নরেশবাবুর সকল বই না পড়িয়াও মাসিকের পৃষ্ঠায় যাহা প্রকাশিত হয়* শুধু তাহাই দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে উপরি উদ্ধৃত সার্টিফিকেট দিয়াছেন। সম্ভবত তিনি এতদিনে নরেশবাবুর এক সেট ছাপা বহি উপহার পাইয়াছেন এবং বিগলিত চিত্তে নরেশবাবু ভাষার অধিকার ও স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশ সমগ্রভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সেই বইগুলিরই ভাল ভাল স্থানে দাগ দিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলে তাঁহারও ভুল ভাঙিতে পারে! "কবি বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে" থাকিয়া মাতৃ-ভাষা সম্বন্ধে কিছু খোঁজ রাখেন না অথচ দেখি আজীবন বাংলার আবহাওয়াতে মানুষ হইয়া লোকে ইয়োরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিজ্ঞের মত মতামত ব্যক্ত করে। নরেশবাবুও করিয়াছেন! এ সম্বন্ধে শরৎবাবু কি বলেন?

* নরেশবাবুর সমগ্র লেখার এক চতুর্থাংশ মাত্র।

আর একটা কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ যখন আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না, দৈবাৎ যেটুকু দেখি'—তার প্রায় চার মাস পরে 'সাহিত্য ধর্ম্ম' প্রবন্ধ লেখেন। এই চার মাস কাল তিনি বাঙ্গালা দেশেই ছিলেন। অতি আধুনিক সাহিত্য বুঝিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীর চার মাসের অধিক সময় প্রয়োজন হয় না।

নরেশবাবুব পাণ্ডিত্যের উপর শরৎবাবুর মত সকলেরই আস্থা আছে। ভাষার অধিকারেব কয়েকটি নমুনা তাঁহার অসংখ্য উপন্যাসরাজির একটি মাত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ভাষা সম্বন্ধে অতঃপর আদর্শ লইয়া গোলযোগ বাধিবে না। বৃদ্ধ শবৎচন্দ্রও কি এই 'ভাষার অধিকার' লাভ করিবার জন্য অবহিত হইয়াছেন? রূপনাবায়ণ পথে অনেক পূর্ব্ববঙ্গীয় মাঝি-মাল্লা গমনাগমন করিয়া থাকে। শবৎবাবু তাঁহাদেব নিকট নমুনা আহবণ করিয়া তাহাতে দাগা বুলাইতে থাকুন। আমবাও 'শেষ প্রশ্নে' শেষের দিকে তাঁহার ভাষার অধিকাবের তারিফ কবিবার চেষ্টা করিব।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার দ্ব্যশীতিতম গ্রন্থ 'রক্তের ঋণ' নামক উপন্যাস হইতে নমুনা উদ্ধৃত করিলাম। গ্রন্থেব পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৫ মাত্র। ১৩২৯ সালে ছাপা।

৪ পৃষ্ঠা—"এইবারে কথাটা সিদ্ধেশ্বরীর চক্ষে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল।"

৬ পৃষ্ঠা—"তার টকটকে লাল পুষ্ট ওষ্ঠাধরের ভিতব দিয়া লালসার বহ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে ছিল আর তার আনত দীর্ঘ পক্ষ্মযুক্ত সুবৃহৎ চক্ষুর ভাবভঙ্গিব ভিতব এখনও সর্ব্বনাশকর বিদ্যুৎ চমক দিতেছিল।"

৯ পৃষ্ঠা—"এখন তাব বাস্তবিকই চাউল অথবা চুলা কিছুই নাই।"

১০ পৃষ্ঠা—"পাটের Season শেষ হইলে ব্রজহরি নাগানন্দকে তাঁর চুণের কারবারের ভিতর লইলেন।"

১৫ পৃষ্ঠা—"ঘৃণায় তার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল।......সমস্ত আদালত ভরা লোক তার চক্ষের সম্মুখ হইতে উড়িয়া গেল।"

১৭—১৮ পৃষ্ঠা—"সিদ্ধেশ্বরীর দুই চক্ষে প্রবাহিনী বহিয়া গেল।......কালিদাস বলিলেন, '......তোমার রূপ-যৌবনের তো কিছুই হয় নি এখনো সিধু' বলিয়া হাস্যমুখে সিদ্ধেশ্বরীর চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিল।"

২২ পৃষ্ঠা—"সমস্ত পৃথিবীটা তার মাথার ভিতর দিয়া বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।"

২২ পৃষ্ঠা—"তিনি লজ্জা সরমের শেষ যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহার মাথা চিবাইয়া খাইয়াছেন।"

২৪ পৃষ্ঠা—"ঘনকৃষ্ণ সদ্য-স্নাত কেশগুচ্ছ মাথার উপর চূড়ার মত করিয়া বাঁধিয়া সিদ্ধেশ্বরী হাতা দিয়া ঘণ্ট ঘুঁটিতেছিল।"

২৫ পৃষ্ঠা—"যন্ত্র-চালিতের মত নাগানন্দ তাহাই করিল। ফটোগ্রাফের সঙ্গে তার নিজের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া তার চমক লাগিয়া গেল·······ইহা নাগানন্দের বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এমনি মুখের সঙ্গে নাগানন্দের সাদৃশ্য।"

২৬ পৃষ্ঠা—"সেই পাপ যে তার রক্তের ভিতর তার অস্থি মজ্জায়, তার শিরায় শিরায় জীবন প্রবাহে বহিতেছে।"

২৬ পৃষ্ঠা—আমি স্বামীর শাসন কোনও দিন মানিনি আজ পেটের ছেলে হ'য়ে তুই আমায় চোখ রাঙ্গাইবি?"

২৮ পৃষ্ঠা—"কর্ম্মচারী ও উমেদারগণ চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া আছে। সকলেই প্রায় নগ্নদেহ, কাহারও বা একটা গেঞ্জী বা ফতুয়া গায় আছে কেহ সোজা হইয়া বসিয়া আছে, কেহ বা কাৎ হইয়াছে, কেহ বা দুই হাঁটু বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া নিতম্বের উপর ভর করিয়া আরাম করিয়া বসিয়া আছে।"

৩১ পৃষ্ঠা—"তার ভিতরকার যে যুবকের প্রাণ তাহা আবার চাড়া দিয়া উঠিল।"

৩২-৩৩ পৃষ্ঠা—"চিৎপুর প্রভৃতি রাস্তায় চলিতে সে কম্পিত কলেবরে মাটির দিকে চাহিয়া চলিত। ······তার আশঙ্কা হইত কবে বা সে এই সব বাড়ীর কোনও বারান্দায় তার মাকে দেখিয়া ফেলিবে! তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে তার মা এতদিন নিশ্চয়ই নামকাটা পেশাকর হইয়াছে।"

৩৭ পৃষ্ঠা—"তার কানের মধ্যে এমন একটা প্রচণ্ড ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হইতেছিল যে অন্য কোনও শব্দ তার কানে ঢুকিতেছিল না। ক্রমে ক্রমে ঘরটা লাল হইয়া উঠিল আর সেই লাল আলোর ভিতর দিয়া সমস্ত লোক কোথায় মিলাইয়া গেল······ নাগানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।"

৪০ পৃষ্ঠা—"অবসর পাইলেই তার চিন্তার ধারা যে পথে প্রবাহিত তাহা তাহার হৃদয়কে কাটিয়া ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিত।"

৫৯ পৃষ্ঠা—"তার সমস্ত সত্তা তার প্রতিবাদ করিয়া তার কর্ণরোধ করিয়া দাঁড়াইল।"

৬০ পৃষ্ঠা—"এস তোমার হাত আমায় দেও।"

৬১ পৃষ্ঠা—"রেবা তাহার হৃদয়ের সবগুলি পরদা নিঃশেষে গুটাইয়া ফেলিয়া তাহার চরণপ্রান্তে ভিখারিণী হইয়া আসিয়াছে।"

৬২ পৃষ্ঠা—"'আমি শুনবোনা' বলিয়া সে কাণে আঙুল ঢুকাইয়া দিল।"

৮২ পৃষ্ঠা—"পিয়ানোতে স্কেল বাজাইতে গিয়া·········সেই চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলি কেমন মধুর লীলাতরঙ্গে পিয়ানোর চাবিগুলির উপর খেলিয়া সুমধুর বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে একটা সোনার নদীর নর্ত্তিত তরঙ্গের বিচিত্র ছবি আঁকিয়া যাইত।"

৮৪ পৃষ্ঠা—"তখন তার এই যত্নে রচিত বালির প্রাসাদের যে ভিত সে গাঁথিয়া তুলিয়াছিল তাহা ধস করিয়া বসিয়া পড়িল।"

৮৫ পৃষ্ঠা—"তার মনের ভিতর এমন একটা বিরক্তি বুক ঠেলিয়া উঠিল।"

৮৫ পৃষ্ঠা—"কি যে ঘূর্ণাবর্ত্তের মত হাজার হাজার ব্যথা তার মনের ভিতর তাণ্ডব নৃত্যে সব ভাঙ্গচুর করিয়া ফেলিতেছিল।"

৮৬ পৃষ্ঠা—"ভাবনা চিন্তা আপাততঃ তাকে তোলা থাকিল।"

৮৬ পৃষ্ঠা—"জরুরী ব্যবসায়ের কাজে (Urgent piece of business?) দলে দলে লোক—"

১০৩ পৃষ্ঠা—"পথের ফকীরের সঙ্গে লাঠি ধ'রে ভিখ্ মাঙ্গিবার মত শক্তি তার নেই।"

১০৫ পৃষ্ঠা—"যুবকের পক্ষে কোনও যুবতীর প্রতি সহানুভূতি একটা পিছল সিঁড়ির মত।"

১০৬ পৃষ্ঠা—"নাগানন্দের বুকের ভিতর······রক্ত দুমদাম করিয়া নাচিতে লাগিল।"

১০৭ পৃষ্ঠা—"তার ক্ষুদ্র বুদ্ধির মুণ্ডপাত হইয়া গিয়াছিল।"

১১০ পৃষ্ঠা—নাগানন্দের চক্ষু একবার এই মেয়েটির দিকে ফিরিতেই সেখানে একেবারে বসিয়া গেল।"

১১৫ পৃষ্ঠার এই বহিতেই একবার চোখ বুলাইয়া এইগুলি চোখে পড়িল, বইখানিতে আরো কত রত্নরাজি বিক্ষিপ্ত আছে তাহা যে কেহ একবার পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন। নরেশচন্দ্রের অন্যান্য পুস্তকের ভাষা ইহা অপেক্ষা উন্নত নহে। বাহুল্যভয়ে সকল পুস্তক হইতে নমুনা দিলাম না। নরেশবাবু ও তাঁহার দলীয় লোকের নূতন ভাষা সম্বন্ধে আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

শরৎবাবু 'বঙ্গবাণী'তে ও 'আত্মশক্তি'তে স্পষ্টত বলেন নাই 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁহার মতামত সম্বন্ধে সত্য লেখা হইয়াছে কি মিথ্যা লেখা হইয়াছে। তাঁহার উভয় প্রবন্ধেরই ব্যঙ্গের ভাবে মনে হয় তাঁহার মতামত বিকৃত করা হইয়াছে। অন্তত রেঙ্গুন লাইব্রেরী পড়িয়া শেষ করার কথাটা যে মিথ্যা তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি উপহাস ও সময়ের অভাব নির্দ্দেশ দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। 'শনিবারের চিঠি' ছাড়াও 'কেতকী' নামক পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেখিলাম 'সাহিত্য প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র' নামক নিবন্ধে শনিবারের চিঠিতে যে মতামত শরৎবাবুর বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে সেই ধরণের মতই ব্যক্ত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে শরৎবাবুর উচিত স্পষ্ট করিয়া বলা যে তিনি ওই সকল মতামতের জন্য দায়ী নহেন। রসিকতা করিয়া এগুলিকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা আর যাহারই পক্ষে হউক প্রবীণ শরৎচন্দ্রের পক্ষে শোভন নহে। এখনও ছ'মাস হয় নাই 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

আত্মশক্তিতে 'রস-সেবায়েৎ প্রবন্ধে শরৎবাবু শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্ল্লভ হাজরার প্রতি অকারণ উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্য-সেবীদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।' আমরা এমন একজনের কথা জানি যিনি উপন্যাসের দাদন লইয়া তাহা ঠিকমত জোগান দেন না এবং অর্দ্ধপথেও অসমাপ্ত রাখিয়া দেন। ইহা ত কলম ধরিবার পূর্ব্বেই হাঁড়ি চড়ানো। এইরূপ দাদন লইয়া কতগুলি ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক কারবার করিতেছেন পুস্তক-প্রকাশকেরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

শরৎবাবু 'বঙ্গবাণী'তে লিখিয়াছেন—

'রসবস্তু লইয়া আমি আলোচনা করিতে পারিব না। কারণ ও আমি জানি না। রসিক অরসিকের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেও আমি অপারগ।'

রসস্রষ্টা শরৎচন্দ্রের মুখে ইহা অদ্ভুত শোনাইলেও কথাটা সত্য। তবে তিনি অপারগ হইয়াও যে কেন আত্মশক্তিতে 'রস-সেবায়েৎ' প্রবন্ধ লিখিলেন বুঝা দুষ্কর। 'ঘটি-চুরির বিচারে পরিপকতা অর্জ্জন করিলেই সাহিত্যের রসের বিচারে

অধিকার জন্মায় না'—ইহা যেমন সত্য কথা, তেমনি ২১ খানা উপন্যাস লিখিলেও যে জন্মায় না তাহা শরৎবাবু নিজেই জানেন দেখিতেছি।

পেন্‌সন্‌ভোগী হাকিমের প্রতি অকারণ বিরাগ ও জীবন্ত উকীলের প্রতি [তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রতিদ্বন্দ্বী (?) হওয়া সত্ত্বেও] ভীষণ অনুরাগ দেখিয়া যাহা মনে হয় তাহা খুলিয়া লিখিতে ভরসা হয় না।

বঙ্গবাণীর প্রবন্ধের গোড়ায় শরৎবাবু 'এদিক' আর 'ওদিক' দু'টা দিকের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কোন্‌টা কোন্‌দিক কিছুই ঠাহর হইল না। জায়গাটা উদ্ধৃত করিতেছি—

'এদিকে বিপদ হইয়াছে এই যে, কালক্রমে আমারও দুই চারিজন ভক্ত জুটিয়াছে[১] তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন্ কম ? দাওনা তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।

'আমি বলি, সে যেন দিলাম, কিন্তু তার পরে ? নিজে যে ঠিক কোন দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তাছাড়া ওদিকে নরেশবাবু আছেন যে ! তিনি শুধু মস্ত পণ্ডিত নহেন, মস্ত উকিল[২]। তাঁর যে জেরার পরাক্রমে কবির যুক্তিতর্ক রস-রচনা হইয়া গেল, সে-জেরার প্যাঁচে পড়িলে আমি ত একদণ্ডও বাঁচিব না।[৩] কবি তবুও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তির কোঠায় পৌঁছিয়াছেন, আমি হয়ত ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি কোনটারই নাগাল পাইব না, ত্রিশঙ্কুর ন্যায় শূন্যে ঝুলিয়া থাকিব ! তখন ?

'ভক্তরা বলে, আপনি ভীরু।[৪]

'আমি বলি, না।

তাহারা বলে, তবে প্রমাণ করুন।

'আমি বলি, প্রমাণ করা কি সহজ ব্যাপার ! 'রসসৃষ্টি' 'রসোদ্বোধন' প্রভৃতির রস বস্তুটির মত ধোঁয়াটে বস্তু সংসারে আর আছে নাকি ?* এ কেবল রসরচনার দ্বারাই প্রমাণিত করা যায়—কিন্তু সে সময় আপাততঃ আমার হাতে নাই।†

'এতো গেল আমার দিকের কথা। ওদিকের কথাটা ঠিক জানিনা কিন্তু অনুমান করিতে পারি।'

১ এবারে কিছু অধিক সংখ্যকই জুটিবে।

২ ইহা ব্যাজস্তুতি কিনা নরেশবাবুই বলিতে পারিবেন।

৩ বিমূঢ় মারীচ রাবণের পক্ষই লইয়াছিল।

৪ অভক্তেরাও এবার বলিবে।

ফুটনোট লেখকের।

ইহার পরেই প্রবন্ধের একস্থলে আছে—

'কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে, ইহাতে ঈপ্সিত লাভ না হোক শব্দ এবং ধুলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন এবং বিনীত-ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বারম্বার প্রশ্ন করিতেছেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন? হাঁ কি না বলুন?'

আমরা দেখিতেছি, আর একজনও এ সকল প্রশ্ন করিতেছেন, তিনি শরৎচন্দ্র নিজে। তাঁহার প্রতি কবি বিরূপ কিনা কবিই জানেন—কিন্তু তিনি যে কবির প্রতি বিরূপ তাহা তাঁহার প্রবন্ধের বহুস্থলে প্রকাশ পাইয়াছে, এই কারণে তাঁহার প্রবন্ধ কটু হইয়া উঠিয়াছে, সত্য বিকৃত হইয়াছে।

বিনীত ক্রুদ্ধ কণ্ঠটা কিরূপ, নরেশবাবুর প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইলাম। বিনীত ভাঁড়ামির পরিচয় শরৎবাবুর প্রবন্ধে পাইয়াছি।

শরৎবাবুর প্রবন্ধের মর্ম্মস্থানটি পরিশেষে উদ্ধৃত করিতেছি। এই স্থানটুকুই নিত্যকাল বাঙালী পাঠককে আনন্দরসধারা দান করিবে।

'আমি নিজেও ত একজন ছোট সম্রাট, কিন্তু আলিঙ্গন ত দূরের কথা, চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে কোথাও দিতে পারিলাম না।......খুব সম্ভব আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু ভাবি, এই দুর্ব্বলতা লইয়াই তো অনেক প্রণয়-চিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি, মুস্কিলে তো পড়ি নাই।'

এমন স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আর পড়িয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না। কী নিষ্ঠা, কী অপরূপ কলাকৌশল। স্থানাভাবে, সাম্রাজ্য লইয়া আলোচনা তুলিব না। ছোট কথা চুম্বন আলিঙ্গন লইয়াই আলোচনা করিব। এই প্রবন্ধলেখকই কি 'চরিত্রহীন' নামক উপন্যাস লিখিয়াছেন। হাতের কাছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত অন্য কোন বহি নাই। চরিত্রহীনে নিম্নলিখিত স্থানগুলি পাইলাম। অন্য বহিতেও যে এই ধরণের লেখা আছে তাহা স্পষ্ট স্মরণ হইতেছে, কেহ চ্যালেঞ্জ করিলে সময়ের অপব্যবহার করিয়া দেখাইয়াও দিতে পারি সম্ভবত তাহার দরকার হইবে না। একটি ভাত টিপিয়াই ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কি না বলা যায়। নির্ভীক স্পষ্টবাদী শরৎচন্দ্র যে সত্য বলেন নাই, একটি দৃষ্টান্তেই তাহা প্রমাণিত

* ছিল না, সম্প্রতি হইয়াছে। তাহা শরৎচন্দ্রের 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধ।

† এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় না থাকিলেও ভাল হইত।

হইবে। এই শরৎচন্দ্র যদি চরিত্রহীন লেখক শরৎচন্দ্র হন তাহা হইলে কি এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে? শুধু চুম্বন .আলিঙ্গন-কথা নয়—মাদার টিঞ্চার চুম্বন আলিঙ্গন নানা ডাইলিউশনের ফলে কি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, 'সংযত পরিহাস' (সাবিত্রীর) কাহাকে বলে ইত্যাদি দেখাইবার অবকাশ পাইলে বাঙালী পাঠকের কৌতুকরসের উদ্রেক করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহারও প্রয়োজন নাই। তৃতীয় সংস্করণ চরিত্রহীনের—৩৭১ পৃষ্ঠায়—

"কিরণময়ী···কিছু মিষ্টি একখানি ছোট রেকাবিতে করিয়া আনিয়া দিবাকরের সম্মুখে আসিয়া জানু পাতিয়া উঁচু হইয়া বসিল, এবং জোর করিয়া একহাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া একটির পর একটি করিয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। এমনি করি। সবগুলি নিঃশেষ করিয়া কিরণময়ী মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিয়া লইল, এবং পরক্ষণেই নত হইয়া দিবাকরের আর্দ্র ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।"

৩৭১ পৃষ্ঠা—"এই বিষাক্ত চুম্বন······"

১৬৩ পৃষ্ঠা—"চুমো খাইলেন······"

৬৬ পৃষ্ঠা—"·· আলিঙ্গন করিয়াছিল······"

৩২৪ পৃষ্ঠা—"······চুম্বন করিলেন······"

এতদ্ব্যতীত ৪৭৪ পৃষ্ঠা···"সতীশের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া সে (সাবিত্রী) একেবারে ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল।"

৪৭৪ পৃষ্ঠা—"সাবিত্রীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সেই নিমীলিত অশ্রুউৎস নিজের অগ্ন্যুত্তপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠাধরের উপর টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল।"*

৩৪৯ পৃষ্ঠা—"(কিরণময়ী) হঠাৎ হেঁট হইয়া দিবাকরের দাড়িটা হাত দিয়া একবার নাড়িয়া দিয়া······"

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা অবান্তর হইলেও বলিয়া রাখি। মনস্তত্ত্ববিদেরা এক প্রকার complex এর কথা উল্লেখ করেন, যাহার প্রভাবে পড়িয়া লোকে বিনা প্রয়োজনে মিথ্যা কহে। মিথ্যা বলিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত কোনও লাভ নাই, তবু মিথ্যা বলিবার লোভ তাহারা সম্বরণ করিতে পারে না। আইন আদালতে

শব্দ হয় নাই।

এই শ্রেণীর মিথ্যা সাক্ষী অনেক দেখা যায়, সাহিত্যের আদালতেও সম্প্রতি দেখা দিয়াছে।

শরৎবাবু কোথায়ও কখনো নরেশবাবুকে দেখিয়াছেন কিনা মনে করিতে পারেন নাই, নরেশবাবুর বদনমণ্ডলের আকৃতি না জানিয়াও দ্বিজেনবাবুর প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার মুখভাব তিনি কল্পনা করিয়াছেন। অপূর্ব্ব সহানুভূতি! এ যে দেখি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমকেও ছাড়াইয়া উঠিল! রুষিয়ার দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা কল্পনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ অপরাধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু মানুষের এক একদিন এমন অবস্থা হয়, যে, সেদিনকার কোন ঘটনাই সে স্মরণ রাখিতে পারে না। অন্ততঃ তিন দিনের ঘটনা এক ব্যক্তি বিস্মৃত হইয়াছেন, আমরা এরূপ সংবাদ পাইয়াছি। কেহ কেহ ইহাকে সেই মিথ্যা complex বলিতেছেন, কেহবা সেই ব্যক্তির মানসিক অবস্থার জন্য চিন্তিত হইয়াছেন। আমরা complex বুঝি না, পরের জন্য মাথাও ঘামাই না, আমাদের শুধু স্বর্গীয় গোপাল ভাণ্ডের কথা মনে পড়ে।

'শনিবারের চিঠি' : কার্তিক ১৩৩৪, পৃ ১৮২-১৯৩

—